KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়
Title : পরিচয় (PARICHAYA)	Size : 6"x9"
Vol. & Number : 13/1 (২ য় খণ্ড) 13/2 13/3 13/4 13/5-6	Year of Publication : মাঘ ১৩৫০ ফাল্গুন ১৩৫০ চৈত্র ১৩৫০ বৈশাখ ১৩৫১ জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় ১৩৫১
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রিয়ব্রত কুমার সান্যাল, (সাধারণ সম্পাদক)	Remarks : Title Page missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

১৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৫০

পরিচয়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—হিন্দু কৃষ্টির উৎপত্তি—

আজকাল ইউরোপীয় পুস্তক পাঠ করিয়া একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক "আর্য্য-জাতি", "আর্য্যকৃষ্টি", "দ্রাবিড় জাতি", "দ্রাবিড় কৃষ্টি" প্রভৃতি বুলি আওড়াইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইহার পর, গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় উত্তর ইউরোপ হইতে 'নর্ডিক' জাতি বা সাইবেরিয়া হইতে 'প্রটো-নর্ডিক' জাতিকে বৈদিক সমাজে আনয়ন করিয়া তাঁহারা হিন্দু-সভ্যতার মূলজাতিগত (Racial) বিভিন্ন স্তরভেদ নির্দ্দেশ করিয়া ভারতীয় কৃষ্টির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে, হিন্দুর মধ্যে, কে 'আর্য্য' কে 'অ-নার্য্য', দ্রাবিড় বা মঙ্গোল তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার সামাজিক মর্য্যাদা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান। ফলে অন্তঃসলিলারূপে একটা প্রাদেশিক মনোমালিন্যও সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকারের পল্লবগ্রাহী অবৈজ্ঞানিক মত প্রচারের ফলে অনভিজ্ঞ লোক মধ্যে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

নৃতত্ত্ব বা নর-বিজ্ঞান "আর্য্য" নামীয় কোন মূলজাতির সন্ধান জানে না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ মানবের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একটির নামকরণ করিয়াছেন "ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষা। স্বজাতি-প্রেমিক জার্ম্মান পণ্ডিতেরা ইহাকে "ইণ্ডো-জার্ম্মাণ" ভাষা নামে অভিহিত করেন। ম্যাক্সমূলার (১) এই ভাষাকে

১। MaxMueller—"Biographies of Words and the Home of the Aryas" Pp. 120, 245.

"আর্য্য" ভাষা নাম দিয়াছেন; কারণ সংস্কৃত, ইরাণীয় প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার সহিত ইউরোপের এই সকল ভাষা এক মূল-জাত। কিন্তু ভাষা ও মূলজাতি এক সংজ্ঞাবাচক নহে। একটা জাতির তাহার ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যজাতীয় ভাষা গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। এইজন্য "ইণ্ডো-ইউরোপীয়" বা "আর্য্য"ভাষী জাতি সমূহ বলিলে "আর্য্য" মূলজাতি (race) বুঝায় না।

নানা মূলজাতীয় শারীরিক লক্ষণযুক্ত লোক সমূহের একত্র সংগঠন দ্বারা একটি জাতিতাত্ত্বিক লোক-সমষ্টি (Ethnic unit) গঠিত হয়। এই লোক সমষ্টি আবার একটা ভাষা বা উপভাষা ও ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড এবং আচার ব্যবহারের পার্থক্য দ্বারা এবম্প্রকারের অন্য লোকসমষ্টি হইতে বৈচিত্র্য লাভ করিতে পারে। মূল-ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা 'আর্য্য'ভাষী জাতি অতি প্রাচীনকালে এবম্প্রকারেরই একটা জাতিতাত্ত্বিক লোকসমষ্টি ছিল। ইহাদের মধ্যে বৈদিক আর্য্যভাষী জাতিটি একটি উপজাতি ছিল। তাঁহারাও আবার বিভিন্ন কৌমে (tribe) বিভক্ত ছিল, এবং তাহাদের উপাস্য দেবতাও হয়ত পৃথক ছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাহারা এক-কৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, বৈদিকযুগের পর গৃহ্যসূত্র সমূহে সাধারণভাবেই সর্ব্বসাধারণের জন্য আচার ব্যবহারের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। গৃহ্যসূত্র-নির্দ্দিষ্ট "দশকর্ম্ম" প্রভৃতি আচার আজ পর্য্যন্ত হিন্দুদের দ্বারা প্রতি-পালিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন তাহার মূল বৈদিকযুগেই নিহিত। উপনিষদেই ব্রাহ্মণের 'আচমণ' প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত সমাজ পরিচালনাকল্পে গৃহ্যসূত্রোক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি আজও বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তবে কালের অগ্রগতির সহিত ইহাদের অনেকগুলি নানাকারণে হয় রূপান্তরিত হইয়াছে না হয় আর প্রতিপালিত হয় না। পুরাণ সমূহে বিভিন্ন ব্রতের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; সেইগুলির মধ্যে অনেকগুলি আজও প্রতিপালিত হয়; এমন কি, পুরাণোক্ত আহার প্রণালীর অনুজ্ঞা আজও অনেক-স্থলে প্রতিপালিত হইতেছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে হিন্দু ও মুসলমানেরা প্রথমে মিষ্টান্ন, পরে পকোড়ি (নোন্তা) প্রভৃতি আহার করেন। এই প্রথা বিষ্ণু-

পুরাণোক্ত (৩।৮৪) অনুজ্ঞার সহিত মিলে। কিন্তু পূর্ব্ব-ভারতে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" অনুজ্ঞানুসারেই আহার হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক ও অন্যান্যদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের যে সংবাদ সংস্কৃত নাটকসমূহে পাওয়া যায় সেগুলির অনেকগুলিই আজও প্রচলিত আছে।

এইস্থলে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) এবং সভ্যতার (civilisation) স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে। ইংরেজ ও আমেরিকান পণ্ডিতেরা ল্যাটিন ভাষা-প্রসূত Culture ও Civilization শব্দদুইটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন (২)। কিন্তু জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা বলেন, কৃষ্টি হইতেছে মানবের আত্মা (sprit) প্রসূত। মানুষ নিজের কর্ম্মের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য বুদ্ধিবৃত্তি বা মস্তিষ্ক শক্তি দ্বারা উদ্ভব করে উহা তাহার culture-এর ('Kultur') পরিচায়ক বলা হয়, এবং সেই সব দ্রব্যকে সাধারণের কর্ম্মে প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের উন্নতি বিধান হইলে সেই অবস্থাকে মানবের civilization বলা হয়। এইজন্য cultural goods এবং civilizing processes অনুষ্ঠান সমাজে বিরাজ করিয়া থাকে। মানব তাহার উদ্ভাবনী ও চিন্তা শক্তি দ্বারা cultural goods সৃষ্টি করে এবং তদ্বারা সর্ব্বসাধারণের উন্নতি বিধানকে civilizing processs বলা হয়। এই civilizing process যে জাতির মধ্যে যত প্রয়োগ হইতেছে, সেই জাতিকে তত civilisation সম্পন্ন, অর্থাৎ সুসভ্য বলা হয়। সভ্যতা (civilisation) অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) মানবের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে। এই তর্কের ধারা ধরিয়া জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বিগত পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাসমরের পর "culture-man" এবং "civilization man মধ্যে পার্থক্য দেখেন (৩)। কৃষ্টি ও সভ্যতা এই শব্দ দুইটির জার্ম্মাণ ব্যাখ্যানুযায়ী স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য বা তাহার বর্ত্তমান বংশধর হিন্দু-কৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি, সে একজন 'culture-man'। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, হিন্দুর উদ্ভূত কৃষ্টির অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের (cultural goods) সর্ব্ব-জনীন প্রয়োগ হয় নাই; সেইজন্য আজ সুসভ্য দেশসমূহের মাপকাঠিতে ভারতের আপামর সুসভ্য না হইতে পারে—প্রত্যেক ভারতবাসী civilization-

২। Lester F. Ward—"Applied Sociology".

৩। Oswald Spengler—The Downfall of the Occident", P. 353.

man না হইতে পারে, কিন্তু ভারত যে culture-man' বিশিষ্ট এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দু নিজের "spirit-force" (আধ্যাত্মিক শক্তি) দ্বারা কৃষ্টিগত নূতন cultural goods উদ্ভাবন করিতেছে তাহা পক্ষপাতশূন্য পণ্ডিতগণ অস্বীকার করিতে পারেন না বা করেন না। তাঁহারা হিন্দুদের 'Kultur voelk' (cultural people) বলিয়া স্বীকার করেন।

হিন্দুর সমাজ ও তাহার বর্ত্তমান কৃষ্টির (culture) কাঠামোটা প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা সম্ভূত। মানবসমাজ গতিশীল (dynamic), সুতরাং বৈদিক আচার ব্যবহার সমূহ হয়ত বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী সময়ে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তথাপি তাহা 'অ-নার্য্য' অর্থাৎ আর্য্য-ভাষীদের বাহিরের বস্তু নয়। খোদিতলিপি সমূহে দেখা যায় যে, "ভাকাটাকা" রাজত্বের আরম্ভ হইতে গুপ্তযুগের মধ্যে নানা পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণ্য পূজা-পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মহাকাব্যগুলির নায়ক-নায়িকারা অনেকে বর্ত্তমানকালে পূজিত হইতেছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এইসব পূজা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না ; সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে এই সকল নূতন নূতন পূজা-পদ্ধতি সৃষ্ট হয় এবং নানা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্রাদিরও নূতন সঙ্কলন হয়। বর্ত্তমানকালের ব্রাহ্মণ্য সন্ধ্যা উপাসনাতে বৈদিক-মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এবং তৎসহ নূতন মন্ত্র রচিত ও সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান ব্যাপারেও বৈদিক এবং নূতন মন্ত্র পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত পূজাদিতেও এবম্প্রকার দৃষ্ট হয়। কোন নূতন পূজা-পদ্ধতির উদ্ভব হইলে ব্রাহ্মণেরা তদুপযোগী নূতন মন্ত্রাদি রচনা করেন। এই ধারা (process) আজও চলিতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই বৈদিক মন্ত্র ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। নূতন কালোপযোগী নূতন পূজা ও সামাজিক পদ্ধতি সৃষ্ট হইলে তাহা "অ-নার্য্য", অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্য-কৃষ্টির বহির্ভূত বলা যাইতে পারে না।

ইহা সত্য বটে যে, বিদেশের সহিত লেন-দেনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা বৈদেশিক কৃষ্টি হইতে বস্তুতান্ত্রিক অনেক জিনিষ (cultural goods) গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্ম নূতন কলেবর ধারণ করে

নাই। সামাজিক ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহ বৈদেশিক প্রভাব বিমুক্ত। তবে খৃষ্টীয় মিশনারীগণ যে কথা তুলিয়াছেন, যে বৈষ্ণবধর্ম্মে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা এখনও বিতর্কের বিষয় হইয়া আছে ; বরং একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিতই বলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মে ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথা, তখন হিন্দুসভ্যতা উন্নতি-শিখরের অবতরণের দিকে আসিয়াছে।

হিন্দু-কৃষ্টির সহিত বৈদেশিক কৃষ্টির আদান প্রদান হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য ; কিন্তু বৈদেশিক কৃষ্টি বা ভারতের আদিমজাতীয় লোকদের সভ্যতা হিন্দু-সমাজ পদ্ধতি ও তাহার ধর্ম্মকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, ইহা অবৈজ্ঞানিক কথা। হরপ্রসাদশাস্ত্রী প্রমুখ বলেন, তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিদেশাগত (৪)। তিনি বলেন, ইহা মধ্য-এশিয়ার শকগণের মগ-পুরোহিতদের সহিত ভারতে আসে। কিন্তু মগ-পুরোহিতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তান্ত্রিক ধর্ম্মের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বরং 'মাগী-ধর্ম্ম' (Magi) বহু পূর্ব্বেই জারতুষ্ট্রিয় ধর্ম্মের মতের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল (৫)। প্রাচীন ধর্ম্মসমূহের তুলনামূলক পাঠ হইতে তন্ত্রের চিহ্ন অন্য কোন ধর্ম্মে পাওয়া যায় না। ইহা সত্য বটে যে, "লিঙ্গ-পূজা" (Phallic worship) পশ্চিম-এশিয়ায় প্রচলিত ছিল (৬) ;) (আবার" "সিন্ধু-সভ্যতা" মধ্যেও উহার চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয় (৭) এবং বেদেও "শিশ্ন-দেবা" উপাসকদের যজ্ঞস্থলে থাকিবার পক্ষে নিষেধ আছে। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্মে লিঙ্গোপাসনার কতটা স্থান

৪। Introduction to N. N. Vasu's "The Modern Buddhism and its followers in Orissa", P. 10.

৫। Dr. Dhalla—"Zoroastrian Civilisation" এবং "Zoroastrian Religion দ্রষ্টব্য।

৬। Frazer—"Adonis"

৭। Prof. A. B. Keith বলেন, "Phallic Worship"-এর উৎপত্তি হয়ত এই স্থান হইতে হইয়াছে। তিনি বলেন, সিন্ধু সভ্যতা "is largely Indian in character and Nature."—The Aryans and the Indus Valley Civilization in "ভারতীয় অনুশীলনী"।

আছে তাহা বিচারের বিষয়, বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত্রে উহার একান্ত অভাব। অতএব তান্ত্রিকধর্ম্মের কোন অংশ যে বিদেশাগত তাহা বলা যায় না। বরঞ্চ ইহা খুবই দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, তন্ত্রের 'পঞ্চমকার সাধনা', শক্তি (ডাকিনী), আম-শ্মশানে নরমাংস ভক্ষণ * ও তাহার টুকরা বা অংশ প্রভৃতি ভূতদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ প্রভৃতি ব্যাপার ভারতের বাহিরের কোন ধর্ম্মে আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তন্ত্রের "চীনাচার" (৮) চীনের প্রভাবের পরিচায়ক। কিন্তু লামা তারানাথের (৯) পুস্তক হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অনেক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক তিব্বত ও চীনদেশে গিয়াছিলেন এবং তিব্বতে ও চীনে তন্ত্র ভারত হইতেই আমদানী হইয়াছিল। বরং একদল লেখক বলেন যে, তন্ত্রের 'গুপ্তমন্ত্র' (Occultism) ও স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার বেদের 'ব্রাহ্মণ' সমূহ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল ; 'বীজ' ও 'মন্ত্র'গুলির পূর্ব্বাভাস ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১০)। আবার তান্ত্রিকেরা বলেন, তান্ত্রিকধর্ম্ম অথর্ব্ববেদ প্রসূত। উইন্টারনিজ (Winternitz) বলেন, তন্ত্রের অনেক আসল অনুষ্ঠান (Essentials) অথর্ব্ববেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে পাওয়া যায় (১১)। পণ্ডিতেরা বলেন, শৈব উপনিষদগুলি বেদের শাখা বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট (১২)। বেদে ক্রিয়াকাণ্ড সমূহের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উচ্চবর্ণ সমূহের উচ্চশ্রেণীদের ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতেরা বলেন (১৩)। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহ পাশাপাশি থাকিত—যথা, শিশ্নদেবোপাসকেরা, ভাগবতের

* 'নরমাংসভক্ষণ' মানবের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। Letournean ("anthropo phagie" দ্রষ্টব্য)। এ বস্প্রকারের কর্ম্মকে একটা abnormal mind-এর কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে কোন ধর্ম্মের অঙ্গ বলা যায় না।

৮। হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী—"হিন্দী সাহিত্যকী ভূমিকা", পৃঃ ৯।

৯। Taranath—"Edelsteinmine" Tr. by Gruendwel (in German).

১০। B. L. Mukherjee in Woodroffe's "Shakti and Shaktas", P. 441 f; also Winternitz, Vol. I. P. 602.

১১। Winternitz—History of Sanskrit Literature, translated by Ketkar Vol. I. P. 605, 606.

১২। Weber—History of Sanskrit Literature.

১৩। Bloomfield—Religion of the Vedas, Pp. 76-77.

দল, অন্যান্য অহিংসাবাদীর দল, বেদে অবিশ্বাসীর দল ইত্যাদি। যদি সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা একজাতিরই কৃষ্টির অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে বৈদিকধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের সন্ধান সেই কালের ভারতে পাওয়া যায়। অন্ততঃ লেখকের (১৪) অনুমান এই যে, সিন্ধু-সভ্যতার "শবদাহ" প্রথা (urn-burial) বৈদিক আচারের অন্তর্গত ; গৃহ্যসূত্রে অস্থি-সঞ্চয় করিয়া কলসীতে (urn) পুরিয়া মাটিতে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে, এবং পুরাণেও (অগ্নি-পুরাণ—১০।১৮ ; বিষ্ণুপুরাণ—৩।১১।১৪) অস্থি সঞ্চয়ের বিষয় উল্লিখিত আছে। মার্শাল অনুমান করেন যে, সিন্ধু-সভ্যতা বেদে প্রতিফলিত হয় এবং আজও সিন্ধু-সভ্যতার পশুপতিদেব (শিব) ও ধ্যানীযোগী, টটেম্-পূজা ভারতে বিদ্যমান। কাজেই ইহা আর্য্যভাষীদের সভ্যতার বাহিরে কি অন্তর্গত, তাহা আজও বিতর্কের বিষয়।

সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশের মধ্যে যেসব নর-করোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আজকালকার অনেক ভারতীয় লোকের করোটির সহিত মিলে। অন্ততঃ সেই প্রাচীন জাতি বা জাতি সমূহের বংশধরেরা আজও ভারতে আছেন। ইহার মধ্যে একটি জাতি হইতেছে, ভূমধ্যসাগরীয় জাতি (Mediterranean Race) ; নরতাত্ত্বিকদের মতে বর্ত্তমান ভারতের বেশীর ভাগ লোক এই মূল জাতীয় লোক (১৫)। তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যেরা কি ভিন্ন মূলজাতীয় লোক ছিল ? আনাউ (Anau) হইতে ২০০০ খৃঃ পূঃ যুগের যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে নরকরোটিগুলি ভূমধ্যসাগরীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১৬)। পারস্যের লোকদের উক্ত মূলজাতীয় লোক বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে (১৭) ; আবার সার্জ্জি প্রাচীন হিন্দুকুশের ভারতীয় কৌমদের এই

১৪। B. N. Datta—Vedic Funeral Custom and Indus Valley Culture in 'Man in India', Vol. 16. No. 4 ; Vol. 17. No. 1-2.

১৫। Von Eickstedt—"Rassen Kunde und Rassen Geschichte der Menschheit".

১৬। Pumfelly's "Exploration in Turkeystan" (Carnegie Publication, No. 73).

১৭। Daniloff—"Characteristics of the Persians" (in Russian).

মূলজাতীয় বলিয়াছেন (১৮) এমতাবস্থায় জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, ভারতীয় বৈদিক আর্য্যদের কোন মূলজাতীয় বলা যাইতে পারে? মার্শাল বলিতেছেন, পাঞ্জাব কোনকালেই অমিশ্রিত জাতির আবাসস্থল ছিল না, হারাপ্পায় আবিষ্কৃত নরকরোটিগুলি দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। মার্শাল স্বয়ংই স্বীকার করিতেছেন যে, বৈদিক আর্য্যদের উৎপত্তি বিষয়ে বহু বিতর্ক আছে—"তাহারা কি ব্লণ্ডনর্ডিক, না'ক্রনেট্ মেডিটেরানীয়' অথবা গোল মাথা বিশিষ্ট আল্পিন্ বা এই সকলেরই একত্র সংমিশ্রণ (১৯) (যদিও ইহা হয়ত অসম্ভব)।"

কিন্তু হালে সিন্ধু-উপত্যকায় যেসব নর-করোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া ডাঃ গুহ বলেন, ইহার মধ্যে "লম্বা মাথা" ও "লম্বা নাক" বিশিষ্ট করোটিও পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, প্রাচীন বৈদিক জাতিগুলির একটা Constituent ইহাতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উপরে উক্ত হইয়াছে, অধিকাংশ নরতাত্ত্বিকের অভিমত এই যে আশপাশের আর্য্যভাষীরা ভূমধ্যসাগরীয়; তাহা হইলে আর্য্যভাষী বৈদিকেরা যে মূলতঃ ভূমধ্যসাগরীয় নয় তাহাও অস্বীকার করা যায় না। হয়ত বৈদিকযুগের পূর্ব্বে ও পরে তাহারা মিশ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মূল জাতিগত যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন এবং নরকরোটির বিভিন্নতাও যতই থাকুক না কেন, বৈদিকযুগে তাহারা একটি বিশিষ্ট Ethnic unit. এই সমষ্টির কৃষ্টি ভারতে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাই বিচার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, আর্য্যভাষীদের বেদ-প্রসূত যে সমস্ত ধর্ম্ম উদ্ভূত বা বিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আর্য্যকৃষ্টি সম্ভূত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানের বৃক্ষ, জন্তু ও কালীপূজা সমূহ আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে নেওয়া বা গৃহীত; কেহ কেহ আবার এমনও বলিতে চাহেন যে, কালীপূজা প্রভৃতি

১৮। G. Sergi—"Gli. Ari. in Europe".

১৯। Marshall—Mahenjo-daro and the Indus Valley Civilisation, Vol. I. Pp. 88-110.

†। ইহা অসম্ভবই বা কেন? সার্জ্জি ও টেলর বলেন, আর্য্যেরা গোলমাথা বিশিষ্ট ছিল। ফ্রান্সের ব্রোকার দলও তাহাই বলেন। এই উক্তি দ্বারা মার্শালের Pan-Germanic bias for Nordicism ধরা পড়ে।

তান্ত্রিক ধর্ম্ম সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি তাঁহাদের নিকট হইতে ধার-করা। কিন্তু এস্থলে সর্ব্বপ্রথম বিচার্য্য, "আদিম অধিবাসী" কাহাকে বলে? সাধারণ লোকে ইহার অর্থে "দ্রাবিড় জাতি"কে (Dravidian race) বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু নরতাত্ত্বিকেরা আজ 'দ্রাবিড় জাতি' বলিয়া কোন মূল-জাতিকে জানেন না। 'দ্রাবিড় জাতি' বিশপ কল্ডওয়েলের সৃষ্টি (২০)। তিনি 'দ্রাবিড় ভাষা' হইতে দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি করেন। কিন্তু বর্ত্তমানের নরতাত্ত্বিকেরা বলেন, ইহারা ভূমধ্যসাগরীয় মূলজাতির অন্তর্গত, পূর্ব্বোক্ত নামটি ভ্রমাত্মক ও ভুল (২১)। যখন বৈজ্ঞানিকদের মতে উত্তর-ভারতের লোকেরা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি এবং দক্ষিণের লোকেরাও তাহাই, তাহা হইলে মূলজাতীয় ও কৃষ্টির পার্থক্য কোথায় রহিল? অবশ্য ভাষার পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু সেই ভাষাটি কোন জাতির ভাষা? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ লোকদের সাধারণতঃ 'দ্রাবিড়' বলা হয়, কিন্তু অনেকস্থলে তাহারা অন্যান্য মূলজাতি সমূহের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, এবং অনেকের মধ্যে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতির (Pre-Dravidian) লক্ষণ প্রকাশ পায় (২২)।

বর্ত্তমানের নরতাত্ত্বিকেরা দ্রাবিড়ভাষীদের বিশ্লেষণ করিয়া দ্রাবিড়-পূর্ব্ব একটি জাতির সন্ধান পাইয়াছেন; তাহাদিগকেই "আদিম অধিবাসী" বলা হয়। ইহারা সিংহলের আদিবাসী ভেদ্দাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত; সেইজন্য দ্রাবিড়-পূর্ব্বদের Veddoid (ভেদ্দাদের ন্যায়) বলা হয় (২৩)। এই "ভেদ্দার-ন্যায়" জাতি গঙ্গা-উপত্যকা পর্য্যন্ত বাস করে; অবশ্য বিভিন্ন স্থলে তাহারা "আর্য্যভাষী" হইয়াছে। ইহাদের ভাষা হইতেছে—দ্রাবিড় ভাষা, এবং 'কোলরীয়' জাতি তথাকথিত 'মন-খেমর' ভাষা বলে (ফন্ হেভেসির মতে, তাহারা Finno uigric বিভাগীয় তাতার-জাতীয় ভাষা বলে)। তাহা

২০। Caldwell—A Comparative Grammar of the Dravidian and South Indian Languages.

২১। Eickstedt—"Rassen Kunde und Rassen geschichte der Menschheit; Dr. Guha—Ethnological Report on Census of 1931; Haddon—Races of Man, P. 107-111. ইনি দ্রাবিড় ও মেডিটেরাণীয় জাতির মধ্যে অনেক মিলের কথা বলেন।

২২। Haddon—Races of Man, Pp. 20-21.

২৩। Eickstedt এবং Sarasins; Haddon—op. cit. P. 107-111.

হইলে দ্রাবিড়জাতির পরিবর্ত্তে 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব একটা জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। এক্ষণে বিচার্য্য—আর্য্যগণ ও তাঁহাদের "হিন্দু" বংশধরেরা কতটা এই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতির কাছে ধর্ম্ম ও কৃষ্টির জন্য ঋণী।

জাতিতাত্ত্বিকেরা বলেন, এই জাতি সভ্যতার বিশিষ্ট উচ্চ স্তরে আজও উঠিতে পারে নাই। দক্ষিণের জঙ্গল সমূহে এই মূলজাতির যেসব অংশ বাস করে তাহারা সভ্যতার অতি নিম্ন স্তরে আজও অবস্থিত (২৪)। ইহা ছাড়া মধ্য ভারতের কোলারীয় জাতি (ইহারা নিজেদের আজ 'হো'—Ho জাতি বলেন) 'মুণ্ডারি' ভাষা বলেন; কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই ভাষার পরিচয় বিষয়ে সন্দেহ আছে *। এই ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং তাহারা দ্রাবিড়-পূর্ব্ব মূলজাতির অন্তর্গত। ওরাওঁগণও (Oraons) তদ্রূপ এবং তাহারা কানাড়ী ভাষার সহিত সাদৃশ্য সম্পন্ন দ্রাবিড় ভাষা বলে; সাঁওতাল পরগণার মালে ও মালপাহাড়ীরাও ওরাওঁ জাতীয় লোক কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া থাকেন (২৫)।

জাতিতত্ত্ববিদেরা বলেন, এই আদিমজাতীয় কৌমগুলি অবশ্য প্রস্তরযুগের সভ্যতা হইতে বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা নিজেদের চেষ্টায় কতটা কৃষ্টির উচ্চতর স্তরে উত্থিত হইয়াছে তাহাই বিচার্য্য। তাঁহাদের ভাষায়, আচারে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হিন্দু সভ্যতারই ছাপ পড়িতেছে। তাঁহারা হিন্দুদের অনেক অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান আজও গ্রহণ করিতেছে। ছোটনাগপুরের 'হো' জাতি (কোলারীয়) নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় না, অথচ হিন্দু আচার ও অনুষ্ঠান নকল করিতেছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকেরা বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া থাকে। অনেকস্থলে কালীপূজা করিয়া থাকে, হিন্দুর পার্ব্বণ প্রভৃতি অনুসরণ করে। স্মৃতিসমূহে এই সকল জাতিদের (ভীল, কোল) "অন্ত্যজ", অর্থাৎ হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল আদিম জাতীয় লোকদের নিকট হইতে প্রাচীন আর্য্যগণ বা তাহাদের পরবর্ত্তীকালের বংশধরেরা কৃষ্টির অনেক

* W. Von Hevesy—Zurverwandtschaft der Muuda-Sprachen in Orientalischen Literatur Zeitune, May—1936, Pp. 273-288.

২৪-২৫। Haddon—op. cit. Pp. 107-111.

দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে বলা, অবৈজ্ঞানিক কথামাত্র। ইহাদের মধ্যেই যাঁহারা হিন্দু-কৃষ্টি এবং বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত আচারাদি গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা 'অন্ত্যজ' তৎপর 'অস্পৃশ্য', তৎপর 'অসৎ-শূদ্র', তৎপর 'সৎশূদ্র'—ইহার পর ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন।

এইজন্য দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে হিন্দুরা ধর্ম্ম বা কৃষ্টির অনেক মালমসলা গ্রহণ করিয়াছে বলা দায়িত্বহীনতা ও পল্লবগ্রাহীতার পরিচায়ক মাত্র। ইহাও প্রকৃত সত্য যে, অনেক অনার্য্য ভাষার শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং আর্য্যদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্য-ভাষীগণ তাহাদের মধ্যে হজম হইয়া যাওয়ায় ইহা ঘটিয়াছে। তবে হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরের অনেক আচার ও অনুষ্ঠান আছে যাহা শ্রুতি বা স্মৃতির অন্তর্গত নহে। তুক্-তাক্, ঝাড়ন, বশীকরণ, জন্তু ও বৃক্ষ পূজা, আঁকার ভয়, বাঁকার ভয় প্রভৃতি অনেক কুসংস্কার কোথা হইতে আসিল ?

যাঁহারা বৈদিক আর্য্যদের ও পরবর্ত্তীযুগের বংশধরদের ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাল-ফ্যাসানের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের ন্যায় ছিল বলিয়া মনে ধারণা করেন তাঁহাদের কাছেই এই প্রশ্ন উঠিবে। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলিও Pre animalism (জন্তুপূজার পূর্ব্বের স্তরের ধর্ম্ম), animalism (জন্তুপূজা), Totemism (বৃক্ষ, জন্তু, জল প্রভৃতিকে পূর্ব্বপুরুষ রূপে পূজা), Magic and witchcraft (ইন্দ্রজাল ও ওঝাগিরি) প্রভৃতি নানাস্তরের ধর্ম্মভাবের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্যই বেদেই সেমিটিক্‌জাতীয় একেশ্বরবাদ (monotheism) না পাইয়া tribal chiefs-দের দেবত্বে আরোপ (২৬), বায়ুমণ্ডল হইতে কল্পিত (২৭) ও রূপক (২৮) দেবতা প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। আর অথর্ব্ববেদে (†) ম্যাজিক, রোজা (witchcraft) ও তুক্‌তাক্, ঝাড়ন, বশীকরণ প্রভৃতির মন্ত্রাদি পাওয়া যায়, বেদে বৃক্ষপূজার সংবাদ পাওয়া যায়; তাহার বাহিরে টটেম্‌বাদের অনেক সংবাদও পাওয়া যায়। কাজেই বৈদিক-সাহিত্যে বর্ত্তমানের আচার ও অনুষ্ঠানের অনেক জিনিষ বীজরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালীন কুসংস্কারগুলি বৈদিকসাহিত্য ও স্মৃতিতে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের নাটক প্রভৃতিতে

২৬। যাস্ক, দুর্গাচার্য্য মহীধর ও মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব দ্রষ্টব্য। ভীষ্ম বৈদিক দেবতাদের বড় বড় রাজা বলিয়াছেন; যাস্ক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিষয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, দুর্গাচার্য্য বলেন যে সকল দেবতারই সেই উৎপত্তি। মহীধরও তাঁহার ভাষ্যে সেই কথাই বলিয়াছেন।

২৭-২৮ যাস্ক দ্রষ্টব্য।

† Bloomfield—op. cit. Pp. 76-77.

অনেক কুসংস্কারের খবর জানা যায়। লেখক প্রতীচ্য ভ্রমণকালে দেখিয়াছেন, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক মেয়েলী কুসংস্কারের সহিত এদেশের বেশ মিল রহিয়াছে।

অবশ্য হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের এমন অনেকগুলি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে (শীতলা পূজা, গ্রাম্য দেবতা, ভূত, ব্যাঘ্রদেবতা প্রভৃতি পূজা) যাহার উল্লেখ বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য এগুলি "লৌকিক-ধর্ম্ম" (tribal religion) হইতে উদ্ভূত। বিভিন্নস্থানীয় কৌমগুলি যখন আর্য্য-সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তাহাদের বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানগুলিও আর্য্যসমাজে আসে, কিন্তু এইগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুমোদিত নহে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম tribal religionকে "গ্রাম্য" বা "লৌকিক" ধর্ম্ম রূপে হজম করে; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ঐগুলিকে অকস্মাৎ উৎখাত না করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দূরীভূত করিয়া তদুপরি হিন্দুর অনুষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে (২৯)।

কিন্তু এই সকল 'বিশ্বাস' আর্য্যকৃষ্টি, হিন্দুর স্মৃতি বা পুরাণের অন্তর্গত নহে। এগুলির অস্তিত্বের দ্বারা হিন্দু-কৃষ্টির মধ্যে আদিমজাতীয় প্রভাব প্রমাণ করা যায় না। লিঙ্গপূজা (Phallic Worship) অসভ্য আদিমজাতি-সমূহের মধ্যে নাই (৩০); সেইজন্য শক্তিপূজা ও শিবপূজার প্রতীক লিঙ্গ ও যোনী পূজার নিদর্শন তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২৯। সুন্দরবনের দক্ষিণ রায় এবং অন্য যায়গার বাঙ্কড়া রায় পূজা animalism ধর্ম্মের পরিচায়ক। ইহা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। আবার ওলাবিবি ও সুন্দরবনের বনবিবির পূজা মুসলমান পুরোহিতের একচেটিয়া। ইহাও হিন্দুর পূজা নহে। জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিতই লেখককে বলেন, চড়কপূজা সংক্রান্ত পাটপূজা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। ইহার কোন স্মৃতি বা পূজা-পদ্ধতি নাই। তবে বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্ত্তিকে আজ যেমন ব্রাহ্মণেরা 'বিষ্ণুমন্ত্রে'ই পূজা করেন, তদ্রূপ পাটপূজা 'শিবমন্ত্র' দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আসলে চড়ক ও গাজন হিন্দু ও বৌদ্ধের অনুষ্ঠান নহে। এই বিষয়ে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

৩০। Hopkins—Epic Mythology, No. I, P. 222.

লক্ষ্মীছাড়ী

(১০)

আজ চাঁপার তাড়া আছে। সকাল সকাল বেরোতে হবে। সেদিন বক্তীর্থ বিলের ধারে আমলকী কুড়োতে গিয়ে শুনে এসেছে, ঐ ট্যাঁপা মিত্তিরের মেয়ে উজ্জ্বলার কাছে। যে,—বাগ্দীপাড়া পেরিয়ে পঞ্চবটী ডাইনে ফেলে, জেলেদের সরু বাঁধালের ওপর দিয়ে জলাড্যাঙা পার হলেই কৃষ্ণাণপুর। এখানেই নন্দানদীর ঘাট। তার দক্ষিণ বাগে ছোট একটা বাঁশবাগান পড়ে। সেইটে পার হলেই সুমুখে ষষ্ঠীতলা। সেখানটা এককাঁড়ি ত্রিশিরা গাছ হাজার সবুজ সাপের মতন ফণা জাগিয়ে আছে যেন। জায়গাটা ভারি চুপচাপ। একলা এলে একটু ভয় ভয় করে। ওদিকে কেউ যায় না। বলে, দুপুরে নাকি মা ষষ্ঠী হাজার ছেলের পাল নিয়ে খেলা করতে বসেন। এসময়ে সেখানে গেলে নাকি; শাপ লাগে, নির্ব্বংশ হয়। এইখানেই একেবারে নোনা ডেয়োর বন। অনেক দিন চাঁপা ডেয়ো খায় নি। ভারি ইচ্ছে জেগেছে। যাবেই ও ঠিক করেচে। কিন্তু মাঝে মাঝে ষষ্ঠীতলার কথা মনে পড়ে ভয় হচ্চে। আবার ভাবচে, ভয়ই বা কিসের। কতবার অমন ত খেয়েচে। সেই যে, ওদের গ্রামের বুড়ো শিবের মন্দির। সেখানে কামরাঙা বন। চাঁপা টগর ত কতবার খেয়েচে। একদিন কামরাঙা পাড়চে, ঘোষের বাড়ীর গিন্নি গঙ্গাস্নান করে ফিরে যেতে যেতে দেখতে পেলে। বললে, আ হতভাগীরা, রাজ্যে কি আর কামরাঙা পেলে না মা!

চাঁপা বললে, দেখেচ পিসি, কিরকম গাছপাকা! এখানটায় কেউ আসে না যে।

পিসি বল্‌লে, পোড়াকপালীরা, দেবস্থানের ফল কি খেতে আছে। তোরা জানিস্ না ত, শীতল বাগ্দীর ছেলে ফটিক। সেও অমনি গোঁয়ার্ত্তুমি করে কামরাঙা খেয়ে গেলো। তেরাত্তির কাট্‌ল না। ওলাউঠোয় নিলে।

পিসি হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে ওলাবিবিকে প্রণাম জানালে। চাঁপা টগরের হাত পা ভয়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। চাঁপা তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলে, টগর তুই খেয়েচিস্ নাকি?

তারপর ওরা অনেক পরামর্শ করে ঠিক করেচে প্রথম ফল ঠাকুরকে দিয়ে খাবে। তাই করে ওদের ত কিছু হয় নি। কামরাঙা পেড়েই ভাল দেখে দুটো বুড়ো শিবের সামনে দিয়ে আসত। আজও চাঁপা তাই ভাবলে। নোনা পেড়েই মা ষষ্ঠীর সামনে দিয়ে আসবে। তাহলে আর ভয় নেই। কিন্তু নেহাৎ একলা যেতে ওর মন সরচে না। একটু যেন ভয় ভয় লাগচে। তাছাড়া এতটা পথ। উজ্জ্বলাকে ও বারকয়েক নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেচে। সে রাজি হয় না কিছুতেই। চাঁপা আর কি করবে, শশীকেই টেনে নিলে।

শশী জিগ্যেস করলে, কোথায় দিদি? চাঁপা বল্‌লে, চল না, আজ খুব মজা, অনেক দূর যাব।

দূরে যাবার কথা শুনে শশী একেবারে নেচে উঠেচে। ও জন্মে কখন কোথাও যায় নি। শুধু বছর দুই আগে ওর বাপের সঙ্গে কান্তপুরে গাজনের মেলায় গেছলো। সেই যাওয়া আর আসার ছবি শশীর মনে পাটে পাটে জমে আছে। হঠাৎ এক একবার ওর মনে পড়ে কি আশ্চর্য্যভাবে গরুর ল্যাজ মুচড়ে, মাঠের শুকনো মাটির ওপর চাষা দৌড়দৌড়ি করে। আশ্চর্য্য হয়ে ও চন্দোরকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বাবা, গরুগুলো তাড়াচ্চে কেন?

কান্তপুরের যেখানটায় মেলা বসে তার দক্ষিণ দিকটা ধূ-ধূ করচে ফাঁকা মাঠ। শশী ত একেবারে অবাক। এত ফাঁকা জায়গা গ্রামে ও আর কখন ছাখে নি। এই সব নানারকম ছবির স্নিগ্ধ ছায়া আজ চাঁপার দূরে যাওয়ার কথায় শশীর মনটিকে যেন ঠাণ্ডা করে দিলে। ও উৎসাহে খর্‌খর্ করে এগিয়ে চল্‌লো।

এতকাল হল চাঁপা এখানে আছে কিন্তু গ্রামের গিন্নিবান্নি বৌঝির সঙ্গে ওর আলাপ ঘনিষ্ঠতা নেই। ওরা ভাবে, মুকুজ্জে গিন্নির রূপের দেমাক আছে। সেই অহঙ্কারে মাটিতে আর পা পড়ে না। অর্থাৎ কারুর সঙ্গে কথাই কইতে চায় না। এতে অনেকের মনে রাগ। ফিস্‌ফাস্ গুজ্‌গাজ্‌ও চলে। কিন্তু চন্দোরের ভয়ে কেউ বড় একটা সুবিধে করতে পারে না। গ্রামে জমিদারও নেই। একমাত্র অবস্থাপন্ন লোক চন্দোরই। কাজেই ইতর

ভদ্দর সবাইকেই সময়ে অসময়ে এসে চন্দোরের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়। এই হয়েচে মুস্কিল।

কাজেই চাঁপা যখন হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে গাছ-কোমর বাঁধে, আর কাঁচামিঠে আমগুলো তাক্ করে রীতিমত ঢিল ছুঁড়তে থাকে, তখন ওদের ভির্ম্মি লাগবার মতন হয়।

ওরা বলে, বাবাঃ, অমন মদ্দ-মেয়ে জীবনে দেখি নি। বকতীর্থের জলে গা। ডুবিয়ে ওদের আলোচনার আর শেষ থাকে না। কাজেই গ্রামের শেষ প্রান্তে খবরটা পৌছতে বেশী দেরী লাগল না। মেয়েদের এই স্নান করা কাপড় কাচার একটা বৈঠকে শোনা গেল, চাঁপা নাকি বলেচে, নারকেলটা আঁকশি দিয়েও হয় না, ঢিল মেরেও হয় না, তাই ও একদিন গাছে উঠ্‌বে। এ খবরটা প্রচার হতে একটা পুরো দিনও লাগল না।

বৌঝিদের অবাক্ লেগেচে। তাদের ইচ্ছে চাঁপাকে দেখবে। গিন্নিরা চোখ বড় করে, একটুখানি হাঁ করে, গালে হাত দিয়ে, পরস্পরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। তা ছাড়া ওর নাকি জনা-জাতির বিচার নেই। যার তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মতন কথা কয়। মাথার কাপড় ত কেউ কখন ওরা দেখে নি। মাঝে মাঝে কাপড়টা টেনে দেবার ভান করে বটে। কিন্তু সে ওই নামে। থাক্‌ল থাক্‌ল, গেল গেল।

বকতীর্থের পাড়ে ঘেঁটুবনের ভেতরকার সরু পথ দিয়ে চাঁপা চলেচে শশীকে সঙ্গে করে। ঘাট থেকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বলা চেঁচিয়ে ডেকে উঠল।

চাঁপা বললে, যাচ্ছি ষষ্ঠীতলার নোনা পাড়তে।

দুপুর হতে তখনও ঢের বাকি। সব্বাই নাইতে নেবেচে। হঠাৎ ষষ্ঠিতলার কথা শুনে সবাইকার বুকের ভেতর যেন ছাঁৎ করে উঠ্‌ল।

কেউ কেউ বললে, ওরে বারণ কর ছুঁড়িকে, ডেকে ফেরা।

উজ্জ্বলা চেঁচিয়ে ডাকলে। চাঁপা খিলখিল করে হেসে উঠ্‌ল। যেখানটায় ঘেঁটুবনটা একটু পাৎলা হয়ে গেচে, সেই ফাঁকে ওরা শশীকে দেখতে পেলে। সবাই হায় হায় করে উঠ্‌ল, উপায় নেই। খবরটা দুর্গার কানে পৌছতে দেরি লাগল না। মার প্রাণ। ভয়ে ভাবনায় শুখিয়ে কাঠ হোয়ে গেল।

চন্দোর ঘরে নেই। কিবা করে। ঘরের মেঝেয় শুয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল। হে মা ষষ্ঠি, তোমার দয়াতেই ত পাওয়া, তুমি যা ইচ্ছে কর।

বকতীর্থের বিল মস্ত। ওপারটা গ্রামের চাষাভুষরা সরে। এইখানে গোটাকয়েক সজনে গাছ হেলে দুলে পথের ওপর যেন নেচে দাঁড়িয়ে আছে। অল্প একটু দূর থেকে দেখতে ভারি মজা লাগে। শশী অবাক হয়ে ব্যস্তভাবে বলে, দিদি, ছাখ ছাখ!

দুপাশের ঘেঁটু বনে গা ঘসে চল্‌তে চল্‌তে চাঁপা সাড়া দেয়।

বিলের এই কোণটা নির্জ্জন। জলের ধারে বকে ভর্ত্তি। গো বক, খড়ো বক, শ্বেত বক প্রভৃতি। গো বকগুলো চরতি গরুর মুখের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। গরুর গায়ে পোকা বসলে টপ করে ধরে খায়। জলের ধারে ধারে সারি সারি বক চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে পটাপট্ মাছ ধরচে বা। কোন কোন দল জলের ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্চে দূরের দিকে, কোথায় কে জানে।

বাগ্দী পাড়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে শশীর আল্লাদ আর ধরে না। ঘুনি, পলো, ছাঁক্‌নি-জাল সবার ঘরে ঘরে। ছাঁকনি জালে মাছ ধরা শশী অনেক দিন দেখেচে। ওর ভারি ইচ্ছে নিজে একদিন ধরবে। তাই শশী জাল, ফাঁদ-গুলোর ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে চলে।

সরুপথের একটা বাঁক ফিরেই ওরা দেখতে পেলে, একটা গাছের তলায় কতকগুলো ছেলেমেয়ে ছুটে খেলা করচে। একজনের মাথায় সুপুরির চাঁপের একখানা খোলা। দুহাতে তীর আর ধনুক। দুপাশে অনেক সৈন্য সামন্ত। তারা সবাই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁপা আর শশীকে দেখেই সবাই লম্বা দিলে। একগলা ঝোপড়া জঙ্গলে দাঁড়িয়ে ওরা এদের দেখতে লাগল। শশী ত হেসেই আকুল।

বাগ্দীপাড়া ছেড়ে ওরা পঞ্চবটির কাছে পৌছল। শুধু অশোক গাছটা শশী চেনে না। এখান থেকে আবার শশীকে কোলে নিতে হয়। কারণ, জলা-ড্যাঙার ওপর দিয়ে সরু আল। এই জলাড্যাঙা একেবারে মাছের আড্ডা। সারা বছরে এখানে জল শুকোয় না। ধূ ধূ করছে জলা। মাঝে মাঝে উলু, কাশ, কুশ, সরকাঠি উঁচু হয়ে মাথা তুলে রয়েচে। মনে হয় যেন ওখানটায় একটু

ড্যাঙা। জেলেদের এই জলাটুকুই আড্ডা। যাহোক দুপয়সা তারা রোজগার করে। প্রাণের ভয়টা বেজায়। কারণ জলাটা সাপের আণ্ডিল। ঘুনিতে কতবার সাপ পড়েচে। সেবারে সদানন্দ গেল। ঘুনিটার ভেতর তড়বড় করচে দেখে সদানন্দ ভাবলে, বড় রকম ফলুই হবে যেমনি গিয়ে হাত দোয়া, আর ছোবল। পুরো একটা ঘণ্টাও কাট্‌ল না। একোবরে কাল কেউটে। রোজা থাকে ভিন্ গাঁয়ে। সে আসবার আগেই সদানন্দ চোখ মুদলো।

শশী খুব ব্যগ্রভাবে চাঁপার কাছ থেকে জিগির দিয়ে সন্ধানগুলো আদায় করে নিচ্চে। কি করে ঘুনি পাতে। ঝোড়ের মুখে ঘুনি পেতে, আশপাশের ফাঁক কলার বাসনা, ঘাসের চাপড়া দিয়ে বাঁধতে হয়। পলো কেমন করে চাপতে হয়? পাঁকাল যোল কিছুতেই বাগানো যায় না। ঘন পাঁকের মধ্যে সেঁধিয়ে বসে থাকে। পলোর মুখ দিয়ে হাত সাঁধ করিয়ে দিয়েও কোন পাত্তা মেলে না। যেন মাছই পড়ে নি।

দুপুর রোদের আলো জলে চিক্‌চিক্ করে উঠ্‌চে। কাঁচা উলুবনের মাথা হাওয়ায় দুলে উঠচে. ঠিক যেন ধান ক্ষেত। চুনোপুঁটি দুচারটে এখানে ওখানে জলের ওপর তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে উঠচে। মাছের একটা ঝাঁক চলেচে মন্দাস্রোতের উল্টো দিকে, আলের ধারে ধারে। চাঁপা শশীকে দেখালে। হঠাৎ চিলের ছায়া জলে পড়ল। মাছের ঝাঁক ওমনি ডুব মারে।

জলার ওপারে কৃষাণপুর। বাঁশের ঠেকোয় জাল শুখোচ্চে। কুঁড়ে ঘরের চালাগুলো দেখা যাচ্ছে। দলবাঁধা নারকেল গাছ। লম্বা পাতার দোলনে যেন দুপুরের হাতছানি লেগেচে।

কৃষাণপুরে ঢুকে শশীর অবাক লাগে। ও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে. দিদি, এটা আর একটা গাঁ, না?

শশীর চোখে পড়েচে চাষাপাড়ার বৈশিষ্ট্য। লাঙল যোয়াল বলদ দামড়া মরাই ছাড়া শশী দেখলে উঠনে উঠনে লাউ কুমড়া আর পুঁই মাচা। আর এলোমেলো ফুলের গাছ। শশী কেবলই হাত বাড়ায়। চাঁপা ওকে সামলায়। বলে, দেখচিস্, কুণ্ডলি মেরে কুকুর ঘুমুচ্চে উনুনের পাশে, এক্ষুনি জেগে

উঠবে। তারপর এমনি তাড়া লাগাবে যে কোথায় লুকোবে তার ঠিক থাকবে না।

নন্দানদীর ঘাটের কাছে এসে দেখে, দুখান নৌকো অশথ গাছের শেকড়ের সঙ্গে বাঁধা। দাঁড়িমাঝিরা গাঁয়েরই চাষাভুষো লোক। ধান চাল আলু পটোল শাক সব্জী নানারকম বোঝাই করে একবেলার পথ সেই চাঁপদেড়ের হাটে যায়। সেই চাঁপাদের গাঁয়ের কাছে। বেচাকেনা সেরে সেইদিনই আবার গাঁয়ে ফেরে।

চাঁপা বলে, আঃ শশী দেখচিস্, কি তক্‌তকে জল। চলদিকি খাই, তেষ্টা লেগেচে। পুরোণ ভাঙা ঘাটের ওপর এসে ওরা দুজনে বসল। আদ্যি-কালের বাঁধা ঘাট। ফেটে চৌচির হয়ে আছে। ফাটলে ফাটলে বট অশথের চারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ফুরফুরে বাতাস বইচে। অশথের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে, পিলপিল পিলপিল করে একটানা একটা শব্দ করতে লেগেচে। চাঁপা আর শশীর ঘাটে বসে যেন ভারি আরাম লাগল। ওরা দুজনে চুপচাপ ওপারে বাদাড়ের বিরাট ফাঁকার দিকে চেয়ে বসে রইল।

চাঁপা অশথগাছটার দিকে ফিরে বললে, শুনচিস্ শশী, কি মিষ্টি শব্দ। আর কোন্ পাতার হয় বল দিকি ?

শশী বললে, তুমি বল।

চাঁপা বললে, সর্‌সর্ সর্‌সর্ শব্দ শুনিসনি, নারকেল গাছের ? এই দুটো গাছ দেবতা, জানিস্ তো ? পূজা হয়। নারকেল গাছ কাটতে নেই। নেয়ে যাবার সময় সবাই অশথগাছের গোড়ায় জল দিয়ে নম করে যায়, দেখিস্‌নি ?

শশী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। চাঁপা বলে, এই দুটো গাছ, আমার ভারি ভাল লাগে। আমাদের উঠানে দুটো নারকেল গাছ আছে। আমি আর টগরমনি কতদিন রাত্তিরে দাবায় শুয়ে শুয়ে দুলতি পাতাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতুম। সর—সর—সর শব্দ শুনতে শুনতে আমাদের চোখে ঘুম লাগত।

শশী বললে, দিদি, জল খাবে না ? হাঁটুভর জলে নেবে ওরা জল খেলে আঁজলাভরে। তারপর চলতে লাগল।

চাঁপা বললে, শশী, ঐ ছাখ, বাঁশ বাগান। ওর পরেই ষষ্ঠিতলা।

বাঁশঝাড়টার ভেতর দিয়ে সরু একটা পথ পড়েচে। চলতে চলতে শশী আসে পাশে চায়।

বাঁশবনের মাথায় লাগে হাওয়া। তাইতে ওদের গায়ে লাগে দোলা। গায়ে গায়ে জড়ামড়ি করে থাকার জন্যে ঘসড়ানি শব্দ হয়, ক্যাঁচ কোঁওচ্।

শশী সভয়ে চাঁপার গলা জড়িয়ে ধরে। বলে, দিদি, বাঁশবনে আমার বড্ড ভয়। ওই শোন, কে দোল খাচ্চে।

চাঁপার মন ষষ্ঠীতলার দিকে। একবার ভাবচে নোনার কথা, আর একবার ভাবচে মা ষষ্ঠীর কথা। হঠাৎ শশীর ভয় পাওয়া দেখে ওর মনে ধাক্কা লাগল। ও বললে, দুর অনামুখো ছেলে। দিনের বেলায় বুঝি ভুত থাকে। শশী ভয়ে ভয়ে বললে, তবে যে বলে, ঠিক দুক্‌কুর ব্যালা—

চাঁপা ধমক দিয়ে উঠল। উপায় নেই। মনে হলেই সবটা আওড়াতে হবে। শশীকে কোল থেকে নাবিয়ে দিলে। চাঁপা আশপাশে একবার চেয়ে দেখে নিলে কেউ কোথাও আছে কিনা। তারপর ও আর শশী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বলতে লাগল।

ঠিক দুক্‌কুর ব্যালা
ভুতে মারে ঢ্যালা।
ভুতের নাম রশি
হাঁটু গেড়ে বসি।

বলেই সেইখানেই মাটির ওপর হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। হাঁটু না গাড়লে, ভুতে নাকি ঢেলা মেরে মুখ থুবড়ে ফেলে দেয়।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। সব চুপচাপ। ভরা দুকুর। হঠাৎ শশী দেখে, হাওয়া নেই কিছু নেই, অথচ শুধু শুধু একটা বাঁশপাতা, একবার ওদিক, একবার এদিক করে ঘুরতে ঘুরতে বেঁকে চুরে নেবে আসচে।

চুপিসাড়ে শশী বললে, দিদি, ঐ দেখ।

চাঁপা বলে, দুর ভীতু। শুকনো পাতা ঝরবে না, বাহারে ছেলে।

শশী চুপ করে যায়।

এদিকটা লোকজনের বসতি নেই। এক দিকে নন্দানদী। আর এক দিকে ষষ্ঠিতলা। তারপর ধানবাদা। কাজেই ভারি নিস্তব্ধ, নিঃসাড়।

হঠাৎ ঠক্ ঠক্ ঠক্ র্ র্ র্ র্ র্ রবে একটা শব্দ উঠল। শশী ভয়ে কাঠ। দুহাতে চাঁপার গলা জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে মুখ লুকলো।

চাঁপা চমকে উঠে বলে, নাঃ, তুই দেখচি ভারি ভীতু। ওটা কাঠঠোকরা পাখী তাও জানিস্ না।

বাঁশবন পেরিয়ে পড়ল ষষ্ঠীতলার মাঠ। মাঠটা কচি দুব্বো ঘাসে ঘাসে ভরে গেচে। তেশিরে গাছগুলো সত্যি সত্যি যেন সাপের মতো লক্‌লক্ করে উঠচে। চাঁপা দেখলে ওই তেশিরে গাছগুলোর তলায় কতকগুলো ঘট উল্টেপাল্টে পড়ে রয়েচে। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে গড় করলে। শশীও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা ঠ্যাকালে। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু একটা ঘুঘু দূরে কোথায় ডাকচে। তার সুর লেগেচে এই দুপুর মাঠের ফাঁকায়। চাঁপা খানিকটা যেন থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শশী বললে, ঐ যে দিদি নোনা। উঃ যা পেকেচে।

চাঁপা দেখলে, সত্যি।

নোনাগাছের একটা ডাল ভেঙে, গাছ ঠেঙিয়ে ও দুটো নোনা পাড়লে। শশী কুড়লে।

চাঁপা বললে, চল শশী, মা ষষ্ঠীকে আগে দিয়ে আসি।

দুজনে গিয়ে ফল দুটি ঘটের কাছে রাখলে।

চাঁপা বললে, হে মা ষষ্ঠি, অপরাধ নিও না। আমরা তোমার গাছ থেকে দুটো নোনা পাড়ব।

তারপর নোনা পেড়েই কামড় লাগালে। চাঁপা খেতে জানে। চুষে চুষে, চেটেপুটে খেয়ে খোলা বিচি ফেলে দেয়। পাকা নোনা খেতে খেতে চাঁপার একটা গান মনে পড়ল। ও সুর ধরলে,

ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা
ডাল ভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা।

শশীর মজা লাগে। বলে, কি দিদি? আবার বলত গানটা শিখে নি।

শশীও লেগে যায়।

যথাসাধ্য খেয়ে কোঁচড় ভর্ত্তি করে ফিরতি পথে চলতে থাকে।

নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেচে যে, এই আমোদে চাঁপার মন খুসী হয়ে আছে। বলে, জানিস্ শশী, এই ট্যাঁপা মিত্তিরের মেয়ে উজ্জ্বলা, উঃ কি ভয়টাই দেখালে। বললে, যেও না, সেখানে গেলে কেউ বাঁচে না। আরো কত কি। আমাদের কিই বা হল। ঠাকুরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই হল। কি বল।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে তেরাত্তিরের কথা। তাই কথার মাঝেই চুপ করে যায়।

শশী বললে, তাই ত, দু-দুটো পাকা নোনা মা ষষ্ঠীকে দেওয়া হয়েচে। আমাদের আবার ভয় কিসের।

নন্দা নদীর ঘাটের কাছে এসে চাঁপার কানে লাগল কান্নার একটা সুর। ও দাঁড়িয়ে পড়ে, কান খাড়া করে বললে, কে কাঁদে বলত?

শশী এই দুপুরে হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে ভড়কে গেচে। আস্তে আস্তে বললে, হ্যাঁ দিদি, কে যেন কাঁদচে?

অনেকদিনকার পুরোন শোকের কান্না যেন। আন্তরিকতা আছে, উৎপাত নেই। চাঁপা অশথ গাছটার গোড়াকার একটা উঁচুপানা শেকড়ে উঠে কান পেতে শুনতে লাগল। বললে. হ্যাঁরে, শশী, ওই যে কার ঘর দ্যাখা যাচ্ছে। চল ত যাই, দেখি কে কাঁদে।

এই আমোদের পর হঠাৎ বন জঙ্গলের মধ্যে কান্না শুনতে যেতে শশীর ইচ্ছে নেই। ও চুপ করে রৈল। দেখলে, অশথ গাছটার পেছন দিয়ে একটা সরু পথ পড়েচে।

চাঁপা শশীকে কোলে নিয়ে দরজার কাছে এসে দেখলে, সত্যিই দাবায় বসে কে একজন কাঁদচে। ওদের সাড়া পেয়ে কান্নায় একটু ধাক্কা লাগল। চাঁপা দেখলে, ওমা! ওদের বোষ্টম দিদি।

কাছে এসে চাঁপা বললে, কি হয়েচে দিদি?

বোষ্টম দিদি চোখের জল পুঁছে ফেললে। বললে, কি আর হবে দিদি, পুত্তুর শোক। হঠাৎ মনে পড়ল, ঐ দেখ না।

চাঁপা দেখলে, দাবার ওপর ধূলোমাখা একটা কড়ির ঝাঁপি। তার আশপাশে দু'চারটে খেলনা। তিন কোণা কাঁচ এক টুকরো। বেনে বৌ পুতুল একটা। কালো চৌকো পাথর এক টুকরো।

বোষ্টুমি বললে, পুঁথির দপ্তরটা ঐ কুলুঙ্গিতে ছিল। পাড়তে গিয়ে এটা গায়ে গড়িয়ে পড়ল। বাছার আমার খ্যালার সামিগ্‌গিরি।

চাঁপার বুকে হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল যেন। ছেলে-মরা মায়ের এমনতর কান্না ও আর কখন শোনে নি। কারণ বোষ্টুমি কথাবার্ত্তা ঠিক বলে যাচ্চে বটে কিন্তু খুব অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা শব্দ কাতরভাবে ওর গলা দিয়ে আপনি বেরিয়ে আসচে। যেন সেটা কান্না নয়। বহুদিনকার জমাট বেদনা হঠাৎ গলে গেচে। তারই নিষ্কাশন, নিষ্কৃতি ওই শব্দটুকুতে।

বোষ্টুমিকে হঠাৎ থামতে বলতেও পারচে না। যেন কোথায় আটকাচ্চে।

বোষ্টুমি বললে আকাশে সেদিন মেঘে মেঘে চাঁদের আলোর আল্পনা। আমার কোলের কাছটিতে শুয়েচে। ওই ওখানে দাবার ধারের দিকটায়। বলচে, মা দেখ, আমি হঠাৎ গুপ্তধন পেয়ে যাব : তারপর ত রাজা। তোমার ভাবনা কি?

হঠাৎ একটা শ্বাস এসে গলাটা আটকে দেয়। কথাটা তক্ষুনি থেমে যায়। খানিকটা চুপচাপ কাট্‌লো। কারণ চাঁপা ভেবেই পায় না, কি বলবে। ও ত' সব জানে না।

বোষ্টুমি জিজ্ঞেস করলে, তা চাঁপা ঠাকরুণ, তুমি এদিকে যে?

চাঁপা যেন নিশ্বেস ফেলে বাঁচল। বললে, হ্যাঁ, এই দ্যাখ না, নোনা খাবার সখ। তাই এলুম চলে।

হঠাৎ বোষ্টুমির মুখের ভাব বদলে গেল। জিগ্যেস করলে, কোত্থেকে পেলে? ওই ষষ্ঠীতলার মাঠে থেকে?

চাঁপার মুখখানা হঠাৎ ফ্যাঁকাশে হয়ে গেল। ও বোষ্টম দিদির মুখের পানে চেয়ে ভয়ে ভয়ে হ্যাঁ জানিয়ে মাথা নাড়লে। তারপর শুকনো গলায় জিগ্যেস করলে, কেন?

বোষ্টুমি তখন ভাল করে বিশ্বাস করতে পারে নি। আবার জিগ্যেস করলে, ষষ্ঠীতলায় গেছলে ত?

চাঁপা ভয়ে কাঠ। মাথা নাড়লে। বোষ্টুমি চুপ করে গেচে। ওর শোকের ভাব মুখ থেকে উড়ে গেচে। কেমন যেন ভাবনা লেগেচে।

চাঁপা একটা ঢোক গিলে জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে বোষ্টম দিদি?

মুখখানা ফ্যাঁকাশে করে বোষ্টুমি বললে, কি আর হবে দিদি। তোমার ওপর মা ষষ্ঠীর কৃপা হয়েচে। তোমাকে তিনি টেনেচেন, তবেই ত তুমি গেচ সেখানে।

ভয়ে ভাবনায় চাঁপার চোখে জল টলটল করচে। ও জিগ্যেস করলে, কি হবে তাতে? তে-রাত্তির কাটবে না?

ম্লান একটা হাসি বোষ্টুমির মুখের ওপর দিয়ে খেলে গেল। বললে, দুর পাগলী। মা ষষ্ঠীর দয়া হলে মরবে কেন?

আশ্বস্ত হয়ে চাঁপা জিজ্ঞেস করল, তবে?

বোষ্টুমি বললে, তবে আর কি। একটা ছেলে পাবে। চাঁপাটা নেহাৎ বোকা। কিছুই বোঝে না। বললে, কেন?

বোষ্টুমি বললে, কেন আবার কি। মা ষষ্ঠী তোমার ওপর খুসী হয়েচে, তাই একটা ছেলে দেবে।

বোকার মতন আবার চাঁপা জিগ্যেস করলে, কার ছেলে?

বোষ্টুমি বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায়। ওইতেই ওর দিন গুজরান হয়। চাঁপাকে এই দুবছরেই ও ভাল করে চিনেচে। কারণ গান গাইতে আর ভিক্ষে করতে ও ঢের ঢের গাঁয়ে ঘুরেচে। কিন্তু এমন ধারা মেয়ে আর দেখে নি। ওর মনটা যেন দিঘির কাক-চক্ষু জল। তাই চাঁপার কথায় বোষ্টুমি বললে, কার আবার ছেলে। তোমাকেই দেবে। সে তোমারই ছেলে।

চাঁপার বুকের ভেতর গুরগুর করে উঠেচে। ভয়-পাওয়া ওর ম্লান মুখখানা যেন হঠাৎ আনন্দে দপ্‌ করে জ্বলে উঠেচে। বিস্ময়ের গলায় ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে, আমার ছেলে? আমার নিজের? বল কি বোষ্টম দিদি!

চাঁপা চুপ করে কি ভাবতে লাগল। আনন্দে যেন ওর কোথায় কি একটা আটকে গেচে। বোষ্টুমিও নীরব।

হঠাৎ শশী বললে, দিদি চল।

চাঁপা উঠে পড়ল। যাবার সময় আর একবার জিগ্যেস করলে, সত্যি বলচ বোষ্টম দিদি? যেন কথাটা এখন মিথ্যে হয়ে গেলে চাঁপার সর্ব্বনাশ।

বোষ্টুমি বলে, হ্যাঁ দিদি, আমরা ত ভাই তাই শুনেচি।

চাঁপা শশীকে কোলে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেললে। ওর মনটা আজ ভরাভর্ত্তি হয়ে গেচে যেন। ও নিজের একটা ছেলে পাবে একথা ভাবতে ওর কিরকম নতুন লাগচে।

পথে শশীর সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্ত্তা জমল না। চাঁপাকে চুপচাপ দেখে শশী ক্রমশই নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগল। শেষে জিগ্যেস করলে, দিদি, আমার ভাগে কটা নোনা ?

চাঁপা বল্লে, সবগুলো।

শশী অবাক। দুহাতে চাঁপার গালটা ধরে, নিজের দিকে ফিরিয়ে এনে জিগ্যেস করলে, সত্যি দিদি ?

চাঁপা বললে, হ্যাঁরে, বোকা ছেলেটা। সবগুলো তোর একার। শশী মনে মনে তাই আশাতীত খুসী হয়ে চুপ করে গেচে।

বাড়ীর দরজায় এসে পা দিতেই দুর্গা এসে শশীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আঁচল খুলে সব নোনাগুলো মাটিতে গড়াতে লাগল। শশী ব্যস্ত হয়ে কুড়তে গিয়ে গোটাকতক কিলচড় খেলে। চাঁপা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেচে। বললে, কি ব্যাপার বৌ। তুব্‌ড়িতে আগুণ লাগাল। বৌ বললে, নিজে যে চুলোয় খুসী যাও না। আমার ক্ষুদকুঁড়োটুকু নিয়ে টানাটানি কেন ? জান না, ষষ্ঠিতলার কথা।

বলে, বৌ ডুকরে কেঁদে উঠল।

চাঁপা হঠাৎ ধমক দিলে। বললে, থামো বৌ। জান না কিছু, মিথ্যে চেঁচামেচি কর না। বোষ্টোমদিদির চেয়ে তোমরা বেশী জানো ? তার ঘর তো ওই ষষ্ঠীতলার কাছে, নন্দানদীর পাড়ে। মা ষষ্ঠি কখনো ছেলে কেড়ে ন্যায়। উল্টো তোমাদের শাস্তর বৌ। তবে লোকে ষষ্ঠিপূজা করে কেন ? ছেলে পাবার জন্যেই তো।

দুর্গার মনে কথাটা লাগল। ও কান্না থামিয়ে চুপ করে রৈল।

চাঁপা বললে, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দে, বৌ। বরং একটা কথা বলি শোন। বোষ্টোম দিদি বললে।

দুর্গা উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

চাঁপা বললে, জানিস ? মা ষষ্ঠী আমায় একটা ছেলে দেবে।

বৌকে যেন কেউ ধরে ঝাঁকানি দিলে। ঘোর কাটিয়ে ও জিগ্যেস করলে কি বললে ?

চাঁপা বললে, বোষ্টোমদিদি বললে, আমার একটা ছে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি চাঁপার মুখ চেপে ধরলে। তীব্রশাসনের স্বরে বললে, ছিঃ! ছোটগিন্নি, ও কথা মুখেও এনো না!

চাঁপা অবাক। বলে, কেন ?

বৌ বলে, কেন কি ? কলঙ্কে মুখ পুড়ে যাবে। লজ্জায়, ভয়ে, ভাবনায় দুর্গা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগল। তাড়াতাড়ি চাঁপাকে ঘরের মধ্যে টেনে এনে বললে, ব্যাপার কি ছোটগিন্নি ? সব খুলে বল। কিছু লুকিও না।

বৌয়ের গলা থরথর করে কাঁপচে। হাত পা কাঁপচে। দুর্গার অবস্থা দেখে চাঁপার ভয় লেগে গেচে। বললে, ও কি বৌ, অমন কচ্চ কেন ? আমি সবই বলচি, তুমি বস দিকি।

চাঁপা ভেবেচে, বৌ তেরাত্তিরের কথা মনে করে অমন করছে। অনেক আশ্বাস দিয়ে, বোষ্টুমির কথাগুলো সবই চাঁপা বললে। যে, দু-পক্ষ কালের মধ্যে চাঁপা ছেলে পাবেই পাবে।

দু-পক্ষের কথা শুনে দুর্গার ধড়ে প্রাণ এল। কিন্তু মনে মনে যেন জোর পাচ্চে না। চাঁপাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিগ্যেস করতে লাগল।

চাঁপা যতই অবাক হয়ে সহজ কথায় উত্তর দিক না কেন, তাতে কিন্তু বৌয়ের মনের ধোঁকা ঘোচে না। কথাটা ও রাত্তিরে চন্দোরের কাছে পাড়লো। চন্দর বিছানার ওপর তড়াক করে উঠে বসে বললে, কি বলচিস ?

বৌ ভয়ে ভয়ে কথাটা আবার বললে। চন্দর রাশভারি লোক। কথাগুলো সব মন দিয়ে শুনে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে, ও কিছু নয়।

চন্দর মুখে উড়িয়ে দিলে বটে কিন্তু মনে মনে রীতিমত ভাবতে লাগল। পরের দিন সকালেই গিয়ে চড়াও হল বোষ্টুমীর বাড়ী। অনেক জেরাজুলুম করে চন্দর নিশ্চিন্ত হল। জানলে ওটা মেয়েলি কথা, প্রবাদমাত্র।

তারপর আট দশদিন কেটে গেচে। চাঁপা বৌকে ডেকে হাসতে হাসতে বললে, বৌরে মরে তো একেবারে ভুত হয়ে গিচি। আহা, আমার তেরাত্তিরও কাট্‌ল না গো!

বৌ চুপ করে রৈল।

চাঁপা বললে, তোমাদের শাস্তর তোমরাই জান বাবা। তোমাদের শাস্তরের পায়ে গড়। ওই নিয়ে কি কাণ্ডটাই করলে সেদিনকে। নির্দ্দোষ ছেলেটাকে শুধু শুধু ঠ্যাঙালে। আমাকে গালাগাল দিলে। কি হল?

বৌ লজ্জা পেয়ে চুপ করে রৈল।

চাঁপার মন এখন চড়াসুরে বাঁধা। দু পক্ষকালের মধ্যেই পাবে। সেই আশাতেই ওর মন উচু হয়ে আছে। একটা ছেলের লোভে ওর যেন চোখ খুলে গেছে।

দুর্গা যে পুঁটুকে বুকের কাছে চেপে ধরে, কোলে করে ঘুম পাড়ায়, সেই দিকে চাঁপা এমন অপলক চোখ চেয়ে থাকবে যে, চাঁপা মেয়েছেলে এবং অত্যন্ত আত্মীয় হলেও লজ্জায় দুর্গার মাথা নেবে আসে। ছেলেপিলেদের ও অহর্নিশি কোলেপিঠে করে নিয়ে বেড়াচ্চে, কিন্তু এ রকম ভাব দুর্গা যেন আর কখনও দেখে নি। চাঁপার চোখ যেন দূর থেকে মা-ছেলের দিকে জুড়ে যায়। চাঁপার এ পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করে দুর্গার বুকের ভেতর শুকিয়ে শুকিয়ে উঠ্‌তে থাকে।

সেদিন সকালবেলা বেরবার সময় চন্দর চাঁপাকে ডাকলে। বললে, ছোটগিন্নি, একটা কথা কদিন থেকে বলব বলব করচি—

চাঁপা এগিয়ে এসে একেবারে চন্দরের গায়ের কাছে দাঁড়াল। চিবুকটুকু খুব উচু করে রেখে, চন্দরের চোখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আদর মাখা গলায় বললে, কি কথা? বল না।

চন্দর ভেবে রেখেছিল, কথাগুলো কড়া করে বলবে। কারণ, মুকুজ্জে বাড়ির নামটা সত্যিই চাঁপা এসে অবধি ডোবাতে বসেচে। বাড়ির বৌ, তায় কাঁচা বয়েসের বিধবা। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান লজ্জার কথা। গ্রামে আর কাণ পাতবার জো নেই। এমনি চি-চিক্কার লেগে গেচে।

কিন্তু চাঁপা এমন সাহসিক ভঙ্গীতে ওর কাছে এসে দাঁড়াল আর মুখ তুলে কথা জিজ্ঞেস করলে এতই সহজভাবে, যে চন্দরই যেন অপরাধী। লোকটা যেন অন্যায় করতে গিয়ে ধরা পড়েচে। এমনি করে ওর সব গুলিয়ে গেল

ও হঠাৎ মাথার মধ্যে খামচাখামচি করে চুলকুতে চুলকুতে বললে, নাঃ এমন কিছু নয়।

চাঁপা কাপড়ের পাড় থেকে সুতো টেনে বার করে আঙুলে জড়াতে জড়াতে আবার তেমনি করে চন্দোরের মুখের দিকে উচু করে চেয়ে বললে, তবে?

লোকটা যেন রীতিমত ধরা পড়ে গিয়ে অপদস্থ হয়েচে, এমনিধারা ভাব।

ছাতার গা থেকে অনর্থকভাবে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চন্দর বললে, এই মানে, গাঁয়ের লোকে বলাবলি করে, তুমি নাকি ঘোমটা দাও না, যেখানে সেখানে যাও, গাছে উঠে ফলপাকড় পাড়।

কথাটা শেষ হতে পেল না। চাপা উচ্ছসিত হয়ে এমনি খিলখিল করে হেসে উঠল যে হাসির মধ্যে, তুচ্ছ করার ভাবটা যেন চন্দরের মুখে চাবুকের ঘা লাগালে।

চাঁপা বললে, আর শোননি সুতোয় মাঞ্জা দি, ঘুড়ি ওড়াই কপাটি খেলি। বলে আবার তেমনি সতেজ উদার হাসি। চন্দর হাসিটাকে সহ্যই করতে পারলে না। সেই হাসির মধ্যেই চন্দর তাড়াতাড়ি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

চন্দর একেবারে অবাক। ও ভেবেই পায় না, ওর মতন রাশভারি একটা লোক, ঐটুকুন একটা মেয়ের কাছে যেন হেরে চোর প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্চে বারে বারে। ও গভীর ভাবে ভেবে দেখেচে, চাঁপার স্বভাবে সাহসটাই সব। ওর মন যেন তেজের নির্ভীকতা দিয়ে গড়া। চন্দরের পুরুষোচিত দর্প, গর্ব্ব আছে। তাই দিয়ে ও চাঁপার অপরূপ মনের খবর যেন আজ প্রথম আবিষ্কার করলে। দেখলে, ওর সমস্ত মনটায় কোথাও জোড়াতাড়া নেই। একেবারে আস্ত। আর সেটা সব রকম গুণাগুণ দিয়ে মিশিয়ে হল সহজ। এই সহজ মনটা চাঁপার এত সত্যি, যে কেউ হঠাৎ সহ্য করতে পারে না। প্রথমেই তাই ঘা খায়, তাক লাগে। ও আজ বুঝতে পারলে সংসারে এমন একটি মানুষ রয়েচে, যাতে প্রাত্যহিক দিনগুলো কাটবে ভাল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রাচীন গাথার রূপ ও রস

যে প্রাচীন যুগে 'থুয়া' 'ভাদালি' 'ধাতাকান্তা' প্রভৃতি গ্রাম্য অনার্য্য দেবতাগণ এদেশের মহিলাগণের পূজা ও ভোগ পাইত—স্বামী ও পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠাইয়া দিয়া মেয়েরা তাহাদের নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য বলি 'মানসিক' করিত—সেই যুগেও গ্রাম্য কথা বা গাথা রচিত হইত ইহা নিঃসন্দেহ। এই কথাগুলির সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি এখনও ভালরূপে আকৃষ্ট হয় নাই বলিলেই হয়। এক কথায় বলিতে গেলে মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ ভাগই কথাসাহিত্য। মধ্যযুগ বলিতে আমরা সাধারণতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীই বুঝিয়া থাকি। এই সাহিত্য আবার সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—লৌকিক, অনুবাদ ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সাহিত্য ব্যতীত আর দুই ভাগই বিস্তৃত অর্থে কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত। কথাসাহিত্যের মূল উপাদান গল্প—এই গল্প হয় গীত নতুবা সাধারণভাবে বর্ণিত হইত। সুতরাং ছড়া অথবা গল্প অথবা সংস্কৃত "চম্পু" কাব্যের ন্যায় এরই মধ্যে পাওয়া যায়।

যদিও 'ময়নামতীর গান' এবং 'গোরক্ষবিজয়ের' ন্যায় রূপকথা ও ব্রত কথার ভাষার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে তবুও প্রাচীনত্বের নিদর্শন এখনও "থুয়া" ও "ভাদালি" ব্রতকথায় পাওয়া যায় যেমন—

"ঢেকি পড়ন্ত"
গাই বিয়ন্ত।

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত 'থুয়া' ও 'ভাদালি' ব্রতকথায় পাওয়া যায়। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীয়মান হয় যে ব্রতকথার ভাষা অতি প্রাচীন।

কথাসাহিত্যে মালঞ্চমালা বা ফকিরচাঁদ যেমন গল্প, গোপীচাঁদের গান ও চণ্ডীমঙ্গলও তেমন গল্প। মঙ্গলকাব্য মূলতঃ ব্রতকথা এবং ব্রতকথা কথা-সাহিত্যের একটী বিশেষ অংশ মাত্র।

এই কথা-গাথার মধ্যে অতি প্রাচীনকালের এক সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাই। তবে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে যে সমুদ্রযাত্রা বা মনসা পূজার আড়ম্বর আমাদের চক্ষের সম্মুখে উৎঘাটিত করান হয় তাহা কবিমনের

বিকৃতির পরিচায়ক। কিন্তু এই সব কথাগুলি ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে যে অতি উচ্চ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার অন্য দিকে দেখিতে পাই গোরক্ষবিজয় বা মহীপালের গান রাজকীয় সমাদরে সমাদৃত হইয়াও হিন্দু আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রধান কারণ সার্ব্বজনীনতার অভাব। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা নামক গীতিকাগুলি সাধারণ ভাবে গাওয়া হইত, বলিয়া কথাসাহিত্যে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শ কথাসাহিত্যের সাহিত্য হইতে বিভিন্ন—সেজন্য বৈষ্ণব সাহিত্যকে কথাসাহিত্যের পর্য্যায় ফেলা যায় না;

প্রাচীনতর সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যে ইহার প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাব তাহা আমরা বহুস্থানে দেখিতে পাই। কথা, আখ্যায়িকা বা উপাখ্যান সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃত পুরাণাদির উপাখ্যান ভাগ ও বৌদ্ধজাতক প্রভৃতির আদর্শ এই সাহিত্যের ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে। আবার এ সাহিত্যেরও স্থান বিশেষে বিভিন্ন দাম আছে। যথা পূর্ব্ব মৈমনসিংহের কেচ্ছা (ইহা সাধারণত মুসলমানদিগের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত), ঢাকা অঞ্চলের 'সাম্বর' সবই উপকথার মধ্যে প্রচলিত। কোল সাঁওতাল জাতির গল্পগুলিও কতকটা কথাসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অতি প্রাচীনকালে হয়ত কোনও ব্যক্তি তাহার যৌবনের দুঃসাহসিকতার গল্প নানা রঙে ফাঁদিয়া গল্পচ্ছলে বলিত তাহা বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া শ্রবণ করিত। ইহাই পরবর্ত্তী যুগে শিশুমনের খোরাক জোগাড় করিত—ইহার ফলে কেশবতী কন্যা ও তার মেঘবরণ কেশ, সুয়োরাণী, দুয়োরাণী, সদাগর, ময়ূরপঙ্খী নাও, জিয়নকাঠি, মরণকাঠি আরো কত কথাসাহিত্যের ভিতর ছোট ছোট গল্পরূপে পাইয়া থাকি।

প্রত্যেক জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা এই সব ছোট ছোট গল্প হইতে ধরিতে পারা পারা যায়। এই গল্পগুলি মানবজাতির কল্পনাকে জাগরিত করিয়া রাখে চিরকালের জন্য। অনেকস্থলে এইগুলিই জাতীয় সাহিত্যের প্রতীক।

রূপকথা বা ব্রতকথার মধ্যে অতীতযুগের অনেক সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে পাওয়া যায়। সেই যুগের বঙ্গললনার প্রবাসগত নিজ আত্মীয়-

বর্গের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ, নানা দেবদেবীর নিকট 'মানত' করার ছবি সুন্দরভাবে অঙ্কিত রহিয়া আমাদের মনে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দিয়া থাকে। রূপকথাগুলিতে বণিক ও নাবিকগণের কথোপকথন, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, ডিঙ্গাগুলিকে তৈল, সিন্দুর ও চন্দন পরান, মধুকর ডিঙ্গার বিশেষরূপে অঙ্গরাগ করা—এই সব ছবি সত্যি সত্যি আমাদের মনের কোণে অতীতের ছবি আনিয়া দেয়।

কথাগুলিকে আবার কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যায়—রূপকথা, ব্রতকথা গীতিকথা ও ব্যঙ্গ কথা। শেষোক্ত কথার ইতিহাস এখানে আলোচনা করিব না। কারণ এই ব্যঙ্গকথাগুলি খুব উচু দরের ছিল না, বরঞ্চ ভাঁড়ের ভাড়ামীতে ভারাক্রান্ত ছিল বলিয়া কথাসাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করিতে পারে নাই। রূপকথা উপকথা হিসাবে প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে। ইহার প্রসারলাভ বিশেষ করিয়া মুসলমান বঙ্গ সাহিত্যের যুগে হইয়াছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহারা যে এই পাঁচালী গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়।

"সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গুঁড়া"—

মুসলমান ফকিরগণ আজও পর্য্যন্ত এই ছড়াগুলি গাহিয়া পল্লীর অঙ্গন মুখরিত রাখিয়াছে। নৈতিক উদ্দেশ্যও এই কাহিনীগুলির একটী বিশেষ অঙ্গ বলা যাইতে পারে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে একশ্রেণীর মুসলমান ফকিরকে ভাসান গান বা লক্ষ্মীর পাঁচালী গান গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এসব গানের মধ্যে সাধারণত দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারটাই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ছড়াগুলি মাধুর্য্য রসে ভরপুর।

গীতিকথাগুলি গান গাহিয়া বলা হইত। কাহারও কাহারও মতে এই গানগুলি বৌদ্ধ যুগের নিদর্শন। স্বল্পকথায় বর্ণনা মাধুর্য্য ও উচ্চাঙ্গের নৈতিক আদর্শ সংস্থাপনের চেষ্টা এই নীতিকথাগুলিতে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

কথাসাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা ও শঙ্খমালা রূপকথাগুলি বঙ্গসাহিত্যের কিরীট। প্রত্যেক গল্পের মধ্যেই পল্লীলক্ষ্মীর পদচিহ্ন পড়িয়াছে—বঙ্গললনার হৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসা, অটল-চরিত্রবল, ত্যাগের সহিষ্ণুতা, স্থৈর্য্য—এই সব মিশিয়া এক অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের নারীজনোচিত সংযম—সাহিত্যিক নিজ লিপিচাতুর্য্যে প্রত্যেক চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—সত্যি সত্যি সুন্দর ও মহিমাময়। তিনি মালঞ্চমালা নামক রূপকথায় পাঠশালার চিত্রটী কি রকম সুন্দররূপে রূপায়িত করিয়া শিশুমনের কৌতুক বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহা নিম্নের এই কয়টী পংক্তিতেই বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

"রাজার বাড়ী পণ্ডিত কত পড়ুয়া পড়ায়
কুঁজো আছে, নুজো আছে, গোগা আছে,
দুই ঠ্যাং ন্যাংরা আছে
আবার বাজার পুত্তুর আছে,
দিনরাত হিলিমিলি কিলিমিলি
কাকহাটী না বকহাটী।"

এমন সুন্দর পাঠশালার চিত্র অন্য সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল রূপকথায় ভাষার রূপান্তর অল্পবিস্তর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কারণ পল্লীর অবরোধরুদ্ধা মহিলাগণের ভাষার রূপান্তর অল্পই হইত—নগর ও বন্দরে সভ্যতার হাওয়া বর্ত্তমান থাকাতে ভাষার যেমন দ্রুত রূপান্তর ঘটে সেই রূপ সভ্যতার আলো পল্লী অঞ্চলে অল্প ঢুকিত বলিয়া এদের রূপান্তর বিশেষভাবে ঘটে নাই।

কথাসাহিত্যিক মিত্র মজুমদার মহাশয়ের এই রূপকথাগুলির স্থান অতি উচ্চে ইহা স্বীকার্য্য। ইহার ভিতর দিয়া তিনি শিশুমনের আমোদের উৎস সৃষ্টি, যুবকের প্রেম পিপাসায় অমৃত ও বৃদ্ধের শাস্ত্রের বিভিন্নতর রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই গল্পগুলি অবজ্ঞার জিনিষ নয়, মহার্ঘ সূক্ষ্ম শিল্পকলার পরিচায়ক। মনে হয় এই গল্পগুলি মহিলারাই রচনা করিতেন—কারণ বসিয়া বসিয়া ছড়া কাটিয়া গল্প করা পুরুষদিগের অসাধ্য—অনেক ছড়াগুলিতে যে কত যুগের বহুদর্শিতা ও স্ত্রীসুলভ প্রবাদ স্থান পাইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবে কে?

মৈনাক

বিশ্ব-বিপ্লব

লেনিন বলেছিলেন, যে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় এমন কতকগুলি অভিনব ঘটনা ঘটেছিল ও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যা বিপ্লবকে কৃতকার্য্যতার পথে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেই বিপ্লবের প্রগতিকে সচল রাখা ও তাকে সম্পূর্ণতা দান করা অন্যান্য দেশের চেয়ে রাশিয়ায় বেশী কঠিন। গত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিপ্লবের উপযুক্ত যে জমি তৈরী করেছিল সেই জমিতে ফসল ফলাতে রাশিয়াকে খুব বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু সে জমি তো চিরকাল থাকলো না তাই অন্য দেশে বিপ্লবকে কৃতকার্য্য করা সম্ভব হোল না—তা যদি সম্ভব হোত তাহলে জার্ম্মানীর মত শিল্পোন্নত দেশে সে বিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দান করা রাশিয়ার চেয়ে অনেক সহজ হোত। তাই আর একটি সাম্রাজ্যবাজী বিশ্বযুদ্ধ না হলে অন্য অন্য দেশে বিপ্লবের সূচনা সুদূরপরাহত। আর একবার যদি বিপ্লব সূচিত হয় তাহলে সে সব দেশে তার গতিবেগ হবে রাশিয়ার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু সেই বিপ্লবের সূচনা করা হবে দুঃসাধ্য। ট্রটস্কির বিশ্ববিপ্লব-পরিকল্পনা লেনিনের ওপরের কথায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, কারণ ট্রটস্কি কল্পনা করেছিলেন যে রাশিয়ার পরেই জার্ম্মানীতে হবে বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদীরা তখন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে কামড়াকামড়ি করায় ব্যস্ত, সে সুযোগ নিয়েছিল রাশিয়ার রণশ্রান্ত জনগণ ও সাম্যবাদীরা। তারপরই গেল যুদ্ধ থেমে—পরিস্থিতির হোল পরিবর্ত্তন। যুদ্ধ যদি আরো কিছুদিন চলতো তা হলে আরো অন্য দেশে বিপ্লব হয়তো সম্ভব হোত।

অক্টোবর বিপ্লবের দুটি বিশেষত্ব ছিল :—

(১) শ্রমিক দলের (Proletariat) নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিকের মিলিত সহযোগিতা।

(২) উন্নততর ধনতান্ত্রিক দেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় পশ্চাৎপদ রাশিয়ায় সমাজবাদের জয়ের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-নেতৃত্ব স্থাপন।

ইতিহাসে আমরা দেখেছি ১৮৪৮ ও ১৮৭০ সালে ফরাসীবিপ্লব অকৃতকার্য্য হয়েছিল তার মূলগত কারণ ছিল কৃষকদের সাহায্যের অভাব। কিন্তু রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবে কৃষকেরা শ্রমিক-নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়েছিল তাই বিপ্লবের

হয়েছিল জয়। লেনিনের মতে Dictatorship of the proletariat বাক্যের অর্থ হচ্ছে—শ্রমশিল্পের এমন একটি শ্রমিকদল যা পুঁজিবাদকে উৎপাটিত করার জন্য অত্যাচারক্লিষ্ট জনগণকে দলবদ্ধ করে শ্রেণীবিভেদহীন সমাজের সৃষ্টির জন্য তাদের পরিচালনা করবে। অনেক বিশ্ববিপ্লবপন্থীরা বলেছিলেন যে উপরের মতবাদ লেনিন শুধু রাশিয়ার ক্ষেত্রেই বলেছিলেন। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। লেনিন বার বার বলেছেন যে অন্যান্য দেশের শ্রমিকের সাহায্য না পেলে রাশিয়ার শ্রমিকরা শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করতে পারবে না ; বিশ্ব-বিপ্লব, অন্যান্য প্রগতিশীল সাম্রাজ্যশালী দেশের শ্রমিকবৃন্দ ও শোষিত জনগণের (শ্রমিক ও কৃষক) সাহায্য না পেলে সম্ভব হবে না। সুতরাং লেনিন উপ-নিবেশের যখন শ্রমিক বা কৃষক বলেন তখন বিশ্বের শ্রমিক ও কৃষকের কথাই বলেন। বলশেভিকবাদে রাশিয়ার একছত্র অধিকার নয়। কিন্তু ট্রটস্কি কৃষকদের ওপর মোটেই আস্থাবান ছিলেন না। তাই লেনিন বলেছিলেন যে ট্রটস্কি কৃষকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে আসলে উদারনৈতিক শ্রমিক দলের (Liberal labour-politicians) মুষ্টিগত হচ্ছেন।

বিশ্ববিপ্লব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ট্রটস্কি বলেছেন, যে পরশ্রমজীবীরা (Bourjeois) ও কৃষকেরা শ্রমিকদলের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে ; শ্রমিকরা যখন জয়লাভের ফল ভোগ করতে গিয়ে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ঘা দেবে, তখন তারাই হয়ে উঠবে শ্রমিকদলের শত্রু। রাশিয়ায় ধনতন্ত্র এখনো পশ্চাৎপদ সুতরাং কৃষকের সংখ্যা শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশী—ফলে শ্রমিকের শত্রুরাই দলে ভারী। তাই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে আন্তর্জ্জাতিক ধারায় বিশ্বজোড়া শ্রমিকবিপ্লব। ট্রটস্কি তিনটি বিষয়ে লেনিনের বিরুদ্ধবাদী হচ্ছেন :—

(১) লেনিন বলছেন শ্রমিক ও কৃষকের সহযোগিতাই বিপ্লবের ভিত্তি। ট্রটস্কি বাধাচ্ছেন তাদের মধ্যে বিরোধ।

(২) লেনিন শ্রমিককে করতে চাইছেন নেতা। ট্রটস্কি খুঁজে বার করছেন নেতা ও নীতের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

(৩) লেনিন চাচ্ছেন শ্রমিক ও কৃষকের সম্মিলিত শক্তির সাহায্য। ট্রটস্কি আশ্রয় করছেন বিশ্বের শ্রমিকদের, বাদ দিচ্ছেন কৃষকদের।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ট্রটস্কির মতে রুশবিপ্লবকে বিশ্ববিপ্লবের অপেক্ষায় (লেনিনের মতে যা সুদূর পরাহত) পচতে হবে। তার কোন ভবিষ্যতই নেই, কোন আশা নেই—সেটা শুধু একটা খেয়ালের সৃষ্টি। এই মতবাদের সঙ্গে মেন্‌শেভিক্‌বাদের কোন তফাৎ নেই। যে বিপ্লববাদ কৃষক সম্প্রদায়কে একেবারে বাদ দিতে চায় তার আশা ও নীতিকে কখনো সমর্থন করা যেতে পারে না।

লেনিন বলেছেন, সকল দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সমান তালে চলে না। পশ্চাৎপদ দেশগুলি তাদের প্রাপ্ত অবস্থা থেকে বিচলিত হতে চায় না। উন্নত জাতিরা নতুন জয়যাত্রার পথে এগিয়ে যেতে চায়, যার ফলে হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। জার্ম্মান মাল যখন জগতের আসন থেকে ফরাসী ও বৃটিশ মালকে সরাতে আরম্ভ করলে, জাপানী মাল যখন রাশিয়ায় উৎপন্ন মালের চেয়ে উৎকৃষ্ট হোল তখনই বাধলো গত মহাযুদ্ধ। সারা জগৎকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাতি করছে শোষণ। তাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই সূচিত করে বিপ্লবের জয়। যেখানে সাম্রাজ্যবাদ বেশ ভাল করে শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি, সে দেশ যদি ধনতন্ত্রের পথে পেছিয়েও থাকে তবু সেখানে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব। সেইজন্য ধনতন্ত্র পরিবেষ্টিত একটিমাত্র দেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সেই দেশের বিজয়ী শ্রমিকদল অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের বিপ্লবে প্ররোচিত করবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে। এই নীতি ষ্টালিন বরাবর মেনে চলেছেন। দেশে দেশে আজ সাম্যবাদী দল গড়ে উঠেছে। স্পেনে ও চীনে ষ্টালিন অস্ত্র সাহায্য কম করেননি। স্পেনে সাহায্য প্রেরণ ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার তাই চেষ্টা সফল হয়নি। আর চীন আজ তাঁর জন্যই এত সুন্দর ভাবে আত্মরক্ষা করছে। যাহোক, তাহলে আমরা দেখছি যে ট্রটস্কি বিশ্ববিপ্লবের সাহায্য বিনা রুশ বিপ্লবের সফলতায় বিশ্বাস করেন না কিন্তু লেনিন করেন। অবশ্য বিশ্ব-শ্রমিকের সাহায্য ছাড়া রুশশ্রমিকরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে পারে না। কিন্তু সে সাহায্য মানে বিশ্ববিপ্লব নয়। সে সাহায্য হচ্ছে তাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্য নিজেদের গড়ে তোলা। ষ্টালিনের কথা আড়ম্বরহীন, বাক্যে অলঙ্কার নেই, কিন্তু তিনি লেনিনবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী একথা

তিনি প্রতিপদে প্রমাণ করে এসেছেন। আর তাঁর পন্থা যে নির্ভুল একথাও আজ জগতের জানতে বাকী নাই। ১৯০৫ সালে যে বিশ্ববিপ্লবের মতবাদকে ত্যাগ করা হয়েছিল, অক্টোবর বিপ্লবের সময় অর্থাৎ ইতিহাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেই মতবাদকে নির্ভুল বলে তিনি নতুন করে বরণ করেননি।

পাঁচটি বিষয়ের ওপর ধনতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে :—

(১) ধনতান্ত্রিক দেশের পরশ্রমজীবী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ।

(২) শাসক দেশ ও শাসিত দেশের বিরোধ অর্থাৎ স্বাধীনতামূলক বিরোধ।

(৩) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর বিজেতা ও বিজিতের আক্রোশমূলক সম্বন্ধ।

(৪) সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরোধ। (সোভিয়েট ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিরোধ।

গত মহাযুদ্ধের পর যে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল রাশিয়া ছাড়া অন্য দেশে সে আগুন নিভে এল। শোষণকেন্দ্র স্থানান্তরিত হোল ইউরোপ থেকে আমেরিকায় কারণ আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করা দরকার। ফলে ইউ-রোপের শ্রমিক সম্প্রদায়ের ওপর করের ভার বাড়ানো হোল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ইত্যাদি উপনিবেশেও শোষণ নীতি আরো পুষ্টিলাভ করতে লাগলো। শ্রমিক ও জনগণের দুরবস্থা বাড়তে থাকলো। এইভাবে উপ-নিবেশগুলি শোষিত হতে লাগলো ইউরোপের দ্বারা এবং ইউরোপ শোষিত হতে লাগলো আমেরিকার দ্বারা। ধনতন্ত্র কায়েম অবস্থা প্রাপ্ত হোল কিন্তু বামপন্থী বিপ্লবের জন্য জনগণ শক্তিসঞ্চয় করতে লাগলো। ফলে ধনতন্ত্রের ভিত্তি সুগঠিত হোল না। উপনিবেশগুলি শিল্পোন্নতির, শিক্ষার উন্নতি ও অত্যাচারের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করলে। এই সংগ্রামের মূলে যে আমেরিকার ঋণ পরিশোধ ও ধনতান্ত্রিক শোষণ নীতি সে কথা অস্বীকার করে সাম্রাজ্যবাদীরা বলশেভিকদের বিপ্লবের বীজ ছড়ানোর কথা প্রচার করতে লাগলেন। যাই হোক চীন সাম্রাজ্যবাদীদের তাড়াতে পেরেছে, অন্য দেশও একদিন তাড়াবে।

গত যুদ্ধের পর ভার্সাই ও লোকার্নোর সন্ধি, ভয়েস্ প্লান এইগুলি ইউরোপে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে একটি গণ্ডী টেনে দেয়। তার ফলে সুরু হয় জার্ম্মাণীর ওপর আর্থিক শোষণনীতি। সেই শোষননীতির মূলেও আমেরিকার ঋণ। জার্ম্মাণ জনগণের ওপর দুদিক থেকে চাপ পড়লো—একটি জার্ম্মাণ পরশ্রমজীবীদের হাতে আর একটি বিদেশী মূলধনীদের হাতে। এই দুই চাপে পিষ্ট হয়ে জার্ম্মাণ জনগণ বিপ্লবমুখী হতে লাগলো। সুতরাং ভয়েস্ প্ল্যানের বুকে বিপ্লবের বীজ লুকানো। জার্ম্মাণ বিপ্লব এতদিন কৃতকার্য্য হোত যদি না জাতীয় সামাজিক দল সব ক্ষমতা পরশ্রমজীবীদের হাতে না তুলে দিতেন। তবু জার্ম্মাণ সাম্যবাদী দল অত্যন্ত সুগঠিত ও শক্তিশালী।

আমেরিকা ও বৃটেন দুটি বিজেতা জাতি এবং কাগজে কলমে তারা বন্ধু। কিন্তু আসলে তাদেরও ভিতরে ভিতরে স্বার্থ নিয়ে ঠোকাঠুকি চলে এসেছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী (আমেরিকান্) ও শেল্ কোম্পানীর (বৃটিশ) দ্বন্দ্ব বরাবর চলে আসছে। যেখানে তেলের খনি আছে সেখানেই এদের ঝগড়া। তার কারণ যুদ্ধে (আজকের যুদ্ধে) পেট্রলই জাতির যুদ্ধ করার শক্তি নির্ণয় করবে। বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যমূলক দ্বন্দ্ব, ইতিহাস প্রমাণ করেছে। গত মহাযুদ্ধের কিছু পর থেকেই বিজেতারা অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা সুরু করলেন। যুদ্ধের আগে তাঁরা অস্ত্রসজ্জার কারণ দেখাতেন জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা। কিন্তু যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীকে একরকম নিরস্ত্র করা হোল। তবে অস্ত্রসজ্জা কার বিরুদ্ধে? কে সেই অদৃশ্য শত্রু যার বিরুদ্ধে তাদের রণসাজ? অস্ত্রসজ্জিত শান্তি যুদ্ধের বীজ বহন করে এতো অজানা নয়। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও স্বার্থমূলক দ্বন্দ্বের জন্যই তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি।

সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপিত হবার পর বিশ্ব হোল দ্বিধা বিভক্ত। একটি হোল ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক জগৎ; আর একটি সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শে ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্লবপন্থী সাম্যবাদী জগৎ। পরশ্রমজীবীদের সহানুভূতি ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে, শ্রমিকদের সহানুভূতি সোভিয়েট আদর্শে। শ্রমিকদের সোভিয়েটের প্রতি আকর্ষণের কারণ সোভিয়েটের বিপ্লবে অভিজ্ঞতা ও শোষিতদের মুক্তিদান। পরশ্রমজীবীদের ধনতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতির মূল্য কতটুকু তা বোঝা যাবে যদি সেই ধনতন্ত্রের রূপ আমরা উপলব্ধি করি। সে

ধনতন্ত্রে কোন এককেন্দ্রিক মনোভাব নেই। স্বার্থের মিল নেই, পরস্পর সদ্ভাব নেই। সেখানে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক খাদ্যখাদকের সম্বন্ধ। সুতরাং সে তন্ত্রের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রেণী বিভেদ নেই সুতরাং স্বার্থের সংঘাতও নেই; সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই সেখানে সকলের লক্ষ্য। সুতরাং সোভিয়েট-এর ভিত্তি সুগঠিত। বিশ্বের বিপ্লবপন্থীরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে তাদের সন্তানের মত ভালোবাসে। বিভিন্ন দেশ থেকে সোভিয়েটে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয় সেখানকার প্রকৃত অবস্থা জানাবার জন্য। বিশ্বের শ্রমিকরা একজোট হয়ে আজ সোভিয়েটের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে—নানা জায়গায় নানা ধর্ম্মঘট, আকস্মিক বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে সেই সহানুভূতি তারা প্রকাশ করছে। ধনতন্ত্র আজ স্থাণু অবস্থায়। একদিন সে ছিল উন্নত আর সোভিয়েটের অবস্থা ছিল কঠিন। আজ ধনতন্ত্র স্থাণু, সোভিয়েট উন্নতিশীল। এই তো বিশ্ব-বিপ্লবের সূচনা। তার জমি তৈরী হচ্ছে বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে, যে যুদ্ধে আবার আমেরিকার অর্থ খাটছে প্রধানতঃ। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করতে চান (যার জন্য আজ কমিণ্টার্ণ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েচে) যে রুশ সাম্যবাদীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করেছেন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। বিপ্লবের জন্য সাম্যবাদীদের কোন বিশেষ প্রচার কার্য্যের দরকার হয় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যকলাপের জন্য অনেক সময় সোভিয়েটকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা দায়ী করেন তাঁরা ভুলে যান (ইচ্ছা করেই) যে কমিণ্টার্ণের নীতির ভিত্তি সন্ত্রাসবাদ বা ষড়যন্ত্র নয়। তাঁদের নীতি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবপন্থী জন আন্দোলন সৃষ্টি করা। আজ দেশে সে আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে উঠেছে, আন্দোলন হয়েছে প্রগতিশীল। এখন সে আন্দোলনকে জাতীয় নেতারাই পরিচালনা করতে পারবেন। তাই মিথ্যাবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষতিকর প্রচারকার্য্যের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যই কমিণ্টার্ণ আজ ভেঙ্গে দেওয়া হোল। ষ্টালিন বরাবর বলেছেন যে বিপ্লব দান হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, অন্য দেশ থেকে আমদানী করা যায় না, বা অন্য দেশে রপ্তানী করা যায় না। বিপ্লবের জন্য নিজেদেরই উপযুক্ত করে গড়তে হবে। বিপ্লব সুরু হলে সোভিয়েট সাধ্যমত

সাহায্য করতে প্রস্তুত। সেইজন্য সমাজতন্ত্রের কেন্দ্র সোভিয়েটকে দিন দিন সবল করে তোলা, ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের থেকে বাঁচানো ভবিষ্যৎ বিশ্বমুক্তির একমাত্র উপায়। আজ যদি যুদ্ধে সোভিয়েট পরাজিত হয় তার মানেই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও ধ্বংস। সেই ব্যর্থতার উদাহরণ দেখে সারা জগতের শোষিত জনগণ হতাশ হয়ে যাবে ও বিপ্লবের আশা ত্যাগ করবে। কিন্তু আজ যদি সোভিয়েট জয়লাভ করে, সেই জয় জগতের সমস্ত জনগণকে করবে আশান্বিত ও অনুপ্রাণিত। তখন তারা সাহস পাবে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মাথা তুলতে। তাই আজ প্রত্যেক শোষিত জাতির উচিত সোভিয়েটের জয় কামনা করা ও সম্ভবমত সোভিয়েটকে সাহায্য করা। তাই আজ প্রত্যেক জাতিকে তাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী তৈরী হবার জন্য ষ্ট্যালিন্ কমিণ্টার্ণ ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাই তিনি রজিটী ফোর্বসের কাছে বলেছিলেন, "আমি শুধু রাশিয়ায় গণ্ডীবদ্ধ নই—রাশিয়া নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্যই আমার এই অক্লান্ত পরিশ্রম।.....লেনিনের বাকী কাজটুকু শেষ করবার জন্য এগিয়ে চলেছি।.....আমাদের ক্ষতি আপনার কাছে খুব সামান্য বলেই মনে হবে, আপনি যদি একবার সেই দিনের কথা চিন্তা করেন যেদিন আমরা সমস্ত মানব সমাজটাকে একটী অভিনব সৃষ্টি দিতে পারবো।.....আমি আপনাকে বলছি বিদেশী আক্রমণের আশঙ্কা মানেই ঐক্য।.....প্রথমে আমরা নিজে প্রস্তুত হবো তারপর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকের উন্মুক্ত জানালা দুটোকে আমরা বন্ধ করবো।.....তারপর এক বা একাধিক যুদ্ধে সমস্ত দেশ আমাদের দলে এসে একত্রিত হবে.....এবারকার যুদ্ধে কোন দলই জিতবে না। কেবল রাশিয়াই তা থেকে হবে লাভবান।" (অরণি)

ষ্ট্যালিন মনে করেন যে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকদের সাহায্যে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদের রাজত্বে এখানে ওখানে কয়েকটি দেশের শ্রমিকেরা বাঁধন ভেঙ্গে তাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়বে যেমন গড়েছে রাশিয়ায়। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের মাঝে মাঝে ভাঙ্গন ধরায় তার ভিত্তি উঠবে নড়ে। বাঁধনমুক্ত দেশগুলির শ্রমিকেরা অন্য দেশগুলিকে সাহায্য করতে থাকবে। এইভাবে বিশ্বের বুকে অনেকগুলি সোভিয়েট কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এইভাবে যে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রথম জয় হয়েছিল তার সাহায্য ও অনুপ্রেরণা নিয়ে যখন

অনেকগুলি সোভিয়েট দ্বীপ গড়ে উঠবে সাম্রাজ্যবাদের মহাযুদ্ধের বুকে তখন একদিন আরম্ভ হবে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের জীবনমরণ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের ইতিহাস ও জয়ই হবে বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাস।

তাই যাঁরা মনে করেন যে একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের জয়লাভের কোন আন্তর্জাতিক পরিণতি নেই এবং সে জয়লাভ জাতীয়তা ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁরা ভুল করেন। আবার যাঁরা অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জ্জাতিক রূপ মেনে নেন অথচ বাইরের সাহায্য ছাড়া সে বিপ্লবের ফলাফল রক্ষা অসম্ভব মনে করেন, তাঁরাও ঠিক ভাবেন না। কারণ, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ণ জয়লাভে যেমন অন্য দেশের বিপ্লবের সাহায্য দরকার, তেমনিই অন্য দেশের বিপ্লবের জয়লাভের জন্য অক্টোবর বিপ্লবের সহায়তা এতটুকুও কম দরকার নয়। তাই আজ গণশক্তির কেন্দ্রকে বাঁচাতে হবে যদি বিশ্বের গণশক্তিকে আমরা জাগাতে চাই। লণ্ডন হোল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র। লণ্ডন ভেঙ্গে পড়লে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন যেমন অনিবার্য্য ঠিক তেমনি সোভিয়েট ভেঙ্গে পড়লে বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরাজয় অনিবার্য্য।

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

সাগরের ঝিনুক

সহর নয়। সাগর। বড় বড় হাঙ্গর, কুমীর—হাঁ ক'রেই আছে। ছোট বড় রুই-কাৎলাগুলো ঘাই তুলে মারে লেজের ঝাপ্‌টা। অগাধ আধিপত্য। জলের তলায় সব পরম সুখে খেলা করে।

গ্রাম নয়। হাজা-মজা নদী। যৎসামান্য ছিল ক'টা চুনো পুঁটি। তাও গোটাকয়েক সাগরে পালিয়ে গেছে। রয়ে গেছে ক'টা গুগ্‌লী।···মজা নদী পার হয়ে একদিন একটা গুগ্‌লী বুকে হেঁটে সাগরে এল।

একূল, ওকূল দেখা যায় না। গুগ্‌লী তো দূর থেকে দেখেই ঘাবড়ে গেল। যেন জলের আকাশ। থৈ থৈ করছে জল,···দিগন্তে সমাহিত। সমগ্র বিশ্বকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

গুগ্‌লীকেও ডাকলে...আয়!

সেই তো মজা নদী। পাঁকের ওপর একরত্তি গরম জল। সূর্যের প্রচণ্ড ঝাঁজ। দিনে দিনে কালো পাঁকে ধরবে ফাটল। তারপর কালো গুগ্‌লী হ'বে সাদা। শক্ত পাঁকে চূণের ডেলা হ'য়ে জমে থাকবে সে। ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে সাগরই তার ভাল।

গুগ্‌লী ক্রমেই এগিয়ে এল। উত্তাল তরঙ্গ, ··সমুদ্র গজরাচ্ছে। ঢেউয়ের বিঘূর্ণনে গুগ্‌লী পড়ল গড়িয়ে।·· সাগর তাকে গুটিয়ে নিয়ে চলেছে। শুনতে পেলে একটা গর্জন। মাথাটা আচম্বিতে পাক খেয়ে ঘুরে গেল। অনুভব করলে প্রচণ্ড এক ধাক্কা। সজোরে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে আছড়ে পড়ল।

চেয়ে দেখলে মাথার ওপর দিয়ে একটা সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। আর সে পড়ে আছে বালির চড়ায়। আশে পাশে অজস্র ঝিনুক। প্রতিনিয়ত তরঙ্গাঘাতে মাংসগুলো ধুয়ে গেছে। চিক্‌চিক্ করছে শক্ত আবরণ খোলাটুকু। সম্মুখেই, কিছু নীচে···সুবিপুল সমুদ্র গর্জন করছে।

ক্লান্ত গফুর বস্তীতে এসে দাঁড়াল। সহরের আবর্জনা নিয়ে আদিম মানুষগুলো এখানে সংসার পেতেছে। নোনা জলে তার রূপান্তর ঘটেছে। সে আর এখন গ্রামের গুগ্‌লী নয়। ওদেরই একজন, সাগরের ঝিনুক। বুঝি বা তাকে বালির চড়াতেই সমাধিস্থ হ'তে হ'বে।

গফুর কিন্তু রাজী নয়। সাগরে ডুব তাকে দিতেই হ'বে। কিছু আহরণ করতেই হ'বে। রোজ বার-আনা ভাড়ায় একটা রিক্সা নিয়ে এল।

মেহনত না করলে মজুরী পাবে না। গায়ে জোর আছে। গফুর কেয়ার করে না। রিক্সা চালাবে। দাপ্‌না এঁটে কাপড় বাঁধে। মাথায় জড়ায় গামছা—। পাঁই পাঁই করে রিকসা নিয়ে ছোটে।

আরোহী সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,···এই—এই!

গফুর সকৌতুকে ভেঙিয়ে ওঠে,···হোই—হোই!

দিনের আলো সহ্য হয় না। রাতই তার ভাল। বাজে লোকগুলো সব ঘুমিয়ে পড়ে। বেরিয়ে আসে কাজের লোকগুলো। রাতের সহরকে এরা ভালবাসে। সওদা করে। গফুরও ভালবাসে। রাতের লোকগুলোর দিল খুব দরাজ। সওদা করে লাভ আছে। রিকসার গদি তুলে মাথায় দিয়ে পড়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে দেখে নীচে ক'টা দোকান, ওপরে জানালার কাঁচে আলো—। রাতের আয়োজন ওধু ওদেরই জন্য। কিন্তু গফুর ভাবে, রাতের প্রয়োজন শুধু তারই জন্য—।

খালি গায়ে আস্তে আস্তে ছোটে! ঠুং ঠুং ক'রে হাতে বাজে ঘন্টি। রাতের বুকে থুপ্ থুপ্ করে পা ফেলে। রাস্তার জমাট স্তব্ধতা সরে সরে যায়।··· অল্প অল্প হাওয়া দেয়। রাস্তার আলোগুলো দোল খায়। ছায়াগুলো দু'ধারে নিঝুম বাড়ীগুলোর ওপরে পড়ে দোলে।·· অল্প ঝড় উঠেছে। গুঁড়ো গুঁড়ো ধূলোয় হিমেল হাওয়া। চাঁদকে দেখায় হল্‌দে।

হঠাৎ পিঠে লাগে ঠাণ্ডা ছাঁকা। আরোহী বমি করছে—। রিকসা নামিয়ে বেকুফ হ'য়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায় সে। মাথার গামছা খুলে পিঠখানা মুছে নেয়। দেখে, হড়হড় ক'রে আরও খানিকটা লাভাস্রোত ওর রিকসার ওপর গড়িয়ে পড়ল।

রাগে গফুরের গা জ্বলে গেল। এ যেন পয়সা খরচ ক'রে বাজী পোড়ান। খেয়েও খাবে না। পয়সা দিয়ে বমি কেনে। বিকৃত মুখে থুতু ফেলে, অর্থের পরিহাস!

সখ তারও হ'ল। উপায় দু'পয়সা সেদিন বেশী হ'ল। এক বোতল মদ কিনে নিয়ে গেল।

চামেলী কিছুতেই খাবে না। গফুরও ছাড়বে না। মিনতি করে, খাবার জিনিষ, লোকে খায়—খা না একটুখানি!

হেসে চাঁমেলী কাঁধ-আড়ালে নাক বেঁকিয়ে নেয়, না, তুই খা।

খা না! গফুর রসিকতা করে, মাইরি দিশী জিনিষ, খেতে হয়, বেশ মিষ্টি। চামেলি দেখে, তোবড়ান এলুমিনিয়মের বাটিটা গফুর তুলে ধরেছে। থল্‌থল্ করছে ফিকে রক্ত। রক্তে বান ডাকাবে। গফুর হাসছে।

খাবার জিনিষ, লোকে খায়। চামেলী একটুখানি খেলে। পরেই ঝাঁঝাল গলাটায় ঝাঁকানি মেরে ছুটে বেরিয়ে গেল।

গফুর আশ্বস্ত হ'ল। খানিকটা চামেলীর বাবাকেও খাওয়ালে। বৃদ্ধ আপত্তি করলে না। খানিকটা কেশে কালো ঠোঁটে চুমুক দিয়ে জলের মত টেনে নিলে। নিশ্চিন্ত হ'য়ে গফুর এবার নিজের জন্য বাগিয়ে বসল। হরদম চানাচুর চিবুল। বাজী সেও পোড়াল। হড়হড় করে এক গাদা লাল বমি ক'রে নেতিয়ে পড়ল।

পরদিন কাজে আর গেল না। শুয়ে রইল। চোয়া ঢেঁকুর বুকে এসে জেকে ধরেছে। ঘুম কি ছাই আসে! চোখ দুটো জ্বালা করে। চামেলী বলে, ওঠ! খালি মাটিতে শুয়ে আছিস কেন? সর···, চেটাই পেতে দি।

গফুর কথা কয় না। ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। ঘাড় তুলে দেখে চামেলী চলে যাচ্ছে। পরণে পিঠ-ফাটা বৃন্দাবনী সাড়ী। গফুর ভাবে, এত কম আয়ে মানুষের চলে না। রিকসা সে আর চালাবে না।···মজাসে ঘাড়ে চড়ে প্রেম করবে, বমি করবে। আর মজুরীর বেলায় ভিক্ষা দেবে। কিছুতেই সে রিকসা চালাবে না। এবার ড্রাইভারি শিখবে। গদীর ওপর বসে গাড়ী চালাবে। বড় হ'বে। কাজের লাঘব করবে।

মুখে একরাশ দাড়ি। মনে এক গাদা কল্পনা। কালি-ঝুলি মাখা হাফ-প্যান্ট পরে। মাথায় জড়ায় গামছা। গফুরের অভিনবত্ব দেখে আড় চোখে চামেলী হাসে। গফুরের দৃষ্টি কুটিল। দাঁতের ফাঁকে থুতু ফেলে বিড়ি টানতে টানতে কাজে বেরিয়ে যায়।

গাড়ীর গা ধোয়। চাকায় হাওয়া ভরে। দাঁড়ান গাড়ীর ষ্টেয়ারিংটা ধরে চাকা দুটো ঘোরায়। মেরামতির দোকানে সে কাজ শেখে। দিন একদিন আসে।

সেদিন গফুর দাড়ি কামায়। সহর থেকে কিনে আনে চার পয়সায় এক প্যাকেট সিগারেট। দুটো নিজে খায়। বাকীগুলো বুর্জোয়া-হেলায় চামেলীর বাবাকে দেয় ছুঁড়ে। খুশীতে বুড়ো খুক্ খুক্ ক'রে কাশে। আর চেয়ে চেয়ে হাসে।

দেখে চামেলী মনের হাসি ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে। খুশীতে গফুর গুম হ'য়ে আসে। বাইরে এসে অকারণে নাক ঝাড়ে। গামছা দিয়ে নাক মুছে সযত্নে মুখটাও নেয় একটু রগড়ে। আকাশ পানে তাকায়। মুখে দিব্য আরামে হাত বুলায়। পরিষ্কার দাড়ি কামিয়েছে। আকাশে পরিষ্কার তারা ফুটেছে।

প্রথম মাসের মাইনে পেল। আর্শি কিনলে, চিরুণী কিনলে আর কিনলে দু'বোতল 'বাঘা' মদ। চামেলী বলে, এ বাব্বা, এতো মদ কে খাবে গো? বুড়ো বাবা তার হেসে রেগে দাবড়ে দেয়, খাবার লোক অনেক আছে, তুই থাম!

ভরসা পেয়ে গফুর বোতল দুটো ঠক্‌ঠক্ ক'রে নামিয়ে রাখে। চামেলী রাগ করে। কথা কয় না। তবু অযথা গফুরের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে যায়। গফুর হাসে। চামেলী হাসে না। গফুর ভাবে, বয়েই গেল!··· চামেলীর দাঁতগুলো কালো। না হাসলেই দেখায় ভাল।

হাসলে দেখায় ভাল শীলাকে। কলেজে পড়ে, বাবুদের মেজ মেয়ে। চামেলীও মেয়ে।···কিন্তু শীলার কপালে কেমন দীপ্তি, চোখে কেমন আলো।

চামেলীও মেয়ে। কিন্তু কোথাও এতটুকু চক্‌চকে নয়।

গফুর সাবান এনে দেয়। বলে, গায়ে মাখিস।

চামেলী কত খুশী। বলে, মাখব।

হলদে সাড়ী কিনে এনে দেয় গফুর তাকে। বলে, পরিস।

চামেলী হাসে। বলে, পরব।

ফুল্ল হ'য়ে এবার তাকে চুপিচুপি কাছে ডাকে গফুর, আর শোন! চামেলীর ভারী লজ্জা করে। প্রায় গায়ের ওপর এসে দাঁড়ায়: কি?

—দেখ, সাবান মেখে নতুন শাড়ী পরবি আর চুল বাঁধবি। কাল দুপুর বেলা মোটর নিয়ে আসব। বেড়াতে যাব, এ্যাঁ?

কোন দিগন্তে রঙীন বিদ্যুৎ চিক্কির দিয়ে ওঠে। চামেলী যায় ঝলসে। চোখের ভ্রূ দুটো কাঁপে। গফুর নির্ভীক। দু'চোখে তার উদ্ধত কামনা। সে হাসছে।

ঝক্‌ঝকে একখানা মোটর গাড়ী এসে পরদিন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বনে যেন বাঘ এসেছে। আদিম মানুষগুলো বস্তীর ভেতর থেকে উঁকি মেরে কলবলিয়ে উঠল। দরজা খুলে গফুর সরে দাঁড়িয়েছে পাশে। পরণে হলদে শাড়ী, চামেলী এসে গাড়ীর সামনে দাঁড়াল। গফুরের কণ্ঠস্বরে আশ্বাস। যা উঠে যা!

—না। ভয়ে চামেলী পিছিয়ে আসে।

—ভয় কি? আমি তো রয়েছি। আয়! বলে বাঁ হাতে চামেলীকে ঠেলে নিয়ে নিজেও সে উঠে পড়ে।

দুপুর রোদে গাড়ীখানা থরথর ক'রে কাঁপছে। পাশাপাশি দু'জনে বসেছে। পিছনে দুটো মুদু ঝাঁকানি ঠেলে নিয়ে গাড়ীখানা সাঁৎ ক'রে গড়িয়ে গেল। বন্য-বিস্ময়ে আদিম মানুষগুলো হাঁ ক'রে চেয়ে রইল।

চামেলী কাঁপছে। পৃথিবী কাঁপছে। সহরের বাইরে তীব্র বেগে গাড়ী ছুটছে। গফুর দেখছে চামেলীকে। কপালে নীল উল্কি। নিটোল পুষ্ট একখানা শক্ত মুখ। ভরাটি গালে বাদামী জালি। মধুবর্ণা শালিগ্রাম।

গফুর গাড়ীর মুখ ফেরাল।

শীলা আর চামেলী। প্রভেদ-তত্ত্বে তথ্য খুঁজে পায় না সে। সুযোগ পেলেই উৎসুক দৃষ্টি তার নির্নিমেষ হ'য়ে আসে। দেহ নয়, যেন এক গাদা সাপ। প্রতি পদক্ষেপে সবগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে। সবুজ বনানীর ওপরে উঠেছে রামধনু। গফুর চেয়ে থাকে, যেন বুনো মানুষ।

বিষাক্ত সাপ ওর চোখে মেরেছে ছোবল। চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে থাকে। মনের স্থৈর্য ফেলে হারিয়ে। অকারণে শীলাকে কলেজ যাবার পথে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। ড্রাইভারের পাশে বসে শীলা বুঝতে পারে। চাকরী সে ছেড়ে দেয়।

ক্ষুব্ধ বিতৃষ্ণায় আত্মা নিগৃহীত। সেই সহর, সেই ক্ষিপ্রগতি···উত্তাল তরঙ্গ বইছে। যুদ্ধ প্রত্যাগত পরাজিত সৈনিক, পরিশ্রান্ত পদে চলেছে সে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। সহরের অনাদরে চাঁদ গিয়ে উঁকি মারে বস্তীতে। অর্থহীন হ'য়ে চাঁদ দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে নিয়ে কেউ ওখানে বিলাস ক'রে না। বিলাপে চাঁদ বস্তীর ওপর থরথর ক'রে কাঁপে।

চামেলীরও চোখ কাঁপে। চামেলী আজ চাঁদ দেখে। অন্ধকার খুবড়ীর মধ্যে পড়েছে চাঁদের আলো। বিড়ি ফুরিয়ে গেছে। বুড়ো বাবা ভেতরে বসে খুক্‌খুক্ করে কাশছে। গফুরও নেই যে এনে দেবে। কোথায়, কতদূরে চলে গেছে, কে জানে। চামেলাকে বলে যায়নি। চামেলীর চোখ কাঁপে। চামেলী চাঁদ দেখে।

পুরান পৃথিবীকে তার মনে পড়ে। গফুর গাড়ী চালাচ্ছে। পাশে বসে আছে সে। ভয়ে সবুজ গাছের দল দু'পাশে ফাঁক হ'য়ে সরে যাচ্ছে।···মাঝ খানে কালো পিচের পথ, জলপ্রপাতের প্রকম্পিত ধারায় গড়িয়ে পড়ছে···

যেন স্বপ্ন! বাঙলা দেশের বাঁশবনে কবে যেন ময়ূর এসে পেখম ধরেছিল!

সত্য আজ। বাস্তব আজ। হল্‌দে শাড়ীখানা তৈলাক্ত কালি হ'য়ে গেছে। চিরন্তন ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে সহরে যায় ভিক্ষা করতে।

ভদ্রলোকের ছেলে। চোখে শানিয়ে ওঠে শকুনি দৃষ্টি। হাতে ভাত নিয়ে ইসারায় কুকুর ডাকে। চামেলী তাকে অনুসরণ করল ভাতের লোভে।

প্রাগৈতিহাসিক বনে নেমেছে যেন বাদুলে ছায়া। নিরালা অন্ধকার গুহা···! চামেলী ভড়কে যায়। পালাবার শক্তি জাগে না। রক্ত-পায়ী বাদুরের সম্মোহিত হাওয়ায় ঝিমিয়ে আসে সর্ব শরীর। দেখছে···নখে দন্তে মাংসাশী জানোয়ারের চোখ দুটো জ্বলছে।···চামেলী যায় মুষড়ে, রোদ-না-পাওয়া চারা গাছের মত···

বাইরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবী। ঝুলি কাঁধে বস্তীতে ফিরে চলেছে চামেলী। যৌবনের প্রায়শ্চিত্ত, হাতের মুঠোয় ক'টা পয়সা। বাসি দুধের গন্ধ পাচ্ছে সে নিজের ঘামে। শীর্ণ সামর্থ্য। বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে দেখলে পশ্চিম আকাশে একটা পাখী উড়ে চলেছে। আরও দূরে···শুভ্র মেঘের একটা দীর্ঘায়িত ঢেউ নিশ্চল হ'য়ে শুয়ে রয়েছে।

বুড়ো বাবা আর উঠতে পারে না। শুয়ে শুয়ে কাশে। আয়ুর শেষ হাওয়ায় পাঁজরাগুলো দ্রুত ওঠে আর নামে। অদম্য কাশিতে বুড়ো সেদিন

ধনুকের মত বেঁকে গেল। পাশে বসে ছিল চামেলী। গলা চিরে থোকা থোকা খয়েরের কাত বেরুল।

অন্ধকার কবরে যেন একটা পোকা মরে গেল।

পাশ দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন। চামেলীর আর্দ্র দৃষ্টি ফুঁড়ে ঝাপসা একটা ইঞ্জিন মত্ত হুঙ্কারে চলে গেল। ধাতব গর্জন তার ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে। রেল-কোয়ার্টারের ভিতে ভিতে নেমে আসছে ম্লান অপরাহ্নের অলস ছায়া। সবুজ ফুটবল মাঠের ওপারে উড়ছে প্রলম্বিত ধূম্র-শিখা।... চাল কলের চিমনি।

ওলো, ও-আবাগীর বেটি! ওকি কচ্ছিস?

চামেলী ঘাড় ফিরিয়ে দেখে পিছনে দাঁড়িয়ে মালিনী হাসছে। কিছুটা বিস্মিত হ'য়ে চামেলী জবাব দিল, কেন, ধান শুকোচ্ছি!

—ওমা, হাত দিয়ে বুঝি কেউ ধান শুকোয়! পায়ের মাথা খেয়েছিস? হাতে যে ব্যথা ধরবে লো ছুড়ি। এতগুলো মাগী কাজ করছে রোজ, হাত দিয়ে কি পা দিয়ে ধান নাড়ে,—চেয়ে দেখতে পারিস না?

সান-বাঁধান বিরাট চত্বর। খণ্ডে খণ্ডে যেন সোনার পট্টি দেওয়া। চামেলী আর ভিক্ষা ক'রে না। প্রচুর খাদ্যসম্ভার নিয়ে তার কাজ। অঢেল, টুক্‌রো টুক্‌রো সিদ্ধ ধানের দানা। যত্ন ক'রে তাদের গায়ে হাত বুলায়। রৌদ্রতাপে জল মুছিয়ে দেয়।

মালিনী বলে, এত ক'রে বলি, হাতে কাজ এগুবে না। তবু তুই শুনবি না।

চামেলী অনুভূতির আবেদন তোলে, না, ধানে আমি পা চালাব না। যা খেলে পেট ভরে তাকে আমি লাথি মারতে পারব না।

—ইস্, লাথি! থাক লো থাক, খুব হয়েছে! বলে মালিনী এবার ধীর কণ্ঠে বুদ্ধিবৃত্তির কাছে যুক্তি আনে, যেটা সহজ হবে, টপ করে হবে—তাই ত করতে হবে।—না তোর মত হাত নেড়ে খেলা করলেই চলবে? ওলো, এ চাট্টিখানি ধান নয়, যে গায়ে হাত বুলিয়ে সোহাগ করবি। এ হ'ল দস্তুর মত কল।

অনুভূতির হার হ'ল। বুদ্ধিবৃত্তিই জিতে গেল। শেষ পর্য্যন্ত চামেলীকে পা চালাতে হ'ল। ঠাট্টা ক'রে মালিনী চোখ ঠারে, কিলো, ধানের ওপর

ভাতার-সোহাগ কোথায় গেল? হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে খুব যে লো পা চালাচ্ছিস,...উঁ, বলি ব্যাপার কি লো?

ঘর্মাক্ত মুখখানা চামেলী হাসি মুখে কাঁধ আড়ালে লুকিয়ে ফেলে। সরস লোমকূপে ভারী চামেলীর মুখ। যেন কমলা লেবুর খোসা। আড় নজরে চেয়ে মালিনীর দৃষ্টি আসে থিতিয়ে।

—হ্যাঁলা চামেলী, তোর পুরুষ কি ক'রে লো?

চামেলী উত্তর দেয় না। গালের বাদামী জালি খামখা আরক্ত হ'য়ে ওঠে। ত্রস্তে মালিনী গিয়ে ওর চিবুকটা টেনে চোখের ওপর তুলে ধরে:—ওলো আমার ভরা বয়সের সতী। কই মুখখানা দেখি? সতী হবি বয়েস হলে, এখন কি লো?...শোন! তোর কথা বাঁশী আমায় রোজ বলে। মাইরি বড্ড ধরেছে। কথা দি তাহলে,...কি বলিস?

মুখটা চামেলী টেনে নামিয়ে নিয়ে বলে, না।

—কেন, না কেন? পরাজয়ে মালিনী কথার খেই ফেলে হারিয়ে। একটু থেমে গলায় জোর টেনে বলে, কথায় বলে, যে সময়ের যা। এই তোর সময়, তাই আমার বলা। চুপ কেন লা, বল না! হ্যাঁলা শুনছিস?

সরে এসে মালিনী ওর অনাবৃত বাহুর খানিকটা ধরে, মুখের কথা, একটুখানি খসাবি বইত নয়। বাকী সব আমি গুছিয়ে দোব। মাইরি বলছি তোর মাথা খাই, বড্ড ধরেছে।...কি বলছিস, হ্যাঁ তো?

মুখখানা চামেলী শক্ত করে বুকের ওপর চেপে ধরে, আমি জানি না।

অত কড়া রোদেও মালিনীর মুখে ফুটল চাপা হাসি—। আঁচলায় মুখখানা রগড়ে মুছে নিয়ে গেরো খুলল। তারপর চোখ বুজে সূর্যপানে মুখ তুলে একটিপ দোক্তা ফেলে দিল দাঁতের ফাঁকে।

দূর থেকে ইসারা পেয়ে বাঁশী এসে হাজির হ'ল সামনে। দু'বগল দিয়ে কালো ঘাম গড়াচ্ছে। থলথলে নাভিকুণ্ডে লেগেছে ধানের ধুলো। মালিনীর চোখে দ্রুত ইসারা খেলে গেল।

পূবের হাওয়ায় ঠেল ধরেছে মেঘে। মেঘের দল উড়ে চলেছে পশ্চিম আকাশে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু ঢেকে গেল। দেখতে দেখতে মেঘের স্তর ঘোর কালো হ'য়ে উঠল।...মত্ত দানব উঠল গর্জে। প্রচণ্ড ঝলকে কালো

দেহ চিরে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তরেখা ছুটল। সহরের মাথায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভারী মাংসের পাহাড়,…গর্ভবতী তাড়কা রাক্ষসী।

ঠাণ্ডা ছায়ায় চামেলীর ঘরখানা অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে। অবসন্ন দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে মেঘের পানে। নির্লজ্জ কুকুরের মত বাঁশী একধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। ওর লোভাতুর দৃষ্টি কালো মেঘের মত চামেলীকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মেঘলা হাওয়ায় কাঁচা মাটির গন্ধ বইছে। বিতৃষ্ণ জ্বালায় চামেলী অস্বস্তি অনুভব করে।

—জল আসবে এক্ষুনি। চামেলী বলতে বাধ্য হয়। এই বেলা চলে না গেলে, শেষকালে এখান থেকে বেরুন মুস্কিল হ'বে।

বাঁশী কোন জবাব দেয় না। চামেলীর পানে চেয়ে থাকে। দৃঢ় সঙ্কল্প তার। চামেলীর কান্না পায়। বড় অসহায় সে। সুদৃঢ় স্মৃতিতে বাবাকে সে আঁকড়ে ধরে।…আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টি নিয়ে স্তরে স্তরে সে গত জীবনে ডুবে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

কতবার মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকাল। চামেলীর খেয়াল নেই।…মেঘ ছিঁড়ে আলো ফুটে এল। ধীরে ধীরে বৃষ্টি গেল থেমে। ঝকঝকে ধোয়া রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলছে। বাঁশীর কণ্ঠ তার কানে গেল আচম্বিতে।

—না, এবার উঠি—বৃষ্টি থেমে গেছে। বাড়ী যাই। চামেলীর আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টি ভেঙ্গে বাঁশী চলে গেল।

অন্ধকারেই দুটো খাদ্যকণা চিবিয়ে শুয়ে পড়ল চামেলী। হাল্কা মনে স্বস্তি নিয়ে শীঘ্রই সে ঘুমিয়ে গেল।…রাত তখন কতটা জানে না। কঠিন মাংসপিণ্ডের আস্ফালনে হঠাৎ তার ঘুম গেল ভেঙ্গে। বারবার আত্মরক্ষায় সে হাঁপিয়ে উঠছে—। বিস্বাদ জীবনে শুচিতাকে আগলে রেখে কেবল ধিক্কারই জমে উঠেছে। চোখের ওপর কাঁপছে মরুর মরীচিকা…। অসম্মতিকে সকৌতূহল নিরপেক্ষতায় সঁপে দিয়ে চামেলী অলস হ'য়ে শুয়ে রইল।

কলে আজকাল বাঁশীকে দেখে চামেলী মুচকী হাসে। মালিনীর কাছে দোক্তা চেয়ে খায়। বাঁশী আসে, যায়।…বসন্তের হাওয়ায় একদিন বর্ষার ভারী মেঘ আসে উড়ে। শরতের ভরা নদী দুকূল বেয়ে ছুটে চলে। হেমন্তের হাওয়ার

ধানের শীষ পড়ে নুয়ে। শীতের কুহেলী কুয়াশায় মাঠের ধান খামারে উঠে আসে।…চামেলীর মেয়ে হয়েছে—।

বাদামী রঙের যেন একটা বড় পুতুল। পাঁক-কাদার মত নরম। নির্বোধ পিণ্ডে টাট্‌কা রক্তের কেবলই অশান্ত ঢেউ খেলছে। বুকে নিয়ে চামেলী আস্তে করে চেপে ধরে। দুর্বোধ্য গুঞ্জনে ভাঙ্গা ঘরে ঘুরপাক খায়।

দুধে ধোওয়া রাতের আকাশ। তুবড়ীর ফুলে দিক্ দিগন্ত কাঁপছে। অন্ধকার খুবড়ীতে মেয়েকে পাশে নিয়ে অঘোরে চামেলী ঘুমুচ্ছে।

চোরের মত সন্তর্পণে এক ছায়ামূর্ত্তি এসে ঘরে ঢুকল। দেশলাই কাঠির মুখে ক্ষুদ্র আলো তার হাতে।…ঘুমন্ত চামেলীর গলার খাঁজে কাঁপছে শ্বাস-নালী। যেন মড়ার মাথা, তিনখানা দাঁত হাঁ হ'য়ে রয়েছে। মা ও মেয়ে। পাশাপাশি পরম নির্ভয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

ঘুমের ঘোরে চমক লাগল চামেলীর। ঠেলে ঠেলে কে যেন তাকে নড়াচ্ছে।…নিশ্চয় বাঁশী। অবচেতনার দুয়ারে বাসনার করাঘাত শুনে শুনে সে অভ্যস্ত।…মদ খেয়ে এসেছে বোধ হয়। মেয়ের গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চামেলী পাশ ফিরল।

—চামেলী…চামেলী!

চামেলীর ঘুমের জড়তা এল থিতিয়েঃ কে?

—আমি। ওঠ্!

যেন পরিচিত, বিস্মৃত। চামেলীর চোখের পাতা খুলে গেল।…দূর মাঠে —রাতের আলেয়া কাঁপছে তার চোখে। অকস্মাৎ দেশলাইয়ের ক্ষুদ্র আলো উঠল জ্বলে। পরম বিস্ময়, পরম নির্ভয়….চামেলী চেয়ে আছে নির্ণিমেষে। আলো নিভে গেল। গফুর—।

—বাবা কোথায়?

—নেই। মরে গেছে। চামেলী উঠে বসল।

—পাশে ওটা—তোর মেয়ে বুঝি?

অধোবদনে অবিবাহিতা গুটিয়ে এল। দু'জনেই নীরব।…অন্ধকার গহ্বরে অতীতের কুয়াশা পাক খাচ্ছে। আনমনে চামেলী মাথায় কাপড় টেনে সরে এল।

—এতদিন কোথায় ছিলি ?

—হেরে পালিয়ে গেছলাম, অনেক দূরে। আজও হেরেই পালিয়ে এসেছি।....নে, ধর! আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।

চামেলী সঠিক কিছু ধারণা করতে পারলে না। ঝনাৎ ক'রে ওর কোলের ওপর ভারী একটা জিনিষ পড়ল।....লম্বা একটা গেঁজে। টাকায় আর নোটে ঝন্‌ঝন্ করছে। শক্ত ক'রে গেঁজেটা মুঠোয় চেপে চামেলী উঠে দাঁড়াল।

—কি হ'বে ?

—তোকে দিলাম।

—কি করব নিয়ে ?

বিস্ময়-প্রহারে গফুরের ভ্রূযুগল এল সঙ্কুচিত হ'য়ে। মুহূর্ত্তে দৃষ্টি হ'য়ে উঠল প্রখর, তির্যক। পরেই, ভোলা হাসিতে পেট থেকে গলা পর্যন্ত ঘরঘর ক'রে উঠল, পাগ্‌লী!

—বলেই দ্রুত ভঙ্গিমায় বাইরে পানে পা বাড়াল।

—দাঁড়া। কোথা যাচ্ছিস ? ত্বরিতে চামেলী এসে পথ রুখে দাঁড়াল। গতিস্ফূর্ত্ত পেশীগুলো রুখে নিয়ে গফুর জবাব দিল, উপায় করতে।

—এই তো করে এনেছিস। এতেই হবে।

—না, আরও চাই।···সর, আমায় যেতে দে। পিছনে পুলিশ লেগেছে। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। বলে কালো বিড়ালের দৃষ্টি নিয়ে গফুর সম্মুখে ভ্রূকুটি হানলে।...তারার আলোয় দীর্ঘায়িত রেল লাইন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতের বুকে থাবা মেরেছে স্তব্ধতার বাঘ। হিংস্র হুঙ্কার গুমরে নিয়ে রক্ত খাচ্ছে।

—চল্লাম চামেলী। টাকা দিয়ে গেলাম, মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধিস।

উদ্দীপ্ত আশায় চামেলী হৃদয়কে প্রসারিত করে ধরে, আর তুই ?

গফুরের কানে সেকথা গেল কিনা, কে জানে। সে চলে গেল। সুতীব্র বেদনার ঝঙ্কারে চোখ ফেটে চামেলীর জল গড়িয়ে পড়ল। পুঞ্জীভূত তারার আকাশ মাথায় নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সে। ···দূরে, গ্যাসের আলোয় প্রজ্বলিত মড়া-ছায়া। ছায়ালীন হিংস্র দ্বিপদ,···গফুর চলেছে।

বিরাট কালো পাহাড়···কন্দরে কন্দরে আদিম মানুষেরা ঘুমুচ্ছে। উচ্চ শীর্ষে চাঁড়িয়ে চামেলী। দেখছে,—সবুজ-রঙা দ্বীপ উঠেছিল...দূর সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে।

গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণস্রোত

অজানা এক অন্ধকার গুহার গহ্বরে
আমার রক্তের স্রোত বারে বারে
মাথা গুঁজে মরে।
স্তিমিত অরণ্য স্বাদ
ভুলে গেছি গুহার গান
হৃদয়েতে অবসাদ
পূর্ণিমার দিন অবসান।

রাজপথে কঙ্কালের খেলা
মানুষ নয়, পশুও নয়
শুধু শীর্ণকায় ছায়ার মেলা।
শূন্য দৃষ্টি চোখে জল
এক মুষ্টি চাল, কিছু ফ্যান, একটি পয়সা
তাও নয় ?
নুব্জদেহ রাজপথে নিশ্চল!

রক্তস্রোতে নামে জোয়ার।
সোনার ক্ষেতের ধান কোথায় উধাও!
ওদেরই ডেকেছি বার বার
"অন্ন দাও, প্রাণ দাও, গতিরে বাঁচাও।"

আর আজ,
অন্নহীন, পথহীন, আশাহীন ওদের হৃদয়ে
নিশ্চল রক্তের স্রোত,
শূন্য পাত্রে চোখ দু'টি নেমে আসে ভয়ে।

তবু জানি রবে না এদিন।
কর্ষিত মাঠের মাঝে একদিন
শুনা যাবে ফসলের গান,
ধমনীতে আসিবে জোয়ার
অন্ধকার ওদের গৃহে উন্মুক্ত রবে দুয়ার,
কোটি প্রাণে জাগে আশা,
দূর হ'তে ভেসে আসে অঘ্রাণের ঘ্রাণ।

হৃদয়েতে রক্তস্রোত আবেগ অধীর,
আশা দেয় সঙ্ঘবদ্ধ মজুর কিষাণ
"সীমান্তে সৈনিক চাই" হৃদয় অস্থির
দিকে দিকে ডাক দেয় নবান্নের ধান॥

অমৃতকুমার দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

সংকট ও সংগঠন

Diagnosis of Our Time. Karl Manheim. Kegan Paul.

এটি অধ্যাপক ম্যানহিম সম্পাদিত সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালার প্রথম বই। সমাজগণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে রচিত এই বক্তৃতা ও নিবন্ধগুলিতে এই দেশ-বিতাড়িত সমাজতাত্ত্বিক বর্তমান ব্রিটেনের সামাজিক সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সংগঠনের একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন।

প্রথমে ম্যানহিম দেখিয়েছেন যে সাম্প্রতিক সংকট হোল উনিশ শতকী স্বৈরাচারী ব্যবস্থা হতে পরিকল্পনানিয়ন্ত্রিত সমাজ সংগঠনে পৌঁছনর মাধ্যম অবস্থা। বর্তমানের গণসমাজ কতগুলো আর্থিক, রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক টেকনিকের দ্বারা পরিচালিত। টেকনিক বলতে ম্যানহিম সেই সব প্রধান সামাজিক পদ্ধতির কথা বলছেন যাদের ভেতরে সমাজব্যবস্থার চাবীকাঠি রয়েছে; এরা মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত, এদের প্রয়োগের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও যোগ্যতা প্রয়োজন। উনিশ শতকী যুদ্ধব্যবস্থা সাধারণের অনায়ত্ত ছিল না, বর্তমানের মেকানাইজড্ সামরিক শক্তি অপটু হস্তক্ষেপের বাইরে। বর্তমান যুগের উৎপাদন পদ্ধতি, চলাচল ব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ, বেতার, প্রেস অপটু গণশক্তির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয়ের হাতে প্রচুর শক্তি এনে দিয়েছে। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রপদ্ধতির উদ্ভব ততখানি মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের ফল নয়, যতখানি এই সব টেকনিকের ব্যবহারের ফল।

সামাজিক সংগঠনের সাথে সাথে এসব টেকনিক অবশ্যম্ভাবী, এদের ভাল-মন্দ প্রয়োগকারীর ইচ্ছাসাপেক্ষ। এদের উদ্ভবের সাথে সাথে প্রশ্ন হচ্ছে কি সামাজিক প্রেক্ষিত দিয়ে এই টেকনিকগুলির একটি সমগ্র পরিকল্পনায় একত্র সন্নিবিষ্ট করা যায়। টেকনিকের পারস্পরিক সাহচর্যে সামাজিক শ্রম স্বল্পতর হয়, সমাজ অধিকতর উদ্দেশ্যমূলক হয়ে ওঠে। এর জন্য দরকার গণমনে কয়েকটি প্রাথমিক মূল্যমানের সঞ্চার। যেখানে টেকনিকগুলির চাবীকাঠির

সাহায্যে মুষ্টিমেয়ের মূল্যমান যৌথ গণচেতনায় চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে সমাজের সমষ্টিগত মঙ্গল মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ, ব্যবহার রীতি এবং পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারা খণ্ডিত, খর্বিত : সে ব্যবস্থাকে বলে গ্লেইরশালটুঙ্গ্ বা গুজ্ষ্টেপ। অপর পক্ষে যে ব্যবস্থায় এসব টেকনিক জনসাধারণের সচেতন যৌথ ব্যবহারের দ্বারা স্বেচ্ছাস্বীকৃত প্রাথমিক সমাজপ্রেক্ষিত প্রবর্তন করে তাকে বলা চলে যথার্থ গণতন্ত্র। উনিশ শতকী উদারনীতি নিরপেক্ষতাকে ঔদার্য বলে কল্পনা করেছিল। সমগ্র রাষ্ট্র অপর পক্ষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং বিচার-বোধের অস্বীকারের পর কায়েম হয়ে যাবে। ম্যানহিমের ধারণা সক্রিয় গণতন্ত্র এ উভয় ত্রুটিকে অতিক্রম ও সামাজিক জীবন নির্বাহের শ্রেষ্ঠতর পথ দেখাবে। সমাজ সংগঠনের জন্য যে সব মৌল আদর্শের সামগ্রিক স্বীকার আবশ্যক তাদের ছাড়া জটিল ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচার এবং স্বাধীন পরীক্ষার অধিকারকে অস্বীকার করা সমাজের পক্ষে হানিকর। অপর পক্ষে সমাজসংগঠনে অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূল্যকাঠামো সম্বন্ধে কোন কল্পিত নিস্পৃহতা বা শিথিলতা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই ভাঙ্গনের সূচনা করে। এ লড়াইয়ের জরুরী মত্ততায় সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে সব বিশেষ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সক্রিয় গণতন্ত্র তাদের টিঁকিয়ে রাখবে ; সাথে সাথে সচেতন ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকারে তাদেরকে সে সংযত করবে।

সুতরাং ম্যানহিম পরিকল্পনায় আর্থিক রাষ্ট্রিক সংগঠনের চাইতে প্রেক্ষিত প্রবর্তন বেশী জরুরী। প্রথমটার খড়কাঠ যে-টেকনিক অবস্থার চাপে তা আপনা হতেই উদ্ভূত হচ্ছে ; কিন্তু সেই খড়কাঠের যথাযথ সংস্থান মূল্যমান বা প্রেক্ষিতের অভাবে অসম্ভব। বাকী কটি প্রবন্ধই প্রধানত এই প্রেক্ষিতের আলোচনা। পূর্বে আমাদের প্রেক্ষিত ছিল স্বয়ংসিদ্ধ, বিভিন্ন সামাজিক স্তরে বিভিন্ন মূল্যমান অদ্বিতীয় ও চরম বলে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক স্তরাভ্যন্তরের গতি অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় এইসব স্বয়ংসিদ্ধ মান পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, ফলে স্বয়ংসিদ্ধতার জায়গায় এনেছে আপেক্ষিক অনিশ্চিতি। গোষ্ঠী জীবনের আত্মঘাতী অসংহত দ্রুত বিস্তার, প্রাথমিক প্রেক্ষিতের পরিবর্তে আহৃত আদর্শের প্রয়োগ, যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে প্রাক্‌যান্ত্রিক মানসিকতার অমিল, পারস্পরিক সংঘাতের ফলে বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের মূল্যমানের বহুবাচনিক অসংগতিবোধ—এসব কারণে আজ ব্যক্তি-ব্যবহার অনির্দিষ্ট ও ব্যক্তিমন কেন্দ্রবিচ্যুত হয়েছে।

মূল্যমানের এই সংকটে সক্রিয় গণতন্ত্রকে স্বৈরাচারী ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতগত নিরপেক্ষতা পরিহার করতে হবে। জনসাধারণকে বোঝাতে হবে ব্যক্তিগত বহু মতভেদ থাকলেও সমাজের মৌল ব্যবহাররীতিতে ঐক্য থাকা দরকার। এর জন্য এমন কোন সঙ্ঘের প্রয়োজন যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্তর, বয়স স্বার্থ, পরিবেশের বহুবাচনিকতাকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করে এক সমগ্র সামাজিক প্রেক্ষিতের সঞ্চারণ করবে। এই গতিশীল ঐক্য আনার পথে প্রধান বাধা অতীতের ঐতিহ্য এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থ। এই ঐতিহ্য ও স্বার্থকে অতিক্রম করে গতিশীল সক্রিয় যৌথ ব্যবহারের দ্বারা নতুন অবস্থার উপযোগী প্রেক্ষিত রচনার শক্তি আছে যুবকদের। যৌবনে শরীর-অভ্যন্তরে দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ঐতিহ্যের প্রভাব ক্ষীণ, সমাজ কাঠামোয় স্থান অনির্দিষ্ট থাকায় স্বার্থচেতনা অপ্রধান থাকে। একধারে সামাজিক প্রত্যন্তবাসী বলে যৌবনের বন্ধন কম, অন্যধারে যৌথবোধে যৌবন স্বভাবতই বলিষ্ঠ। দ্রুত গতিশীল সমাজে যৌবনের স্থান সব চাইতে অর্থপূর্ণ। ইংলণ্ডে আজও যৌবন স্বল্পক্রিয় ; অতীতের আনববৃত্তি তার যৌথবোধকে তামসিকতায় আচ্ছন্ন রেখেছে। আত্মরক্ষাশীল ব্যবসায়ী গণতন্ত্রকে সক্রিয় সম্মিলিত প্রেক্ষিত গণতন্ত্রে রূপান্তরের কাজে যৌবনের গতিশীল যৌথবোধকে নিয়োগ আবশ্যিক।

নতুন সমাজ গঠনের প্রধান উপায় হ'ল সমাজকে আত্ম-সচেতন করা। সামষ্টিক কল্যাণ এবং ব্যক্তির প্রয়োজনের ভেতরে সঙ্গতি রাখাই সমাজ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ম্যানহিমের মতে সফল সমাজব্যবস্থা তাই যা' নিষেধ নিরোধ যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার করে ; যা সামষ্টিক কল্যাণের জন্য নিষেধ এবং মাত্র ব্যক্তিগত নিরোধের স্বাতন্ত্র্য মানে, যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ব্যক্তি ও পরিবেশের সঙ্গতি আনায় সাহায্য করে, এবং এই সঙ্গতি আনতে যারা অক্ষম হয়েছে তাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করে।

পরিশেষে ম্যানহিম আলোচনা করেছেন, এই সক্রিয় গণতান্ত্রিক সমাজে খৃষ্টধর্মের কোন স্থান আছে কিনা। সামাজিক টেকনিকের ধাক্কায় স্বৈরাচারী নিরপেক্ষতা জখম হওয়ায় মূল্যগত নিশ্চিতি ফিরে পাবার জন্য আন্দোলন

সুরু হয়েছে। যুক্তির মারফৎ নতুন পরিবেশের উপযোগী মূল্যমান প্রসারের অবসর না মেলায় যৌথ আবেগ ও উদ্দাপনার সাহায্যে আদর্শগত কেন্দ্রগতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলেছে। ধর্মের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান এরি ফল। ম্যানহিম ধর্মের উৎস মৌল অভিজ্ঞতা (primordial experience) এবং তার বহিঃপ্রকাশ আচার পদ্ধতির ভেতরে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে এই যৌথ অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিত্বের সংহতিকেন্দ্র। এই মৌল অভিজ্ঞতার স্বীকারের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়া হবে সেখানে ব্যক্তিও পরিবেশের সঙ্গতি স্বার্থক। প্রাগ-ম্যাটিষ্ট মাত্র পারিপার্শ্বিকের সাথে ব্যক্তির বোঝাপড়ার পরেই ঝোঁক দিয়েছেন। ধর্ম সেখানে এই সঙ্গতির মূল্যমান হিসেবে মৌল অভিজ্ঞতার ওপরে জোর দিচ্ছে। সমাজের ইতিহাস প্রধানত এই মৌল অভিজ্ঞতাদের স্বীকৃতির ওপরে ব্যক্তি ও পরিবেশের সামঞ্জস্যের ইতিহাস। এই মৌল অভিজ্ঞতা যেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেখানে ব্যক্তি হয়েছে খর্বিত, সমাজও দ্রুত কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে। খৃষ্টধর্মের মৌল অভিজ্ঞতা ব্যাপ্টিজম্, ইউক্যারিষ্ট, ক্রুশ, সেন্ট প্রভৃতি প্রাথমিক রূপে যৌথ অবচেতনায় শেকড় গেড়েছে। হয়ত বর্ত্তমান যুগে রাশিয়াতেও বলশেহ্বিজম্ এই জাতীয় কোন যৌথ মৌল অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছে যার জোরে সে দেশের জনসাধারণ এত বড় একটা সংগ্রাম চালাতে পারল। মোটের ওপর ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় এই মৌল অভিজ্ঞতা পারিপার্শ্বিকের রূপান্তরে একটা প্রধান অংশ নেবেই। খৃষ্টধর্ম যে পর্যন্ত নিজের মত রীতি পদ্ধতিকে সাম্প্রতিক সমাজ সংগঠনের প্রয়োজনে রূপান্তরিত করতে পারবে মাত্র সেই পর্যন্তই তার মৌল অভিজ্ঞতা নতুন পরিকল্পনার কাজে আসতে পারে।

মোটমাট এ বইখানিতে ম্যানহিমের বক্তব্য এই। আমার এখানে উদ্দেশ্য তাঁর বক্তব্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, ত্রুটি দর্শান নয়। যাঁরা মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের পটভূমি, উদ্ভব এবং বিকাশের সাথে পরিচিত, ম্যানহিমের অধিকাংশ বক্তব্যই তাঁদের পরিচিত ঠেকবে: এসব কথা ডার্খিম, ওয়েবার, ডুহরিং, ওপেনহাইমার, কাউট্স্কির লেখায় বারবার পেয়েছি। এর বিরুদ্ধে যা বক্তব্য তা মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিনের লেখায় পাওয়া যাবে। দু'একটি কথা বলা চলে। যে সাম্প্রতিকতার ওজুহাতে ম্যানহিম পুরোন কাসুন্দি

নতুন করে চালাতে চেয়েছেন, তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য এ বইতে বা তাঁর পূর্ব্বেকার রচনা 'ইউওলজি য়ুটোপিয়া' এবং 'ম্যান অ্যাণ্ড সোসাইটি'তে পাওয়া যায় না। টেকনিকের উদ্ভবই যথেষ্ট নয়, তার যথাযথ প্রয়োগের ওপরে সমাজের প্রকৃত রূপান্তর নির্ভর করে। কিন্তু প্রয়োগ করবে কে? রক্তপাতের চাইতে যুক্তি প্রয়োগ সকলেই পছন্দ করে। মুস্কিল এই যে টেকনিকের পরিচালনা যাদের মুঠোয় তাদের চিন্তা সামষ্টিক সমাজকল্যাণের যুক্তিসহ নয়, অন্ধ লোভ আর ক্ষমতাস্পৃহা তাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে। ম্যানহিম মার্ক্সীয় শ্রেণীচেতনার চাইতে সমাজ-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন (পৃঃ ৬৪)। কিন্তু এ সমাজ-চেতনা যদি কুমারী-মাতার মত পবিত্র কল্পনা না হয়, তবে শোষক শ্রেণীর ওপরে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাবের প্রমাণ দিতে হবে। বিত্তশালীর পরে কর বৃদ্ধি, উৎপাদন বিনিময় এবং বিভিন্ন সামাজিক পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় অধিকারে আনা ইত্যাদি যুক্তি কিছুই প্রমাণ করে না কারণ রাষ্ট্রের ওপরে সমাজ-চেতন জনসাধারণের প্রভাব নিতান্ত নগণ্য এবং অনির্ভরযোগ্য। (এর কিছু যুদ্ধকালীন প্রমাণ এই গ্রন্থমালারই পরবর্তী প্রকাশ হরমান লেভির 'রিটেল ট্রেড্ অ্যাসোসিয়েশ্যনস্' গ্রন্থে পাওয়া যাবে)। সামষ্টিক সংগ্রামেও শ্রেণীরাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের দিকে নজর রেখে ব্যবহার পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করে। গণতন্ত্রের সক্রিয়তার প্রধান উপায় যদি রাষ্ট্রের দ্বারা শিক্ষার সম্প্রসারণই হয়, তবে শ্রেণীসমাজে তার সম্ভাবনা কতখানি?

বুর্জোয়া মনোবৃত্তি যে কি ভয়ানক শ্রেণীকেন্দ্রিক এবং আত্মরক্ষণশীল গত কুড়ি বছরের ইতিহাস তার হাজারো নজির দেবে। সংকটের চাপে ভাঙনশীল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তি যখন আন্তর্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে এবং ঘরের সমাজ ব্যবস্থায় নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য ঔপনিবেশিক ক্যাপিটালকে পর্যন্ত প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হ'ল। তখনো সাথে সাথে ক্রান্তিমুখী জর্মানিতে পুঁজিবাদ খাড়া রাখবার জন্য দেনায় ডোবা ইংলণ্ড টাকা ঢালতে কার্পণ্য করে নি, শ্রেণীস্বার্থ টিঁকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী য়ুরোপ, আবিসিনিয়া, চীনকে ফাসিস্তদের কাছে বলি দিয়েছে এবং তা নিজেদেরই প্রচুর ক্ষতি ক'রে। আজো যখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সহযোগীতার চরম মুহূর্তে পৌঁচেছে, তখনো আপ্রাণ চেষ্টা চলছে যুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবী যাতে পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে মুক্তি

না পায়। এ অবস্থায় শ্রেণীশক্তির সক্রিয়তা ছাড়া বুদ্ধি এবং কল্যাণবোধের দ্বারা হৃদয় পরিবর্তনের ভরসা কি করে করা যায়?

এই যুদ্ধের ভেতরে যে সক্রিয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাকে সোৎসাহে স্বীকার করে নিয়েও মার্ক্সবাদী তার বিরুদ্ধ সম্ভাবনারও খতিয়ান রাখতে চায়। এবং পরিকল্পনার দ্বারা যৌথ অবচেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন জেনেও, মার্ক্সবাদী উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধের মৌল রূপান্তরের দায়িত্ব সম্বন্ধে শিথিল হতে নারাজ। ফলে ম্যানহিমের বক্তব্য মুষ্টিমেয়ের চিত্ত বিনোদন করে মাত্র, কিন্তু মার্ক্সীয় চিন্তা ইতিহাসে বিপ্লব আনে।

পরিশেষে যে মৌল অভিজ্ঞতার স্বতঃসিদ্ধতাকে ধর্মের ভিত্তি বলে ম্যানহিম দাবী করেছেন, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের বক্তব্য এখনো অসম্পূর্ণ। সাম্প্রতিক চিন্তা হতে বরঞ্চ একথা মনে আসার সম্ভাবনা বেশী যে এ মৌল অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ সমাজসম্বন্ধ এবং স্নায়ব অসংলগ্নতার ফল। তা ছাড়া ব্যবহার ও বিশ্বাস হতে অভিজ্ঞতাকে বিযুক্ত করে তার বিচার সমাজ-তাত্ত্বিকের চোখে নিতান্তই অবাস্তব। প্রমাণ পরীক্ষা বিষয়ে নিরঙ্কুশ এজাতীয় ব্রহ্মজল্পনার দ্বারা ম্যানহিম একথাই প্রমাণ করলেন যে এ যুগের ভাঙনশীল পরিবেশে নিতান্ত যুক্তিশীল ব্যক্তিরাও যুক্তিদ্বারা অসমর্থিত সংস্কারকে স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য বলে সর্ব্বসাধারণে উপস্থিত করতে পারেন।

শিবনারায়ণ রায়

কবিতা

দময়ন্তী—বুদ্ধদেব বসু। কবিতা ভবন, কলিকাতা।

একটি বিষণ্ণ বৈকালিক স্বর্ণাভা দেখা গেল নানা পত্রপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন দিগন্ত-শিখরে। অনতিস্ফুট একটি অবিশ্বাস, অবিচ্ছেদ্য ক্লান্তি এবং হতাশা, জয়িষ্ণু আশার তির্যক অংশপাত—এই বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে দময়ন্তীর মূল সুরটি ধ্বনিত। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী এবং আন্তর্জাতিক অবসাদ—এই হ'লো এ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা। 'যৌবনের ব্যাকুল বৈকাল,' 'কঙ্কাল-বেষ্টিত, পীত-লোহিত সন্ধ্যা,' 'ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর কয়েকটি হাড়,'—এই সব

বাক্যাংশ এই কাব্যক্ষেত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। 'বন্দীর বন্দনা' এবং 'কঙ্কাবতী'র আবেগ-বিহ্বল মাদকতা নিঃসন্দেহে অতীতবর্তী।

"এবার তবে ঝড়
পাষাণ-কালো আকাশে আলো
ক্ষণিক কাঁপে"

ক্ষণ কম্পমান, প্রত্যন্তস্থায়ী একটি ভাস্বর শিখা আর সন্নিকট হিমস্তব্ধ নিশীথ রাত্রির নিঃসঙ্গতা,—বুদ্ধিজীবীর আত্মরতি এবং বলিষ্ঠের বহু দূরবর্তী পূর্বাশা রূপায়িত হ'য়েছে 'দময়ন্তীর' কবিতাগুলিতে। এখানে নতুন প্রশ্ন :—

হে কাল, বলো তো
মুমূর্ষু এ শতাব্দীরে কোন্ মন্ত্র দেবে প্রাণ?

বণিক্ সভ্যতার গর্বিত অভিযানে হৃত সৌন্দর্য্য আফ্রিকা।

ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতা সন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।

স্পষ্ট বোঝা যায়, বুদ্ধদেব বসুর সহানুভূতি কোন্ দিকে। যে সূর্য নিষ্ঠুর আত্মঘোষণায় নিয়ত নিযুক্ত,—পৃথিবীর ফুল-ফল, হলুদ-শ্যামল-সুনীলের সম্পর্কে যা'র সংজ্ঞা রচিত হয় নি তা'র প্রতি তাঁর আগ্রহ উদ্দিষ্ট নয়। তিনি পীড়িত মানব-সংসারের কবি। এই যুগের সর্বজনীন অশান্তির আবর্তে ঘূর্ণিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠে তাই শোনা গেল,

"দলে নেই, ছলে নেই; রিক্‌শাওলা, কুলি না হ'য়ে যে
অধ্যাপক হ'য়েছি, এ সৌভাগ্য যথেষ্ট ঘ'ষে-মেজে
স্বদেশ, সমাজ আর স্ত্রী-পুত্রের সেবাই উচ্চাশা।"

একটি বিষণ্ণ চাপা হাসির শব্দে অনুচ্ছেদটি শেষ হ'য়ে যায়। বিদ্রূপের কটাক্ষ তাঁর অভ্যস্ত। রাজনৈতিক নিষ্ফলতা অথবা সামাজিক ব্যর্থতা—দুই প্রসঙ্গেই তাঁর মন্তব্য প্রকাশের রীতি অভিন্ন। এটিকে অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য না ব'লে যুগধর্ম বলাই সমীচীন।

বাংলা শুনেই সার্থক শ্রম চৌরাস্তায়
সন্ধেবেলায় হাঁটলে।
ভাবি শুধু এই, অমনি সুরেই বেরোবে
কি বুলি হঠাৎ চিমটি কাটলে ?

Wyndham Lewis ব'লেছেন, satireই হ'লো এ যুগের যথাকথা। কিছুকাল পূর্বে শ্রীমণীন্দ্র রায় 'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠায় কবি বিশেষের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বাংলা কাব্যরূপের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক কোনো কোনো কবির সম্পর্কের কথা তুলেছিলেন। আমার মনে হয়, কাব্যের প্রদেশ বিশেষে বুদ্ধদেব বসুর স্বার্থকতা ঈশ্বর গুপ্তের সমগ। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রাম্যতা তাঁর রচনায় অনুপস্থিত, পক্ষান্তরে শব্দচয়ন এবং বাক্যবিন্যাসের কৌশলে তাঁর এই শ্রেণীর কবিতাগুলি স্বাদু ও সুপাচ্য।

'কী করুণ হায় অতরুণ তনু সাজানো !'

—এই পংক্তির অনুপ্রাস অথবা "দিশি সিনেমায় ঋষি মহিমায় ইচ্ছা-পূরণ" —এই পংক্তিতে পর্বে পর্বে মিলের ব্যবহার কবিওয়ালার লিপিচাতুর্যের স্মারক। 'খুশি হয় মন, পানি পায় হাল'—বাংলা প্রবাদ স্মর। শুধু তাই নয়, আলোচ্য গ্রন্থের একাধিক রচনায় বাংলা বাক্‌রীতির সুনিপুণ প্রয়োগ আমাদের বিস্মিত করে।

আজকে না হয় ম্যালেই চলো।
ভারি সুন্দর বিকেল—না ?
মিমির জন্যে কী-খেলনা
কিনবে ? দোকানে গেলেই হ'লো।
তোমার নতুন কী চাই, বলো ?

এ ছাড়া সরল আখ্যান বর্ণনার ঐশ্বর্যেও দময়ন্তী স্মরণীয়। 'পদ্মা' কবিতাটি প'ড়ে অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের "পলাতকা" মনে পড়লো।

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্য ও ছন্দ' শিরোনামায় একটি আলোচনায় লিখেছিলেন, 'কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল, এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ ক'রতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।' 'বিচিত্রিত

মুহূর্ত' পর্যায়ে যে কবিতাগুলি বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থান লাভ ক'রেছে, তা'দের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেই এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। ইলিশ, কুকুর, ব্যাং, শান্তিনিকেতনে বর্ষা এবং পদ্মায় ভ্রমণ—কিছুই কাব্য জগতের বাইরে পড়েনি। এই প্রসঙ্গে গত শরৎকালে প্রকাশিত 'দিগন্ত' নামে বাংলা বার্ষিকীতে প্রকাশিত ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীর মূল্যবান একটি প্রবন্ধের প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। একটি রৌদ্রকিরণ রেখার সঙ্গে কবির ধারণা তুলিত ক'রেছেন অমিয় বাবু। রৌদ্রকিরণের বিচিত্র গতিপথের দৃশ্যাবলী যেমন বিভিন্ন, বুদ্ধদেব বসুর কবিচেতনার রশ্মিপাতে তেমনি বহু বিভিন্ন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হ'য়েছে। কিন্তু কবির অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর যেখানে অনঙ্কিত, সেখানে অলঙ্কৃত বাক্যও অনাদরণীয়। প্রসঙ্গটি অবশ্য পুরাতন এবং বহু আলোচনা-উত্তীর্ণ। 'জোনাকি' নামে এ বইয়ের শেষ কবিতাটির অনুষঙ্গে এ কথা মনে হ'লো। বইয়ের শেষতম অংশে কবি স্বয়ং ছন্দ ব্যবহার এবং শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য এবং স্ব-স্বীকৃত বিধি নির্দেশের উল্লেখ ক'রেছেন, সেগুলি তাঁর স্বধর্মনিষ্ঠা, কাব্যরূপ সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ঐকান্তিক আগ্রহের সূচক সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ Ezra Pound প্রমুখ কবিদের Imagist manifesto মনে পড়ে। কিন্তু 'জোনাকি' কোন্ তক্‌মার জোরে কাব্যক্ষেত্রে আসন অধিকারের প্রয়াসী ?

এ কী
জোনাকি !
তুই কখন
এলি বল্ তো !
একলা
এই বাদ্‌লায়
কেন কল্‌কা-
তায় এলি তুই ?

সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কার সম্বন্ধে যাঁরা প্রভূত আলোচনা ক'রে গেছেন, তাঁদের মধ্যে নমস্য কোনো কোনো ব্যক্তির রচনা এখনো সসম্ভ্রমে পড়া হয়। আলঙ্কারিক লিখেছেন মহাকবিরা একই প্রযত্নে ভাব ও রূপের

সমন্বিত সৃষ্টি সাধন করেন। Thomas Hood এর বিখ্যাত কবিতা, 'Bridge of Sighs-এ প্রযুক্ত ছন্দ সম্বন্ধে লুই ম্যাক্‌নিস্‌ লিখেছেন, "the form of this poem is not properly wedded to its content." আমার মনে হয় ভাব-নিরপেক্ষ ভাবে ছন্দের পরীক্ষা অসম্ভব। আধুনিক বাংলার শক্তিমান যশস্বী কবি বুদ্ধদেব বসুর কথাতেই বলা যায়, "সব থিওরিই ক্ষণস্থায়ী, শেষ পর্যন্ত যা টেঁকে তা কবিতার প্রাণবস্তু, যা সকল থিওরিকে অতিক্রম ক'রে যায়।"

হরপ্রসাদ মিত্র

ভাষা-সমস্যা

Languages and The Linguistic Problem—Suniti Kumar Chatterji. (Oxford Pamphlets on Indian Affairs, No 11, As. 4)

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একটী সর্ব্বজন প্রচলিত ভাষার অভাবে আজকাল ইংরাজী ভাষাতেই (লিখিত এবং কথিত) স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু সংবাদপত্র ও অন্য প্রকার পত্রিকায় এইভাবে ইংরাজীতে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে বিশেষ কুণ্ঠাবোধ না করিলেও, পথে ঘাটে সাক্ষাতে বা যানবাহনে একত্রিত হওয়া কালে সামান্য মাত্র জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন বিভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিগণ সাধারণ বা অতি প্রয়োজনীয় দুই একটী বক্তব্য বিষয়ও ইংরাজীতে ব্যক্ত করিয়া যে ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত বোধ করেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতীয়তাবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা

ছাড়িয়া দিলেও, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনে যে কত অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সম্ভবপর হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মুষ্টিমেয় ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও একমাত্র Anglicised ভারতীয় সম্প্রদায় ছাড়া—পরস্পরের মধ্যে ইংরাজীতে মনোভাব ব্যক্ত করিতে একপ্রকার আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা বোধ না করিয়া পারেন না।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুজন উত্থাপিত ও বহুবার আলোচিত সাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটী ভারতীয়-ভাষা-প্রচলন বিষয়-সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান কল্পে উল্লিখিত পুস্তিকাখানিতে সহজ বা লঘু হিন্দীর উপযোগীতা প্রদর্শন করিয়া চিন্তাশীল ও জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন সকল ব্যক্তির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রকার জাতীয় সমস্যা সমাধানের প্রধান বা একমাত্র অন্তরায় সাম্প্রদায়িক অন্ধতা ও বিরোধিতা। বিশেষভাবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সুনীতি বাবু তাঁহার বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা অকাট্য ও নিরপেক্ষ। এই সংস্রবে উক্ত পুস্তিকার ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত Roman বর্ণমালার ব্যবহারের সপক্ষে এবং ২৯ ও ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আরবী ও পারসীক শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে তাঁহার উক্তির প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

লিখিত ভাষার জন্য বর্ণমালার উদ্ভাবনের সমস্যা জটিলতর, কারণ ইহার সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই সকল সম্প্রদায়ের আপত্তি অখণ্ডনীয়। এই 'gordian knot' কর্ত্তনের জন্য, উপায়ান্তর অভাবে, Roman বর্ণমালা ব্যবহারের বিপক্ষে, ইহার বৈদেশিকতা সত্ত্বেও, কিছু বলিবার নাই; এই বিষয়ে ইয়োরোপের মুসলিম তুর্কীর দৃষ্টান্ত অবশ্য সর্ব্বথা ভারতীয়গণের অন্তরে সায় দিবে না। কিন্তু সমগ্র ভারতের কথিত ভাষার জন্য সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত হিন্দীই যে একমাত্র গ্রহণীয় ও অবশ্যম্ভাবী বুলি ইহার বোধ করি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দেখাইতে গিয়া তিনি আমাদেরই মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এই কথায়, "This Bazzar Hindi is the real interprovincial speech of the masses : it is becoming the··· outside the Western Hindi area" (২০ পৃষ্ঠা) ; "Hindi (Hindusthani) has already become the symbol of a great idea, the idea of Indian

unity, which Bengali or any other modern Indian speech lacks" (২৪ পৃষ্ঠা)। উত্তর ভারতীয়ের নিকট হিন্দী যতটা পরিচিত এবং গ্রহণীয়, দক্ষিণ ভারতীয়ের নিকট ততটা হইবে কিনা বিচার্য্য। যাহা হউক, সুনীতি বাবু তাঁহার সুবিস্তৃত ভাষাজ্ঞান সাহায্যে সুসংবদ্ধভাবে সকল দিক বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার বক্তব্য ইংরাজী ভাষায় সকল সভ্য জগত, বিশেষভাবে রাজপুরুষদিগের সমক্ষে ধরিয়াছেন ও তদ্দারা ভারতবর্ষের একজাতীয়ত্ব দাবীর অন্যতম বিপক্ষ যুক্তি খণ্ডনে বিশেষ সহায়তাপূর্ব্বক স্বাদেশিকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

প্রফুল্লকুমার দাস

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

১৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৫০

পরিচয়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিন্দু-কৃষ্টির উৎপত্তি

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন, অশোকের সময় হইতেই ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পকলা বৈদেশিক প্রভাবাধীন হইতে থাকে (১)। কিন্তু ভারতীয়েরা বিদেশ হইতে স্থাপত্যকার্য্যের বিভিন্ন 'টেক্‌নিক্' (technique) গ্রহণ করিলেও নিজেরা একটা স্বতন্ত্র 'চারুকলা' (Fine Arts) পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থপতি-শিল্পের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয়, অর্থাৎ 'Hindu system of Architecture' অন্যতম। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সনাতনী ও বৌদ্ধ এবং জৈনেরা একই শিল্পকলা পদ্ধতির উদ্ভব করেন। তবে বৌদ্ধ-শিল্পে জাতক প্রভৃতির গল্পের প্রতিচ্ছবি প্রদত্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শিল্পে পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে *। এই পদ্ধতিতে মুসলমান যুগে ইসলামধর্ম্মীয় প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। হ্যাভেলের মতে (২), হিন্দু-বৌদ্ধ স্থপতি-পদ্ধতিই ইসলামের উপযোগী করিয়া তাজমহল প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাজমহলে হিন্দু-বৌদ্ধ "পঞ্চরত্ন" নির্ম্মাণ প্রথা "পঞ্চ-মিনার"-এ

১। A. Gruenwedel, "Buddhist Art in India", tr. by A. C. Gibson.

* হিন্দু-শিল্পকলা সম্বন্ধে M. N. Dutta, "Dissertation on Painting ; History of Architecture" দ্রষ্টব্য।

২। Havell, "History of Indian Architecture."

পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় মসজিদের গম্বুজ অন্য কোন মুসলমান দেশে দৃষ্ট হয় না। আহমদাবাদের মুসলমান স্থপতিকার্য্য জৈন আর্ট-এর নিকট ঋণী। রামপুরের রাণা কুম্ভের মন্দিরের সহিত এই সহরের রাজকীয় মসজিদের বিশিষ্ট সাদৃশ্য আছে। সারকি (জৌনপুরের সুলতানাৎ) শিল্পের কোন কোন কারুকার্য্যের সহিত হিন্দু ও জৈন শিল্পের সাদৃশ্য আছে। জৌনপুরের অটলাদেবী মসজিদে হিন্দু ও মুসলমান স্থপতি প্রথা বিজড়িত হইয়া আছে। বাঙ্গলার মুসলমান-স্থপতিকার্য্যে হিন্দু-মন্দিরের স্থাপত্যের অনুকরণ করা হইয়াছে। ছোট সোনা বা খোজার মসজিদের অভ্যন্তরে প্রস্তরে খোদিত পদ্মফুল আছে। আসলে, যাহাকে Indo saracenic art বলা হয় তাহাতে ভারতীয় প্রভাব প্রকাশ (৩)।

ইহার পর আসে দর্শনাদির কথা। হিন্দু-দর্শনাদিতে কেহ কেহ গ্রীক প্রভাব দেখিতে চাহেন, কিন্তু উহা সর্ব্ববাদীসম্মত নয়। অতি-প্রাচীনকালেই গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস্ ভারতীয় 'সাংখ্য' শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। গার্বে বলেন, সাংখ্যদর্শন গ্রীক্ দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল (Sankhya Philosophie, 113 ff)। ভিন্টারনিজ্ (৪) বলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে হিরাক্লিটাস, এম্পেডক্লেস, আনাক্সাগোরাস্, ডিমক্রিটাস্ এবং এপিকুরের দর্শন সমূহের উপর উক্ত প্রভাব সম্ভবপর, যদিও বিভিন্নস্থানে সমানভাবে উদ্ভব (parallel development) অসম্ভব নহে (†)। পক্ষান্তরে তিনি, গার্বে ও L. V. Schroeder (Pythagoras und die Inder, 1884) নিঃসন্দেহ যে, পিথাগোরাস্কে 'সাংখ্য" প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পুনঃ প্লেটোও ভারতীয় প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত

৩। Burgess-Imperial Gazetter. II, P. 185, 188-193 ; Archeological Survey of Western India, Pt. II, Pp. 11-12.

৪। Winternitz, Geschichte der indische Literatare, Bd. III .P. 478.

† আজকালকার জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ "Parallelism in History" অপেক্ষা "Diffusion of Culture" মতের উপরই অধিক জোর দিতেছেন। এই বিতর্ক সম্পর্কে Elliot Smith এর "Diffusion of Culture" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বলিয়া কথিত হয় (৫)। এই প্রকারে পরবর্ত্তীযুগে Gnostic ও Neo-Platonic মতদ্বয়ের উপর ভারতীয় প্রভাব নিশ্চিতরূপেই ধরিতে হইবে। আবার তিনি বলিতেছেন, পরের যুগের ভারতীয় "ন্যায়শাস্ত্রে" (Logic) আরিষ্টটলীয় Syllogism পদ্ধতি এবং ভারতীয় 'atomic theory'র উপর গ্রীক্ প্রভাব স্বীকার্য্য। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতীয় ন্যায় inductive, আর আরিষ্টটলীয় ন্যায় deductive ; উভয়েরই বিচার-প্রণালী পৃথক এবং 'পরমাণুবাদ' যে গ্রীস্ হইতে গৃহীত তাহার কোন প্রমাণ ভিন্টারনিজ্ দেন নাই। Eleates দলের (Xenophanes Parmenides) মতের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য চক্ষে খুবই ধরা পড়ে। এই বিষয়েও তিনি বলিতেছেন, ইহা ধার নহে, পৃথকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু কোন প্রাচীন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন, সক্রেটিসের সহিত জনৈক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার ঘটে ; ম্যাক্সমূলার বলেন, এই বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত (Max Mueller, "Theosophy or Psychological Religion", P 83-84)। পুনঃ Aristoxenus ও Eusebias বলিয়াছেন, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এথেন্সে ভারতীয়েরা বর্ত্তমান ছিলেন এবং সক্রেটিসের সহিত তাঁহারা দার্শনিক তত্ত্বাদিরও আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন (Vide "Rawlinson", quoted in Amrita Bazar Patrika, dated 22-11-36, P. 17)। গ্রীক্ লেখকেরা বলেন, আলেকজাণ্ডার তাঁহার শিক্ষাগুরুকে ব্রাহ্মণদের (Brachmans) জ্ঞান শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন (৬)। ইহা হইতে পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় জ্ঞানের ধারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভূমধ্যসাগরীয় জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। কাজেই হিন্দুর দর্শন যে বিদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করার ফলস্বরূপ তাহা বলা যায় না, তবে ভাবের বিনিময় হওয়াও অসম্ভব নহে।

ইহার পর আসে ফলিত বিজ্ঞানের কথা। জ্যোতিষ (astronomy) বিষয়ে অনুসন্ধানকারীগণ বলেন, হিন্দু পণ্ডিতেরা যবনাচার্য্যদের এই বিষয়ে পারদর্শি-

৫। Willoughby বলেন, প্লেটো Oriental thought দ্বারা প্রভাবিত। Burgess এবং Mahaffy বলেন, Indian thought প্লেটোর 'Ideal Republic' নামক পুস্তকে সমাজে তিন প্রকারের মানুষ—হিন্দুর স্বত্ব, রজঃ, তমঃ, মতের সহিত একার্থবোধক।

৬। J. P. Mahaffy, "Greek Life and Thought" P. 48.

তার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং রোমক সিদ্ধান্ত ও পৌলক সিদ্ধান্তের বিষয়ও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহারা যে আলেকজাণ্ড্রিয়ার পণ্ডিতদের নিকট হইতে উক্ত বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। তাঁহারা গ্রীক্-জ্যোতিষের খবর রাখিতেন, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। কয়েকটি বিদেশীয় শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে; হয়ত বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা বিদেশের কাছে ঋণী ছিলেন, কিন্তু আর্য্য চিন্তাধারার মধ্যে তাহা জীর্ণিভূত হইয়া যায়। অন্যদিকে শোনা যায় যে, হিন্দু-জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রতীকগুলির (Zodiac signs) সহিত প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়ার সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

পুনঃ অঙ্কশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার "শূন্য" (Zero) পদ্ধতি ভারতেই প্রথম উদ্ভূত হইয়াছে। আরবেরা হিন্দুদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করেন এবং ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৫৪ খৃঃ) ইহা Stipel কর্ত্তৃক ইউরোপে প্রচারিত হয়। Spengler বলেন, "Zero, which probably contains a suggestion of the Indian idea of extension···introduced in Europe by Stipel in 1554" (৭)।

সঙ্গীতের কথা। গানের "সপ্তগ্রাম" হিন্দুদের দ্বারাই সৃষ্ট। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সম্রাট খস্রু নৌসের বান-এর অভিষেককালে একদল ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞকে ঐ দেশে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাদেরই দ্বারা পারস্যে ভারতীয় সুরের "সপ্তগ্রাম" প্রচারিত হয়। এই সঙ্গীতজ্ঞদের বংশধরগণ এখনও পারস্যে বসবাস করিতেছে—তাঁহাদিগকে "লুরী" বা 'লুল্লী" বলা হয় *। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি পারস্যে সুবিদিত ‡? পারসীকেরা কিন্তু

৭। Oswald Spengler, "The Decline of the West", P. 178. আজকালকার ইংরেজ লেখকেরা ইহা চাপিয়া যাইতে চাহেন। Thacker and Sewel নামক অ্যামেরিকান ঐতিহাসিকদ্বয় বলেন, আরবেরা ইহা কোথা হইতে পাইয়াছে আমরা তাহা জানি না; আমরা আরবদের নিকট হইতে ইহা পাইয়াছি (Medieval History of Europe দ্রষ্টব্য। কিন্তু জার্ম্মাণ প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদগণ বলেন, ইহা হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত।

* বিখ্যাত ফার্শী সাহিত্যিক মীর্জ্জা মহম্মদ খাঁ লেখককে উক্ত সংবাদ দেন।

‡ ['গান গাওয়া'-(to sing) ক্রিয়াপদের ফার্সী প্রতিশব্দ হইতেছে, Suridan বা Suraidan; ইহা কি সংস্কৃত হইতে গৃহীত?]

'সপ্তগ্রাম'-ত্রর নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "ডো, রে, মি, ফা, স, লা, ডো" নামকরণ করে; পরে আরবেরা উহা গ্রহণ করে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞ Guido D'arizzo ইহাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের ভিত্তি করেন (৮)। হিন্দুর সঙ্গীতের সুর পিথাগোরীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি হইতে আলাদা; পিথাগোরীয় সুর গ্রীক্ খৃষ্টান গির্জ্জায় গীত ও অনুসৃত হইত বা এখনও হয়—বাকী পাশ্চাত্যদেশের সর্ব্বত্র হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত 'সপ্তগ্রাম' সুরেরই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

ভৌগ্-বিজ্ঞানের কথা! প্রাচীন হিন্দুরা যে গ্রীক, আরব, পারস্য অথবা ঈজিপ্তের নিকট এই বিষয়ে ঋণী, তাহা কেহই বলেন না। ইহা তাঁহাদেরই গবেষণা বা অনুসন্ধানের ফল। এই বিজ্ঞানের অনেক বিষয়েই তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়েছেন (৯)। আরবেরা এই বিষয়ে হিন্দুদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী, এই কথা সর্ব্ববাদীসম্মত (১০)।

প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা রসায়নের চর্চ্চা করিয়াছিলেন (১১)। কিন্তু এই বিদ্যা আলকেমীর (Alchemy) সহিত বিজড়িত ছিল। বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য্যগণের 'অষ্টসিদ্ধি' লাভের মধ্যে যেমন তরবারা সিদ্ধি, চক্ষুতে ঔষধ দিয়া আরোগ্য করা সিদ্ধি, অমৃত (nectar) সিদ্ধি, বৃক্ষপত্রে ভর করিয়া আকাশে উড়িয়া যাওয়া সিদ্ধি, পিত্তলকে সোণা করা (gold tincture) প্রভৃতির সংবাদের মধ্যে "পারাসিদ্ধির" সংবাদও পাওয়া যায় (১২)। লামা তারানাথ বলেন, সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের 'অষ্টসিদ্ধি' লাভের মধ্যে এইটি অন্যতম আজকালকার কেমিষ্টদের মতে সেই প্রাচীনযুগে নাগার্জ্জুনের Mercury Sulphite প্রস্তুতকরণ প্রণালী আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়। তারানাথ বলিয়াছেন, এই সিদ্ধগণ জনসাধারণের হিতার্থে এইগুলি ব্যবহার করিতেন। জনৈক সিদ্ধপুরুষ চক্ষুরোগের ঔষধে সিদ্ধিলাভান্তে চীনদেশে গমন করেন এবং তথায় বহু লোকের চক্ষুঃপীড়া নিরাময় করেন।

৮। Encyclopaedia Britanica.

৯। Hoernle – Hindu Anatomy, এবং তৎকৃত অন্যান্য পুস্তকও দ্রষ্টব্য।

১০। Broeckelmann এবং E. Browne দ্রষ্টব্য।

১১। P. C. Roy—History of Hindu Chemistry.

১২। Taranath—"Edelstein mine" tr. into German by Gruenwedel.

এই প্রকারে দেখা যায়, 'আলকেমী' ঔষধ ও রসায়ন-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ হয়। কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগীয় 'আলকেমী' ও ভারতীয় সিদ্ধিলাভ রূপ 'আলকেমী'র এক উৎপত্তির দাবী কেহ করেন না। ইউরোপীয় "আল-কেমী" ভারতীয়টির অপেক্ষা আরও পরবর্ত্তীকালের, আর ভারতীয় 'আলকেমী' ধর্ম্মসাধনার অন্তর্গত ছিল। গ্রুণওয়েডেল বলেন, উভয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে; এবং বৌদ্ধ-সিদ্ধগণের কোন কোন গল্প আরব্যোপন্যাস ও ইউরোপীয় witchcraft-এর গল্পে প্রতিবিম্বিত দেখা যায় (১৩)। বরং ইহাই সম্ভবপর যে, ভারতীয় অন্যান্য বিদ্যার সহিত এই বিদ্যা আরবদের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্যে প্রচারিত হয়।

প্রাচীন ভারতের কোন্ যুগে লিখন-পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত হয় তাহা আজও পর্য্যন্ত বিতর্কের বিষয়। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক শীল-মোহর পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে অক্ষর অঙ্কিত আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহার পাঠোদ্ধারে কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। Langdon বলেন (১৪), এই লিপি হইতে ঐতিহাসিক যুগের ব্রাহ্মী-লিপির বর্ণমালা উদ্ভূত হইয়াছে। হাণ্টার মনে করেন (১৫), ইহার সহিত আদি-এলামবাসীর (Proto-Elamite) লিপির লিখন-প্রণালীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আবার ফন্ হ্যাভেসী (১৬) এই লিপির সহিত পলিনেসিয়ার অন্তঃপাতী ইষ্টার দ্বীপের কাষ্ঠ-খোদিত বিলুপ্ত লিপির সহিত অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পান। ইনি বলেন উভয় লিপিরই উৎপত্তি এক, ইহার মধ্যে দ্বীপের লিপি প্রাচীনতর রূপ রক্ষা করিয়াছে। হ্যাভেসী এই দ্বীপের লিপির সহিত দক্ষিণ-পারস্যের আদি-এলামের লিপির সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তিনি আবার মার্শালের সহিত এই বিষয়ে একমত যে, সিন্ধু-সভ্যতার

১৩। Ibid.

১৪। Langdon—Mahenjo-daro and Indus-Valley Civilisation, Vol. II. Pp. 423-424.

১৫। G. R. Hunter—The Script of Harappa and Mahenjo daro in Journal of Royal Asiatic Society, 1932.

১৬। Von Hevesy "Oster inselschrift und Induschrift" in 'Orientalische Literatur Zeitung", Nov. 1934, Pp. 665-674.

লিপিকে অন্যদেশ হইতে ধার-করা মনে করা আদৌ সঙ্গত হইবে না। অবশ্য এই সকল লিপির মধ্যে কতকটা পারস্পরিক মিল ও নৈকট্য রহিয়াছে। ইহা সম্ভব যে, এই লিপিগুলির ভিত্তির মূলনীতি (underlying principles) এক, এবং নূতন প্রস্তরযুগের সময়াধীনকালে (Neolithic times) একস্থান হইতেই তাহাদের উৎপত্তি (common origin) হইয়াছে। কিন্তু এই লিপিগুলি প্রত্যেক জাতি ও তাহার ভাষাগত বৈশিষ্ট-সম্পন্ন (১৭)।

ঐতিহাসিক যুগের কথা। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বৈদিকযুগে অক্ষর-লিখন প্রণালী উদ্ভূত হয় নাই; তৎকালে লোকে স্মৃতি ও শ্রুতির সাহায্যে লিখন-কার্য্য সমাধা করিত। কিন্তু ৺শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের রোম অধিবেশনে এই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠকালে বলেন, বৈদিকযুগে লিখন-প্রণালী অবিদিত ছিল না; ইহার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে আলেকজাণ্ডারের অভিযান সময়ে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) ভারতীয়েরা লিখন-প্রণালী জানিত কিনা তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ ও বাদানুবাদ আছে। ম্যাক্ ক্রিন্ডল্ বলেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময়ে ভারতীয়দের নিকট 'লিপি' অজ্ঞাত ছিল (১৮); কিন্তু ক্যানিংহাম্ বলিয়াছেন (১৯), অশোকের শিলালিপিগুলি দুইটি পৃথক প্রণালীর অক্ষরে লিখিত। একটি প্রণালীতে দক্ষিণ দিক্ হইতে বামে লিখিত হয়; এই লিপি অশোকের সাহাবাজগাড়ী (আফগান-সীমান্ত প্রদেশ) অনুশাসন এবং আরিয়ানা (Ariana, আফগানী-স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী বর্ত্তমান হেরাট্ প্রদেশ) ও ইণ্ডো-সিথিয় রাজাদের মুদ্রায় অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। অপর প্রণালিটি বামদিক হইতে ডানদিকে লিখিত হইয়াছে। এই অক্ষর প্রণালী যে-সকল পাণ্টলিয়ন ও আগাথ-ক্লেস্ নামক হেলেনিষ্টিক্ রাজগণ সিন্ধুনদের পরপারে রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের মুদ্রায় মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর অশোকের অবশিষ্ট শিল্পলিপিগুলিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৭। Marshall, op. cit. Vol. I. P. 41.

১৮। Mc. Crindle—Megasthenes, P. 69

১৯। Cunningham—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I. P. 42, 187.

কেনে সময়ে প্রথমোক্ত লিপি উদ্ভূত হয় অথবা কোথা হইতে এদেশে আমদানী হয় তদ্বিষয়ে কেহ সঠিক কিছুই বলিতে পারেন না। টমাস্ বলেন, ইহা স্বদেশজাত নহে; ইহার ভিত্তি ফিনিশীয় লিপিপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত (২০)। খৃঃ পূঃ ৭ম শতকের 'আরামেক' (Aramaic) ভাষায় লিখিত একটি প্রস্তর-লিপি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, এই লিপি হইতেই পৃথিবীর সমস্ত লিপি উদ্ভূত হইয়াছে। স্বভাবতঃই ভারতীয় বর্ণমালাও তাহা হইতে বিবর্ত্তিত বলিয়া এই দল মনে করেন। কিন্তু উভয় দলেরই মত মূলতঃ এই বিষয়ে এক যে, সেমিটিকজাতীয় লিপি-পদ্ধতি হইতেই ভারতীয়েরা বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। হয়ত উত্তরের ভারতে (এই অংশ আজ ভারতের বাহিরে) এই সেমিটিক সম্পর্কিত লিপি যাহাকে খরোষ্টি লিপি" বলা হয় তাহা উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে লিপির উৎপত্তি কি?

এই বিষয়ে ক্যানিংহাম্ আরও বলেন, প্রথমোক্ত বর্ণমালাটি অশোকের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষ কালের, অর্থাৎ খৃ পূঃ পূঃ ২৫১ সনের অধিক কালের হইবে না; এবং দ্বিতীয়টি প্রায় সেই তারিখ অথবা প্রায় খৃঃ পূঃ ২৪০ সনের হইবে। কিন্তু দেখা যায় যে, এই অক্ষর-প্রণালীটি সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, সর্ব্বপ্রকারের ধ্বনি উক্ত অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত হয়; তাহা হইলে ইহা বহুপূর্ব্ব হইতেই ব্যবহৃত হইতেছিল বলিয়া অবশ্য মানিতে হইবে। ইহার তারিখ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের শেষে তিনি নির্দ্ধারণ করেন (২১)। ভারতীয় লিপি সম্পর্কে টমাস্ বলেন, ইহা স্বাধীনভাবেই উদ্ভাবন করা হয় (independently devised) এবং এই লিখন-প্রণালী স্থানীয়ভাবে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে (locally matured scheme of writing)। এই অভিমতের সহিত একমত হইয়া ক্যানিংহাম্ বলিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতীয় 'পালি' অক্ষর (দ্বিতীয় প্রণালীকে তিনি উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন) ভারতীয়দের দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই সৃষ্ট হয় (was a perfectly independent invention of the people of India) (২২)।

২০। Thomas—Numismatic Chronicles, New series, III. P. 29.

২১। Cunningham—Op. cit. P. 50.

২২। Cunningham—Op. cit. P. 52.

এতদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, বর্ত্তমানের ভারতীয় লিপি-সমূহের ভিত্তির বর্ণমালাটি (alphabet) ভারতীয়দের দ্বারাই উদ্ভূত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বলিতে পারা যায় যে, আলেকজাণ্ডারের সময় লিখন-প্রণালী ভারতীয়দের নিকট অজ্ঞাত ছিল—এই মতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরেই ভারতীয়েরা লিখিতে শিখিল, তাহা হইলে কোথা হইতে তাহারা সেই বর্ণমালা প্রাপ্ত হয়? ব্রাহ্মী অথবা অশোক-লিপি গ্রীকদের নিকট হইতে গৃহীত নয়; বাবিলনীয় পারসীক কীলক লিপি (cuneiform characters) হইতে বা আরামেক-ফিনিশীয় অক্ষর প্রণালী হইতে এই লিপি ধার করা নয়। ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতলিপি পুরা-মাত্রায় বৈজ্ঞানিক এবং ধ্বনি বা উচ্চারণ (Phonetics) বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব এই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে, অর্থাৎ পরিপূর্ণতা বিবর্ত্তিত হইতে নিশ্চয়ই অনেক সময় লাগিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতীয়েরা লিখন-প্রণালী জানিত না, আর তাহার পৌত্রের সময়ে হঠাৎ নিজেদের মাথা হইতে জগতের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত (most perfect) বর্ণমালা সৃষ্টি করিল, ইহা অযৌক্তিক কথা। ভারতীয় অক্ষর-পদ্ধতি ভারতের আর্য্যভাষীদের মস্তিষ্ক-প্রসূত—ইহা আর্য্য অথবা হিন্দু-কৃষ্টি প্রসূত। এইস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য, কানিংহাম্ তাঁহার ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে বলিয়াছেন (২৩) যে হারাপ্পায় প্রাপ্ত কতকগুলি শীলমোহর তাঁহার হস্তগত হয়। ঐগুলির কোন কোন অক্ষরের সহিত ব্রাহ্মী লিপির সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মনে করেন (২৪)। হালের ল্যাঙ্গ্‌ডেন্-এর মত এই যে মহেঞ্জো-দাড়োর চিত্রাক্ষর হইতে ব্রাহ্মী বর্ণমালার উদ্ভব; তিনি "ব্রাহ্মী-লিপির কতিপয় বর্ণের মূল সিন্ধু-লিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উভয় লিপির সমান আকৃতি-বিশিষ্ট চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন" (২৫)। তিনি আবার বলিয়াছেন, "সুমেরীয় বা আদি-এলামীয় লিপির সঙ্গে সিন্ধুলিপির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

২৩। Cunningham—Archeological Report, published in 1875 A. D. Vol. 5. P. 168.

২৪-২৫। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী—ঐ, পৃঃ ১১৯, ১২৪।

কোন সম্পর্ক নাই" (২৬)। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সিন্ধুলিপি সম্বন্ধে সর্ব্বজন-গৃহীত কোন সিদ্ধান্তে এখনও কেহ উপনীত হইতে পারেন নাই। সিন্ধুসভ্যতার ভাগ্যে আর যাহাই থাকুক না কেন, ভারতের বর্ত্তমান বর্ণমালা যে ভারতীয় আর্য্যদের মস্তিষ্ক-প্রসূত, এবং ইহা তাঁহাদেরই কৃষ্টির একটি দান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অশোকের সময়ে লিপিমালা সম্পর্কে উল্‌নার বলেন "এই সম্পর্কে সকলেই একমত যে, এই লিপি অশোকের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উন্নতিলাভ করিয়াছিল" (২৭)।

এই প্রকারে দেখা যায় যে, প্রাচীন হিন্দু-কৃষ্টি আর্য্য-মস্তিষ্ক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। স্পেঙ্গ্‌লারের কথায় Arya-cultureman দ্বারাই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের ইউরোপীয় অথবা পৃথিবীর অনেক আদিম অধিবাসীদের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুরা বিদেশীয়দের কাছে কৃষ্টি বিষয়ে হাতেখড়ি দেন নাই। অবশ্য Diffusion of culture দ্বারা বিভিন্নদেশের সহিত তাঁহাদের কৃষ্টির আদান-প্রদান হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা বৈদেশিকের নিকট ঋণী; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের inventive এবং creative genius অস্বীকৃত হয় হয় না। এই বিষয়ে ডক্টর ভাণ্ডারকার যথার্থই বলিয়াছেন, হিন্দু-সভ্যতা যাহা ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে "আর্য্য": The Hindu civilization that we see everywhere in India or Ceylon is essentially Aryan (২৮)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২৬। Langdon—Mahenjo-daro and Indus-Valley Civilization, Vol. II. P. 423-424

২৭। A. C. Woolner—Asoka Text and Glossary. Pt. I, P. XVIII.

২৮। D. R. Bhandarkar's Lectures on the "Ancient History of India on the Period from 650-325 B. C."

১৯৪৩

চটকলের ব্যাচিং এণ্ড সাইনিং ডিপার্টমেণ্ট। মজুরেরা বলে মাগী কল। কারণ যারা কাজ করে তার বেশীর ভাগই মেয়ে।

প্রকাণ্ড ঘর। মেঝে থেকে ছাত পর্য্যন্ত ঘরটার সারা আবহাওয়ায় ভাসছে পাটের ফেঁসো আর পাট ছাড়ানো ধুলো। যেন খুব পাতলা সাদাটে কুয়াশা। এ কুয়াশা শুধু যে নজরেই ধরা পড়ে তা নয়। মজুরণীদের প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ধুলো আর খানিকটা ফেঁসো ঢুকবেই। প্রথম প্রথম দম আটকে আসে। তবে কালে কালে সবই সয়ে যায়। নইলে আর শরীরের নাম মহা-শয় হবে কেন?

রাণী যেখানে কাজ করে সেখান থেকে কাছাকাছির মেয়েগুলোকে বেশ স্পষ্টই চেনা যায়। অনেকটা দূরে তাকালে তখন ধুলোর কুয়াশায় মানুষ-গুলোকে আর তেমন পরিষ্কার চেনা যায় না। মাঝে মাঝে বিজলীর জোর আলো। সেখানে কুয়াশাটা যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। ধুলোর গুঁড়ো আলোয় চিক্‌চিক করে। তার মধ্যে সাদা সাদা ফেঁসোগুলো পরিষ্কার ভাসছে দেখা যায়।

দূরে কুয়াশার মধ্যে একটা অস্পষ্ট দেহ ঘরে ঢুকল। দেহটা এগিয়ে চলেছে। একটু ভেতরে আসতেই বোঝা যায় পুরুষ মানুষ। ক্রমশ বোঝা যায় মাগী কলের সর্দার উমেদি। রাণীর দিকেই আসছে।

রাণীর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। মিন্‌যে আজও আবার সেই কথাটাই পাড়বে নাকি? সর্দারের পীরিত ঠেকিয়ে কি মজুরি রাখা যায়। কিন্তু তার যে ঘর আছে, সোয়ামি আছে, বছর ছয়েকের খোকা আছে। সর্দার মুখ-পোড়া কি ধর্ম্মের দোহাইও মানবে না? হায় ভগবান!

উমেদি সর্দার রাণীর কাছে এসে দাঁড়াল। বুকটা একটু টেনে হাত দুটো বার করে হাসল। সামনের দুটো দাঁত সোণা বাঁধানো। পান আর খৈনির ছোপ ছাপিয়ে সোণাটা চিক চিক করে উঠল।

বল্ল: "কি গো রাণী বিবি, এখুন কি করা হোবে? এই চটকলসে দানা-পানি তো এবর উঠল— অব ক্যা করোগী?"

রাণীর বুক ধড়াস ধড়াস ক'রে যেন কারখানার গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে। সত্যিই কি সর্দার কাজ ছাড়িয়ে দেবে? তাহলে খোকা খাবে কি? সোয়ামিকে কি বলব? সর্দার ধর্ম্ম নষ্ট করতে চায় তা কি সোয়ামিকে বলা যায়? আর বল্লেই কি সে পেত্যয় করবে?...নাঃ, ছোট সায়েবকে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরব—যখন সায়েব বিকেল বেলা মেমকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়। মেম সায়েব মেয়ে মানুষ, তারও কি দয়া হবে না?...কি বলা যায়! সর্দারের কথার ওপর সামান্য মজুরণীর কথা বিশ্বেস করবে কি?

এক নিঃশ্বেসের মধ্যে কত ভাবনা কত দিগ্বিদিকে ছোটে। সর্দার কি বলে যাচ্ছে শুনতেও পায় না। সর্দার যখন চারিদিক তাকিয়ে চোরের মত একবার তার কাঁধের ওপর হাতটা রাখল তখন হঠাৎ চমকে উঠে শোনে সর্দার বলছে,

"মিলিটরি তো এ চটকল লিয়ে লিল, তাদের লড়াইয়ের সামান তৈয়ার হোবে। চট আর এখানে বন্‌বে না—সব মজুর মজুরণীর কাজ জবাব। তুহার মরদেরও কাম খতম। মিল থিকে সস্তা চাউল-আটা সে ভি তো বন্ধ হোলো। এখুন খাবি কি?"

দারুণ দুঃসংবাদ। কিন্তু সমস্ত ভবিষ্যৎটা তখন মাথায় ঢোকে না। বরং অন্য সব ভাবনা ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে একটা সোয়াস্তির লম্বা নিঃশ্বাস। যাক বাঁচা গেছে! সর্দার আর কাজ কেড়ে নেবার ভয় দেখাতে পারবে না। কেন কাজ গেল সে কৈফেতও আর সোয়ামিকে দিতে হবে না। সবারই কাজ যাবে, সবাই এক গোয়ালে। বাঁচলাম, বাঁচলাম, সর্দারের আপদ থেকে তো বাঁচলাম!

দূরে ছোট সায়েব ঢুকেছে ঠাওর করে সর্দার এগিয়ে গেল।

ইস্তিরি রাণী আর সোয়ামি বিষ্টু। এক সময় তারা গাঁয়ে ছিল। বিষ্টুর ছোট ভাই কেষ্টও ছিল। বিঘে তিন চার ধান-জমি, একখানা খোড়ো ঘর—তাও ছিল।

কি হয় তিন চার বিঘে জমিতে! সম্বচ্ছরের খোরাকও হয় না। বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের কাছে কর্জ বেড়েই চলে। ধান-জমিটা তো বাঁধা ছিলই, কুঁড়ে আর ভিটের জমিটুকুও বাঁধা পড়ল। ফসলের বেশীর ভাগটা যায় বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের গব্বে। তিনটে কেন একটা প্রাণীরও পেট চলে না।

জমিটুকু যা পারে কেষ্টই দেখাশোনা করুক। বিষ্টু আর তার বৌ এল শহরে। অনেক খুঁজে পেতে গাঁয়ের একজন চেনা মিস্ত্রীর মারফৎ বড় সর্দারকে ঘুঁষ দিয়ে বিষ্টু চটকলে মজুরি যোগাড় করল। তাও পাকা নয়, বদলি—মাঝে মাঝে বেকার বসতে হয়।

তা হোক। হপ্তায় তিন চার টাকা ঘরে আসে তো! একেবারে উপোস দিতে হয় না। কিন্তু যত গোল বাধাল বৌটা—মাগী আবার একটা বাচ্চা বিয়োলো! দুটো মুখ কায়ক্লেশে চলছিল, এখন আর একটা মুখ বাড়ল। ছেলেপিলে জন্মায় তো শুধু গিলবার জন্যেই।

তবে বৌটা মজবুত আছে।

ওর গা-গতরে ক্ষ্যামতাও আছে। দিলে হয় চটকলে কাজে ঢুকিয়ে। ওকে দেখলে সর্দার কাজ দিয়ে দিতেও পারে। বৌয়ের মজুরিতে আরও দু পাঁচ টাকা আসবে। বৌ মজুরি করে জানলে গাঁয়ের লোক নিন্দে করবে? হ্যাঁ জানতে পাল্লে তো! এই এত বড় শহরে কে কার খবর রাখে? আর জানলেই বা কি এমন ভাগবৎ অশুদ্ধ হয়েছে। ঐ তো আরও কত মাগী মাগী-কলে কাজ করে।

রাণীও চটকলে কাজে ঢুকল। দু তিন টাকা হপ্তা পায়। সোয়ামি আর ইস্তিরি দুজনে মিলে যা রোজগার হয় তাতে পাঁচ টাকা ঘরভাড়া আর সংসার খরচ চলেই যায়। কল থেকে যখন সস্তা দরে চাল-ডাল পাওয়া যাচ্ছে তখন চলবে না কেন? মাসে বরং দু একটা টাকা বাঁচে। এই তো পাঁচ-সাত মাস আগে মিস্ত্রীর হাতে দিয়ে বারোটা টাকা দেশে পাঠানো গেল। ধান-জমিটা না হোক ভিটের দেনার সুদটা তাতে মিটবে। আস্তে আস্তে সবটা জমিই খালাস করা যাবে।

এম্‌নি ধারাই বিষ্টু ভেবে আসছিল। কল বন্ধর হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একদিনে সব ওলট পালট হয়ে গেল।

কলের ফটকে নোটিশ পড়েছে। বড় সায়েব লিখে দিয়েছে: আমাদের এই এক নম্বর কল সরকার নিজের কাজে নিয়ে নেওয়ায় আমরা সমস্ত মজুর-মজুরণীকে জবাব দিতে বাধ্য হলাম। আমাদের কলের আমদানী বন্ধ হ'ল কাজেই সস্তা দরে চাল-আটা দেওয়া আর মালিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এখানকার কিছু লোককে আমাদের দু নম্বর মিলে বদলি হিসাবে কাজে নেওয়া যাবে। যারা বদলি কাজ চায় তারা যেন এই হপ্তার মধ্যে দু নম্বর মিলে গিয়ে নাম লেখায়।

বিষ্টু পড়তে জানে না। বেশীর ভাগ মজুরই জানে না। কিন্তু খবর এরি মধ্যে কারখানায় সমস্ত মজুরের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। যেন জরুরি টেলিগেরাপ। বিষ্টু যখন কাজ সেরে সন্ধ্যেবেলা কল থেকে বার হল তখন কোনো খবরই তার জানতে বাকী নেই। তবুও ফটকের নোটিসে হিজিবিজি লেখার দিকে অনেকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যেন মন দিয়ে ওর ভেতর থেকে নতুন মানে টেনে বার করবে। হতে পারে না, হতে পারে না, এক কথায় জবাব—তা কখনো হতে পারে না।

ফটক থেকে একটু দূরে কারা ঢোল পিটছে। মিটিং হবে—গোল তালাও ময়দানে। আজই, এখুনি। চটকল বন্দী কে বারে মে। বড় বড় লীডার লোগ আয়ে-হেঁ। অভি চলো, সব মজদুর অভি চলো।...

একজন সর্দার গোছের মুরুব্বি মজুরকে বিষ্টু চলতে চলতে জিগ্যেস করে, "কাদের মিটিং গো? লাল ঝাণ্ডার নাকি?"

"আরে থুঃ" বলে খৈনির থুতু ফেলতে ফেলতে মুরুব্বি জবাব দেয়, "লাল ঝাণ্ডা কি আর এখানে মু দেখাতে পারবে? শালা লোগ বোলে দো নম্বর মিলমে বদলি কামই করো—লড়াই খাতির চট বেশী বানাও—তাতে নাকি হামাদের রোটী ভি মিলবে! অভি মিললো? লড়াই জন্যে হামাদের রোটী ভি গেলো। লাল ঝাণ্ডাওয়ালা ইধর ফের আনেসে মার ভাগায়েঙ্গে।"

বিষ্টু আর চটকলে কতদিন কাজ করছে? খুব বেশী কিছু বোঝে না। জিগ্যেস করে, "এ তবে কাদের মিটিং, কে লীডার আসবে—"

"খুব ভারী লীডর আসবে। সদাকৎ হোসেন কা নাম শুনা? ঐ আসবে।

খুব বড়া আদমি। লাট কৌসিলের মেম্বর, বহুৎ জবরদস্ত। হামাদের জন্যে এক কলম লিখে দেবে তো লাট সাব কো ভি মানতে হোবে। বুঝা?"

কথা বলতে বলতে মিটিংয়ে পৌঁছল। তখন মিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। সদাকৎ হোসেন বলছেন:

"খবরদার কেউ লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের চালে ফেঁসো না। ওরা বলছে দু নম্বর মিলে বদলি কাজ কর, আর সবাই মিলে কাজ জবাবের ক্ষতিপূরণ দাবী কর। আরে, একবার বদলিতে ঢুকলে কি আর সরকার ক্ষতি পূরণ দেবে? বলবে কাজ তো পেয়েছ, আবার কি?"

মুরুব্বি মজুরটি বিষ্টুর গায়ে কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে বলে, "শুনা? বদলি কাজে গেলে খেতি পূরণ পাওয়া যাবে না। কাজ বন্দ করে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাক, ঘরে বসে সরকারের টাকা মিলবে।"

সদাকৎ হোসেন চোখ পাকিয়ে বলছেন: "লাল ঝাণ্ডারা সরকারের দালাল, তাই বলছে বদলি কাজ করো। যাতে সরকারের টাকাটা বেঁচে যায়। ওরা বলে যে-লড়াই চলছে, সে আমাদেরও লড়তে হবে। আরে আজ যে আমাদের এক নম্বর মিল থেকে রুটী উঠল সে কিসের জন্যে? এই লড়াইয়ের জন্যে—এই জন্যেই সরকার মিল নিয়ে নিল, আমাদের রুজি মারা গেল। এই লড়াইই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে।"

বক্তার চেয়ারের কাছে কয়েকজন জোর হাততালি দিয়ে উঠল। বিষ্টু অত সব লড়াই টড়াই বুঝল না। তার মনে শুধু একটা কথা। হাততালির ফাঁকে পাশের মুরুব্বিকে জিগ্যেস করল, "ক্ষেতিপূরণের টাকা কতদিনে পাওয়া যাবে? যদি সরকার না দেয়?"

মুরুব্বি তখন মন দিয়ে বক্তৃতা শুনছে। বল্লে, "শুন্ না ঐ হোসেন সাব কি বলছে।"

সদাকৎ হোসেন বলছেন:

"ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সরকার কোথায় যাবে? আইন আছে, পাকা আইন আছে—সরকার কারখানা নিলে এক বছরের পুরো মাইনা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। লাট সায়েবকেও সে আইন মানতে হয়। গতবার লড়াইয়ের সময় দিতে হয়নি? কয়লার অভাবে যখন কল বন্ধ হল তখন ভাতা আর রসদ দিতে

হয়নি? এবারও না দিয়ে পার পাবে কি করে? ঘরে বসে আমরা টাকা কামাব।"

এবার খুব জোর হাততালি পড়ল, চারিদিকে। গরম হয়ে সদাকৎ হোসেন বল্লেন, "সাত দিনের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় হবেই। দরকার হলে লাট কাউন্সিল পর্য্যন্ত মামলা নিয়ে যাব। তোমরা শুধু সবাই এক হয়ে থাক, কেউ বদলিতে কাজে যেও না। আর, সবাই চাঁদা দিয়ে ফণ্ড জমা কর—জোর মামলা, অনেক টাকা লাগবে। এককাট্টা হয়ে বসে থাক, আইন আছে, টাকা আদায় করে ছাড়বই।"

তুমুল হাততালি। মিটিংও শেষ। উঠতে উঠতে মুরুব্বি বিষ্টুকে বলে, "শুনা? আইন আছে, কানুন! লাট সাবের বাপও রুখতে পারবে না। চল্ চল্ চাঁদা জমা করে দিয়ে আসি।"

হোসেন সায়েবের সাকরেদের ঝুলিতে দলে দলে মজুর এসে আনি, সিকি, টাকা পর্য্যন্ত ফেলে যায়। বিষ্টুও ভগবানের নামে একটা দু আনি কপালে ঠেকিয়ে ঝুলিতে ফেলে দিল।

পথ চলে আর ভাবে: "আইন আছে, আইন। রাস্তায় পেচ্ছাব করে পর্য্যন্ত পার পাবার জো নেই, আইনে ধরে! শুনিছি বৌকে খুন করেছিল বলে কোন্ জজ সায়েবেরও ফাঁসি হয়েছিল—এম্নি আইন! দোহাই ঠাকুর, একটু তাড়াতাড়ি কোরো। সাত আট দিনের মধ্যে যেন ফয়সালা হয়ে যায়।"

"অধর্ম্ম হয়, অধর্ম্ম! পর পুরুষের সঙ্গে ধর্ম্ম নষ্ট কল্লে নরকেও ঠাঁই হবে না। পতির জন্যে সতী পরাণ ছেড়েছিলেন, আর মিন্‌ষে বলে কিনা—। রাম, রাম, ও কথা মুখে আনলেও পাপ।"

রাণী মনে মনে রাগের জাবর কাটছিল। সকাল বেলা সেই উমেদি সর্দার মুখপোড়া আবার এসেছিল। বলেছিল, পনের দিন তো হয়ে গেল কাজ নেই। রসদ বন্ধ। সরকার তো এক পয়সাও দিল না। চাল ফুরিয়েছে কবে? আর কদিন উপোস দিবি?...মর মুখপোড়া, আমরা উপোস দিই তো তোর কি, কত লোকই তো শুকোচ্ছে।...তা কি শোনে? বলে, চল্ আমার

রাণী আকুল হয়ে বলে, "না, না, ও কটা নিয়োনা, কাল খোকা খাবে। বাছা একেবারে হাড়গোড় সার হয়ে গেছে, সকালে এক মুঠো না পেলে বাঁচবে না।"

"ওঃ ভারী আমার নবাবপুত্তুর। সব পিণ্ডিই বুঝি ছেলের গব্বে ঢালিস। আর আমাদের শরীল দিয়ে একেবারে কার্ত্তিকের ছিরি বেরুচ্ছে, না? ভাত নয়, ফেন খাওয়াবি, বুঝলি, ফেন! বাচ্চার ওপরে আর ভাত খরচ করতে হবে না।"

ব'লে হাঁড়িটা উপ্টে পাতের ওপর ঢেলে নেয়।

নিজের দেড় মুঠো ভাত থেকে রাণী আধ মুঠো চুপি চুপি ছেলের জন্যে হাঁড়িতে জল দিয়ে রাখে।

আবার সকাল হয়। ছেলেটা তখনো ঘুমচ্ছে। বিষ্টু বাইরে থেকে এসে বলে, "আজ শেষ চেষ্টা দেখতে হবে। ঐ পাঁচটা ইষ্টিশান পেরিয়ে যে কলটা সেটা আজ খুলবে। দেখি যদি কিছু হয়।"

ততক্ষণে ছেলেটা উঠে "মা খিদে, মা খিদে" বলে ঘ্যান ঘ্যান সুরু করেছে। বিষ্টু এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলে, "শালার ছেলে, পেটে যেন রাবণের চিতে জ্বলছে।"

ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। রাণী তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে থামাবার না-হক চেষ্টা করে।

কিন্তু বিষ্টু তখনি বের হয় না। একটা আড়ামুড়ি ছেড়ে বলে, "উঃ অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, তার ওপর এই ঠায় রোদ। ফিরতে তো সন্ধ্যে হয়ে আসবে। পেটে এখনি আগুন জ্বলছে, খালি পেটে এত পথ চলব কি করে। ঘরে কিছু আছে নাকি রে?"

বলে আর হেঁসেলের দিকে চলে। ছেলে কোলে রাণী ছুটতে ছুটতে এসে বলে, "ও কটা ভাত নিয়োনা গো, নিয়োনা। ছেলেটা একেবারে মরে যাবে।"

ছেলে শুদ্ধ রাণীকে এক ঠেলা দিয়ে বিষ্টু বলে, "থাম হারামজাদি।" হাঁড়ির ঢাকা উঠিয়ে ভাত কটা বার করে নেয়। ভাত চিবোতে চিবোতে বলে, "ছেলের জন্য ভাত লুকিয়ে রেখেছে, আবাগীর বেটী। ছেলেকে নুন

দিতে তো পারিসনি, এখন ঐ ভাতের জল খাওয়াবি, ভাত আর খাওয়াতে হবে না, বুঝলি ?"

মুঠোখানেক ভাতে কি বা হয়। তার ওপরে ঢক ঢক করে এক ঘটী জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাপকে ভাত নিয়ে বসতে দেখে ছেলেটা চুপ করে তাকিয়ে ছিল। যখন দেখল সব ভাত ক'টা খেয়ে ফেলেছে তখন ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। রাণীর চোখেও জল।

রোদ বাড়ে ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ঘোরেও থেকে থেকে কান্নার হেঁচকি উঠছে।

রান্না-বান্না, ঘরকন্না—করবার কিছুই নেই। বাড়ীওলা সেদিন পষ্ট বলে গেছে আজকের মধ্যে ঘরভাড়া মিটিয়ে দিতে না পারলে কালকে ঘর থেকে বার করে দেবে।

রাণী বসে বসে ভাবে। কাল আবার উমেদি এসেছিল। এই শেষবার। বলেছিল : দক্ষিণের এক মিলে কাজ পেয়েছি,, সেখানে কাল চলে যাব। চল্ রাণী, আমার সঙ্গে চল্। মরদ আর বেটা নিয়ে কি করবি ? ওরা খেতে দেবে ? আপনি বাঁচলে বাপের নাম ! ছেলেটাকে ফেলে রেখে চল্ আমার সঙ্গে।

রাণী কাল আর তাকে তেমন কড়া কথা শোনাতে পারে নি। মনে কেমন যেন জোর পায় নি। যাবার সময় উমেদি বলে গিয়েছিল, 'আসবি তো কাল দুপুরে আমার ঘরে আসিস। ঐ সময়ে আমি টিরেন ধরব।'

সেই 'কাল দুপুর' আজ এসেছে।

রাণী বসে বসে ঘুমন্ত ছেলেটার মাথায় হাত বুলোয়। পাঁজরার হাড়-গুলো বেরিয়ে এসে যেন প্যাঁট প্যাঁট করে তাকাচ্ছে। বুকের হাড়গুলোও শীগ্‌গির জিরজির করবে।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রাণী মনে মনে বলে; 'ধন আমার, মাণিক আমার, সোনা আমার।' বার বার বলে।

বাইরে আওয়াজ হয়, 'বল হরি হরিবোল'। আস্তে আস্তে উঠে এসে রাণী দেখল। রাস্তা দিয়ে কোন্ ভাগ্যিমানের মড়া যাচ্ছে। সঙ্গে কত লোক। খোল বাজে, করতাল বাজে। খাটের সামনে খৈ ছিটোচ্ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে শুধু খৈ নয়, তার সঙ্গে পয়সাও।

সঙ্গে, দূরে বজবজ টজবজ কোথাও গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নেব। আমি সর্দার আমার কাজের ভাবনা কি ? হাতেও তো কিছু আছে।...দূর হ' হতচ্ছাড়া।

তবু মনের ভেতর কোন্ খানটায় যেন খুঁতখুত করে। রাণী আবার জোর ক'রে ভাবে : উঃ মিনষের কি আস্পদ্দা। বলে কিনা, খোকাকে ঘরে ফেলে রেখে এই বেলা চল্, আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়। আমার খোকাকে ফেলে যাব ঐ আবাগীর পুতের সঙ্গে। দূর হ' নচ্ছার বেটা খোট্টা কোথাকার।

উঠে গিয়ে ছেঁড়া কাঁথা থেকে খোকাকে তুলে নিয়ে আদর করে, "আমার খোকন, আমার খোকন, বাপ আমার !" আবার ভাবে জমা চাল তো পাঁচ দিন আগেই শেষ হয়েছে। তারপর এক টাকা দিয়ে এক সের চাল কিনে এনেছিল, তাও কি সহজে পাওয়া যায় ? মাগো, এক সের চালের দাম এক টাকা এতো জন্মে শুনিওনি। একবেলা করে আধপেটা খেয়ে তবু সে চালও পরশুদিন ফুরিয়েছে। কাল তো হরিমটর গেল। এক মুঠো বাসি ভাত খোকাটা পেয়েছিল, আজ তাও জোটেনি। বাপরে, কি হবে ?

সাত দিনের উপোস আর অর্দ্ধাহার এখনই ছেলেটার মুখের ওপর তার ছাপ বসিয়ে দিয়েছে। পেটটা শুকিয়ে কোথায় যেন ডুব মেরেছে। ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদতে কাঁদতে বল্ল, "খিদে পেচে, মা ভা দে।"

"ধন আমার, মাণিক আমার, কাঁদে না। একটু সবুর কর। এই বাপ এলো চাল নিয়ে। গরম ভাত দেব যাদু আমার।"

"দরম ভা খাব না, মুক পুলে দায়। থান্দা ভা খাব।"

"আচ্ছা আচ্ছা ঠাণ্ডা ভাতই দেব। একটু দাঁড়া, এই বাপ এলো বলে।"

ঠাণ্ডা ভাত পাবার আশায় কি যেন ভেবে ছেলেটা চুপ করে।

বিষ্টু এসে ঘরে ঢুকল।

শুকনো মুখ দেখে শুধোতে সাহস হয় না। তবু আমতা করে রাণী জিগ্যেস করে, "কি হল, কিছু হল ?"

খেঁকিয়ে উঠে বিষ্টু জবাব দেয়, "হবে আবার কি আমার মাথা মুণ্ডু। কাজ নিয়ে কি লোকে বসে আছে।"

রাণী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে বিষ্টু বলে, "শুধু আমিই

নয়, সবারই এক দশা। যত বাছাধন ঘরে বসে ক্ষেতিপুরণ খাবেন ভাবছিলেন, সব এখন দু নম্বর মিলের দরজায় ঘুর ঘুর করছেন!"

অন্য সবাই তার মত বোকা বনেছে ভেবে দুঃখের মধ্যেও একটু আনন্দ হয়। তার পরেই মনে পড়ে শুকনো ভবিষ্যৎ। ম্যানেজার সায়েব ও তার বাপ সম্বন্ধে একটা খুব খারাপ গাল দিয়ে বলে, "উঃ শালা কি খচ্চর। কাউকে নেয় না! বলে সাত দিনের মধ্যে যারা এসেছিল তাদের কাজ দিয়েছি, এখন আর বদলির দরকার নেই।"

রাণী একটু ভয়ে ভয়ে বলে, "চালও আনোনি? পরশু রাত থেকে তো উপোস চলছে। আমরা না হয় সইলাম। কিন্তু খোকা বেচারী সইতে পারবে কি?"

"খোকা, খোকা, খোকা, তোর কেবল ঐ খোকা", বিষ্টু একেবারে ফেটে পড়ে। "বিইয়েছিলি কেন ওকে মাগী? নুন টিপে মারতে পারিসনি? আপদ আসে যত শুধু গিলবার জন্যে।"

গামছায় বাঁধা ছোট্ট চালের পুঁটুলিটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে, "ঐ নে, পিণ্ডি বানা, গেল্!"

রাণী খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সময় যায়। রাগটা একটু শান্ত হলে বিষ্টু বলে, "দেখ্ ঐ আধ সের চাল, অনেক খুঁজে পেতে সাড়ে ছ'আনায় জোগাড় করেছি। এত করে বল্লাম তা মুদী বেটা কিছুতেই আধ সেরের বেশী দিল না। খুব সাবধানে টিপে টিপে খরচ করবি, বুঝলি। পুঁজি তো ফুরিয়ে এল, ওতেই কদিন চালাতে হবে।"

অনর্থক হায়রানি। গঙ্গার এপার ওপার দশ কোশের মধ্যে যত চটকল আছে ঘুরে পায়ের সুতো ছিঁড়ল। কে কাজ দেবে? এম্‌নিতেই লোক নেয় না। তার ওপরে কয়লা নেই বলে কতগুলো কল বন্ধ। মালিকরা এখন মজুর তাড়াতে পারলে বাঁচে, সস্তা চাল আটায় টাকা খরচ হয় না।

বিষ্টু ঘুরে ঘুরে মরে আর হায়রান হয়ে ফিরে আসে। এক পো চালে দুজন, তার ওপর খোকা—পেটের কোণাও ভরে না। বিষ্টু বলে, "দুজনের এই কটা ভাত? দেখি, হাঁড়ি দেখি। ওই যে হাঁড়িতে এক মুঠো রয়েছে! নিয়ে আয়, রেখেছিস কার জন্যে মাগী?"

রাণী হন হন করে এগিয়ে যায়। পয়সা নয়, ডবল পয়সা আর আনি। তাও তো বটে, পয়সা আজকের দিনে কোথায় পাবে?

কিন্তু কি ভিড়, আর পয়সা কুড়োবার জন্যে কি মারামারি। রাণী খানিকটা দূর খাটের সঙ্গে সঙ্গে চল্ল, কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে পয়সা কুড়োনো কি মেয়ে লোকের সাধ্যি।

রাণী একটু দমে যায়। তারপর যে বাবু পয়সা ছিটোচ্ছিল তার কাছে এগিয়ে গেল। বল্ল, "বাবু, আমাকে একটা পয়সা দাও না।"

বাবু মুখ না তুলেই বলে, "দূর মাগী, ঐ সবাই যেখানে কুড়োচ্ছে ওখান থেকে কুড়ো না।" তারপর মুখ তুলে চায়। রাণীর সঙ্গে চোখোচোখি হয়। চোখ থেকে নজর নামে মুখে, বুকে, সর্ব্বাঙ্গে। একটু ঢোক গিলে বাবু বলে, "আচ্ছা, এই নাও।" ওর হাতে একটা আনি ফেলে দেয়।

...দুপয়সা করে ছোট্ট দু ঠোঙ্গা মুড়ি কিনে নিয়ে রাণী ঘরে ফিরল। ছেলেটা তখন ঘুম ভেঙ্গে উঠে কাঁদছে। এক ঠোঙ্গা মুড়ি আর এক ঘটী জল ছেলের সামনে ধরে দিল।

আর একটা ঠোঙ্গা তুলে রেখে দিয়ে রাণী আবার ভাবতে বসে।

উমেদি...দক্ষিণের কোন্ মিল...ছেলে...সোয়ামি...উপোস। ধম্ম... অধম্ম...ভাত নেই। ফেন ভাত নেই? গাঁয়ের মাঠে কত ফসল ফলে। গাঁয়ের মন্দিরে কত ধম্ম হয়।...গাঁয়ে ধম্ম আছে। গাঁয়ে ভাত আছে নিশ্চয়...

বেলা পড়লে বিষ্টু ফিরল। শুকনো মুখে মেঝের ওপরই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। দেখলেই বোঝা যায় যে কাজ পায়নি।

খানিকক্ষণ কথা নেই। একটু পরে মুড়ির ঠোঙ্গা আর জলের ঘটিটা এনে বিষ্টুর হাতের কাছে রেখে রাণী বল্ল, "ওঠ, একটু জল খেয়ে নাও।"

"মুড়ি? মুড়ি কিনবার পয়সা কোথায় পেলি?" সন্দেহে বিষ্টু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাঠের বাক্সর সামান্য পুঁজিটা মাগী ভাঙ্গছে না তো! মুড়ির ব্যাপার রাণী বলে যাচ্ছে তবুও বিশ্বাস হয় না। কোমরে হাত দিয়ে দেখে চাবিটা—ঠিক আছে। হাত বাড়িয়ে বাক্সর তালাটা নেড়ে দেখে—ঠিক আছে। আশ্বস্ত হয়। উঠে বসে মুড়ি চিবোতে আরম্ভ করে। মনটা একটু গলে। বলে, "তুই খাবি নে?"

"আমি খেয়েছি", বলে রাণী ওর কাছে এসে গা ঘেঁষে বসে। পিঠের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "দেখ, চল আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই।"

"গাঁয়ে? সেখানেও তো শুনেছি ভাতের আকাল। সেদিন কে যেন বলছিল।"

"তা হোক, এখানকার মত এক সের চাল কখনো এক টাকা হবে না। আমাদের জমিতে না হয় আউশ হয় না, কিন্তু লোকের ঘরে তো এবার শুনিছি ভাল ফসলই উঠেছে। বাড়ী বাড়ী খাটলে দু মুঠো ভাত কি আর পাওয়া যাবে না?

"তা যা বলেছিস। পাঁচ সাত মাস কেষ্টরও কোনো খবর পাইনি। আমনের চাষ কেমন হল, বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের সঙ্গে ভাগের কি ব্যবস্থা হল কিছুই বুঝলাম না।"

"ঠাকুরপো তো আর নেকাপড়া জানে না যে চিঠি দেবে। নিশ্চয়ই সব ঠিক আছে। খারাপ হলে খবর পাওয়া যেতই, অমঙ্গলের খবর বাতাসের আগে যায়।"

বিষ্টু একটু দোমনা হয়ে বলে, "তার চেয়ে কলকাতা গিয়ে কাজের চেষ্টা দেখলে হয় না? সেখানে শুনেছি কণ্ট্রোলের দোকানে ছ' আনা সের চাল পাওয়া যায়। ভিক্ষে শিক্ষেও বোধ হয় মেলে।"

"দূর আমরা কি ভিকিরি! আর, কলকাতার চালের কণ্ট্রোলের কথা আর বোলো না। ঐ রামপীরিতের বুড়ি একদিন গিইছিল। সারারাত সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে যদি বরাত ভাল হয় তো এক আধ সের চাল মেলে। নাইনেই দাঁড়াবে তো কাজ খুঁজবে কখন? থাকবে কোথায়? ফুটো পুঁজিতে কদিন চলবে?"

"তা বটে।" একটু ভেবে নিয়ে বিষ্টু আবার বলে, "হ্যাঁ, তা এই এখন হল তোর গিয়ে আশ্বিনের শেষ। অঘ্রাণ পর্য্যন্ত মাস দেড়েক কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পাল্লে তারপরে আমাদের জমির ধানই উঠবে। তখন শোধ দেব বলে চাইলে বাঁড়ুয্যে ঠাকুর কি আর এ কদিনের ধান কর্জ দেবে না?"

"হ্যাঁ। না হয় কিছু কমই দেবে। আধপেটা খেয়েই থাকব। তাও তো এখানকার চেয়ে ভাল।"

বিষ্টু মনে মনে হিসেব করে। কাঠের বাক্সয় গেঁজের ভেতর অতি কষ্টের জমানো সম্বল আছে ন টাকা সাড়ে ছ আনা। দু জনের টিকিট লাগবে বার আনা বার আনা দেড় টাকা। না, বৌয়ের টিকিটটা ফাঁকি দেওয়া যাবে, মেয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিলেই হবে।

"আচ্ছা চল্ যাওয়াই যাক। এ ঘর তো কাল এমনিই ছাড়তে হবে।"

(দুই)

তারা যখন গাড়ী থেকে ইষ্টিশনে নামল তখন বেলা এগারোটা হবে।

ইষ্টিশান থেকে আরও সাত কোশ পথ। মধ্যে চার পাঁচটা গাঁ, তারপর ওদের গাঁ—বাজিপুর।

বিষ্টু জোয়ান মরদ, হন হন করে এগিয়ে চলে। ছেলে কোলে নিয়ে রাণী পারে না, পেছিয়ে পড়ে। বিষ্টু দূর থেকে খেঁকিয়ে ওঠে, "কি রে মাগী চলতে পারিস নে?"

রাণী বলে, "ছেলে কোলে নিয়ে কি তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়! একটু আস্তে চল।"

"ঐ ছেলে নিয়েই তুই মরবি," বলে বিষ্টু আবার এগিয়ে চলে। হাঁপাতে হাঁপাতে রাণী কোনো রকমে তাল রাখে।

সূয্যি ছিল ঠিক মাথার ওপর, এখন নামছে। আশ্বিন মাসের গুমসো গরম, তার ওপর মেঘ নেই, রোদগুলো যেন সোজাসুজি এসে বেঁধে। সারা গা চিড়বিড় করে। শুকনো পথ আর দুনিয়ার ধুলো। জল-পিপাসা লাগে।

পথের সাথী আর কেউ নেই। ইষ্টিশন থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত তারা একাই চলেছে। কখনো কখনো উল্টো দিক থেকে লোক আসতে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য, পুরুষ মানুষ বড় নজরেই পড়ে না। যারা আসে তারা মেয়ে। কারও কোলে বাচ্চা। কেউ বা ছেলেপিলেকে হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলেছে। একলা যায় না। দুজন তিনজন কি তারও বেশী একসঙ্গে চলেছে।

তারা পা টেনে টেনে আসে। কোথাও পৌঁছবার যেন তাড়া নেই। কিংবা বহুদূর যাবে। দেখলে মনে হয় খুব ক্লান্ত। ওরা যদি একটু ঠাওর করে দেখবার সুযোগ পেত তা হলে বুঝতে পারত এ ক্লান্তি তাদের অনেক দিনের। অনেক পথ হাঁটার নয়, অনেক উপোসের। কিন্তু রাস্তার মধ্যে কয়েক লহমার দেখা, ওরা নতুন মানুষ—বুঝবে কি ক'রে? তারা হেঁচড়ে হেঁচড়ে আসে কিন্তু থামে না। যেন থামলে আর চলতে পারবে না।

বিষ্টু খানিকটা আগে, রাণী খানিকটা পেছনে। অনেকক্ষণ পরে খালি দুজন মেয়ে লোককে একা আসতে দেখে বিষ্টু একটু দাঁড়িয়ে শুধোল, "হ্যাঁগা বাছা, তোমরা কোথায় যাবে?"

মেয়ে দুটী প্রথমে যেন একটু উৎসুকভাবে দাঁড়াল। বল্ল, "কলকাতা যাব গো, কলকাতা।"

বিষ্টু বল্ল, "কলকাতা? সেখেনে তোমাদের আপনার লোক আছে বুঝি?"

বিষ্টুর গরীব হাল আর রুক্ষ চেহারা ততক্ষণে মেয়ে দুটীর ভিক্ষে চাইবার আশা ভেঙ্গে দিয়েছে। তারা নিরাশ হয়ে পা বাড়াতে বাড়াতে বল্ল, "না, কলকাতায় নাকি খিচুড়ির নঙ্গর খুলেছে। তাই যাচ্ছি।"

বিষ্টু আবার কি শুধোতে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা তখন এগিয়ে গেছে।

রাণী দেখছিল ধানের খেত। পথের নীচে কতকগুলো শণ গাছ, মাথায় শাদা শাদা ফুল। তারপরেই খেত। খেতের পর খেত, ঐ দূ-উ-রে একেবারে আকাশ পর্য্যন্ত। ভাগাভাগির আলগুলো কবে চাপা পড়ে সব একাকার হয়ে গেছে। আকাশ পর্য্যন্ত সবুজ লক লক করে।

আমন ধান। চারাগুলো কত বড় হবে? হাঁটু পর্য্যন্ত? না, উরুত ছাড়িয়ে উঠেছে। ঐ তো মাঝে মাঝে দু একটা গাছে ধানের শীষও বেরিয়েছে। তবে এখনো সবুজ। খাওয়া যায় না।

ওঃ এত ধান! কত, কত চাল হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—কেবলি খাওয়া যায়। খেয়ে ফুরোনো যায় না। উঃ কি খিদে! পরশু রাত্তিরের পর তো আর পেটে কিছু পড়ে নি। তার ওপরে পিপাসা। ছেলেকে ধরা বাঁ হাতটা ঝিন ঝিন করছে। রোদের তেজ কি আর আজ কমবে না? একটু জল পেলে বাঁচতাম। হাতটাই জিড়িয়ে নিতাম।

হঠাৎ বিষ্টুর ডাকে চমক ভাঙ্গল। বিষ্টু শুধোচ্ছে, "হ্যাঁরে, নঙ্গর কাকে বলে জানিস?"

"খিচুড়ির আবার নঙ্গর হয় নাকি? নঙ্গর নয় বোধ হয় নোংর, নৌকোর নোংর।"

বিষ্টু ভাবতে ভাবতে বলে, "আরে দূর, তা হলে তো বুঝতামই। মরুকগে যাক। চল্ এখন পা চালিয়ে চল।"

"একটু জল পাওয়া যায় না? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

"এই মরেছে। মেয়েমানুষ নিয়ে পথ চলাই গুখুরি। এইটুকু চলেই জল চাই। তারপর বলবে ভাত চাই, শোবার বিছানা চাই। কত সখ। চল্ চল্ একেবারে ঘরে গিয়ে জল খাবি।"

কিন্তু খানিক দূর অন্তর অন্তর আবার জলের জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করে। বার বার এড়াতে না পেরে বিষ্টু বল্ল, "আচ্ছা ঐ সামনের গেরামের ভেতর দিয়ে যাবখুনি। ওখানে জল পাবি।"

অল্প দূরে একটা গাঁ। গাঁয়ের সবটা দেখা যায় না। তবে পথ থেকে নেমে, মাঠের ঐ বাঁদিকে বাঁশঝাড়ের ওপাশ দিয়ে খানকয়েক কুঁড়ে ঘর দেখা যায়।

...আরও কাছে। একই হাতার মধ্যে তিন চারটে কুঁড়ে। এককালে বোধ হয় বাঁশের বেড়া দিয়ে তফাৎ করা ছিল। এখন শুধু দু চারটে খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

হাতার সামনে বাঁশঝাড়ের তলে এসে বিষ্টু বল্ল, "তুই এখানে একটু দাঁড়া। আমি দেখি ডাক দিয়ে।" রাণী খোকাকে মাটিতে নামিয়ে ছায়ার নীচে ধুপ করে বসে পড়ল।

এগিয়ে গিয়ে বিষ্টু ডাকল, কে আছেন গো মশাই। একটু শোনো না।" জবাব নেই। তিন চার বার ডাকল। কোনো জবাব নেই। হয়তো ঘুমোচ্ছে ভেবে বিষ্টু গলা খাঁকারি দিতে দিতে এগিয়ে গিয়ে প্রথম কুঁড়েটার দাওয়ার ওপরে উঠে এসে দাঁড়াল। দাওয়া থেকে খোলা-হাট দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরটা বেশ দেখা যায়।

এ ঘরের ভেতর অনেকদিন মানুষ আছে বলে মনে হয় না। ঠিক দরজার মাথায় চালে বোধ হয় ফুটো। ফুটো দিয়ে বিষ্টির জল পড়ে পড়ে দরজার কাছে মেঝেতে একটা বড় গর্ত্ত হয়ে গেছে। বিষ্টি তো কদিন হয়নি, তাও গর্ত্তে খানিকটা জল দাঁড়িয়ে আছে। ফুটো দিয়ে একটা রোদের টুকরো পড়ে জলটা চিকচিক করছে।

সেজন্যেই ঘরের ভেতরটা প্রথমে ঝাপসা দেখায়। চোখটা একবার বন্ধ করে নিয়ে আবার খুলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিষ্টু দেখল ঘর খালি। মেঝেতে এক পুরু ধুলো। একপাশে একটা কলসী উল্টোনো পড়ে আছে। চাল থেকে ঝোলোনো কয়েকটা কালিমাখা দড়ির শিকের নীচের ভাগটা দেখা দেখা যায়। কিন্তু খালি শিকে।

এ ঘরে মানুষ থাকে না বুঝে বিষ্টু পাশের কুঁড়েটার দরজার সামনে গিয়ে আওয়াজ দিল।

সাড়া শব্দ নেই। ঠিক আগের কুঁড়ের মতই হতচ্ছিরি অবস্থা।

সে কুঁড়েও ছাড়িয়ে বিষ্টু আস্তে আস্তে এগোয়। পড়ন্ত দুপুরের রোদে সারা হাতাটা খাঁ খাঁ করছে। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। কেমন ভুতুড়ে থমথমে ভাব।

বিষ্টুর বুকটা একটু ঢিপ ঢিপ করে। কিরে বাবা, এ গাঁয়ের লোক সব মরেছে নাকি? সামনে তাকিয়ে দেখে একটু দূরে আর একখানা ঘর। অন্যগুলোর চেয়ে বেশ বড়। দাওয়ার ওপরে ঘরের দুটো দরজা। চালটাও খড়ের নয়। কেরোসিন তেলের ক্যানেস্তারা কেটে কেটে জোড়া দেওয়া টিনের ছাত। দাওয়াটাতেও। ওখানে নিশ্চয়ই লোক আছে। বিষ্টু এগিয়ে গেল।

টিনের ওপর জং ধরে গেছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে হাতী মার্কা ছাপ বোঝা যায়। দাওয়ার টিনের একপাশটা বোধ হয় কম পড়েছিল, সেখানটা খড় দিয়ে ছাওয়া। খড় সরে সরে ফাঁক হয়ে গেছে কিন্তু কেউ আর নজর করেনি।

দাওয়ার সামনে এসে বিষ্টু উঠবে কিনা ভাবছে। একবার জোর গলা খাঁকারি দিল। হুড়মুড় করে ঘরের দরজা দিয়ে কি যেন একটা বেরিয়ে শাঁৎ করে ছুটে গেল। কুকুর? না, শেয়াল।

বিষ্টু একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর কি ভেবে দাওয়ায় উঠে দরজার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিল।

চক্ষুস্থির! প্রথমেই নজরে পড়ে ঘরের ভেতর বাঁশের মাচা। মাচার ওপর ময়লা চিট কাঁথায় শুয়ে—একটা মানুষ।

কি দুর্গন্ধ! ভক করে নাকে লাগে। মাথাটা বাইরে ফিরিয়ে এনে নিঃশ্বেস বন্ধ করে বিষ্টু আবার তাকাল।

মরে গেছে। মরে গেছে।...মানুষ নয়, ওটা মড়া। মুখের ওপর মাছি ভন ভন করছে। একটা ঠ্যাং মাচা থেকে নীচে ঝুলছে। কিসে যেন খুবলিয়ে খেয়েছে।..

দমকা হাওয়ায় কোথায় দূরে একটা দরজা না জানলা ঘটাং করে বন্ধ হয়। হাওয়ায় টক্কর লেগে বাঁশ গাছগুলো কটকট কটকট শব্দ ক'রে ওঠে।

বিষ্টুর সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। আর চাইল না। রাম, রাম, রাম, রাম। হন হন করতে করতে একেবারে বাঁশতলায়।

"চল্ চল্ ওঠ্, শীগ্‌গির চল্।"

"কতকক্ষণ গিয়েছ! জল কি হ'ল গো?"

"চল্ চল্ পালা। এ গাঁয়ে মড়ক লেগেছে। জনপ্রাণী নেই। শুধু বাসি মড়া পড়ে আছে। রাম, রাম, রাম। ওঠ্, শীগ্‌গির চল্, একেবারে ঘরে গিয়ে জল খাস।

উঠে আবার পথে।

রাজিপুরে নিজেদের ঘরের সামনে যখন পৌছল তখন সন্ধ্যে। খিদে আর পিপাসায় কাতর তারা, কোথাও আর দাঁড়ায়নি। গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে আর কারও খোঁজও করেনি। গাঁয়ের টেরেই তাদের ঘর, সোজা চলে এসেছে।

সন্ধ্যে, কিন্তু শাঁখ বাজে না।

'কেষ্ট কেষ্ট' ডাকতে ডাকতে বিষ্টু কুঁড়ের উঠোনে ঢুকল। ওমা, উঠোনের একি ছিরি! এখানে ওখানে আগাছা উঠেছে। দাওয়ায় পর্য্যন্ত দুব্বো গজিয়েছে।

রাণী বলে, "ও কপাল, সজনে গাছ দুটোকে এমন ন্যাড়া করে মুড়োল কে? একটা পাতাও নেই!"

কেষ্টর কোনো পাত্তা নেই। বিষ্টুর বুকটা হঠাৎ ঢিপ ঢিপ করে ওঠে। মনে পড়ে যে গাঁ পার হয়ে এসেছে। মানুষ নয় মড়া।...দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রাণীর জন্যে অপেক্ষা করে। একলা ঢুকতে সাহস হয় না।

দুজনে মিলে ঘরের ভেতর ঢুকল। ভেতরটা তখন অন্ধকার। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ভাল করে দেখল, পাশের হেসেলটাতেও একবার চোখ বুলিয়ে নিল। হঠাৎ আলো দেখে একটা চামচিকে খানিকক্ষণ ঝটপট করে উড়ে পালাল।

ঘরের ভেতর সেই একই ইতিহাস—যা আগের গাঁয়ে দেখে এসেছে। ধুলো, ময়লা আর ভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ি। মানুষ নেই।

রাণী বল্ল, "কি গো, ঠাকুরপো এখনো ঘরে আসেনি? কিন্তু ঘরের এ ছিরি কে করল? কিছু নেই, যেন কোন লোক থাকে না।"

হতভম্বর মত বিষ্টু বল্ল, "মড়ক রে, এখেনেও মড়ক।"

...গাঁ যে একেবারে খালি তা নয়। এমন কি তাদের মত গরাব পাড়ায়ও খুঁজলে দু একজন পাওয়া যায়। তাদের এখনো মরবার সৌভাগ্য হয়নি। কিংবা হয়তো একটু বেশী পুঁজি ছিল।

অনেক তল্লাস করে মোক্ষদা পিসীকে পাওয়া গেল। অল্প অল্প জ্বরে ধুঁকছে। গায়ে একখানা কাঁথা জড়ানো।

পিসীর কাছে সব খবর পাওয়া গেল। কেষ্ট? সে তো আজ মাস খানেক হল ঘর ছেড়েছে। এ তল্লাটের সবাই পালিয়েছে। মড়ক? না....হ্যাঁ তা মড়কই বটে! ভাতের মড়ক। লোকে আর গাঁয়ে বসে কদ্দিন শুকোবে। ভাতের বদলে কচু পাতা, সজনে পাতা। তাও তো ফুরিয়ে গেল! জোয়ান মরদ, বেটা ছেলে তারা সব একে একে সরে পড়ল। কোথায় গেল? কে জানে? হয়তো সহরে ভিক্কে করছে। নয়তো কোন্ ভিন দেশে পথের ধারে মরছে। এখন আবার মাগীরাও সব যাচ্ছে—কলকাতা। সেখেনে নাকি খিচুড়ির নঙ্গর খুলেছে। সত্যি নাকি? জানিস?

তোদের কেষ্ট? হ্যাঁ খুব জানি। দাঁড়া মনে করি। ও হ্যাঁ সে তো বরং পরেই গেল। ঐ যে বাঁড়ুয্যে ঠাকুর। আমন ফসলের সবটা তেনাকে নিকে দিয়ে কিছু চাল ধার পেয়েছিল, তাইতে কদিন চালাল। তা তাতে আর কদিন চলে? আর ঠাকুরও এমন! একবার নেকানেকি হয়ে গেলে তারপর আর এক মুঠো ভিক্কেও দিল না। আমন যখন উঠবে সবটাই তো তেনার ভাগে যাবে। তা দিল না গো! সাতদিন ধরে কেষ্টটা একেবারে শুকোল, কিছুতেই ঠাকুরের দয়া হল না। সাতদিন পরে দেখি কেষ্টও দিয়েছে রওনা। কোথায় কে জানে? হয়তো তোদের খুঁজতেই গিয়েছে।

বাঁড়ুয্যে ঠাকুর? ও হরি, তেনারা পালাবেন কেন? তেনাদের তো পোয়া বারো। গোলায় গোলায় ধান। এখন আবার কি পুলিশ তালাশী এল বলে সব আত্মীয় লোকেদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। তেনারা ঠিকই আছেন, দু হাতে টাকা কামাচ্ছেন। ঐ তো আমার শুধু সোণার নোয়াটা বাকী ছিল, সোয়ামির অকল্যাণ হবে বলে ছুঁইনি। তা পোড়া কপালে সেদিন তাও বাঁড়ুয্যে ঠাকুরকে দিয়ে ধান নিয়ে এলাম। এর পরে যে কি হবে!

পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায়। বিষ্টুর পা-টা কাঁপে।

রাণী ফ্যাল ফ্যাল করে চায়। কে যেন মাথায় বাড়ি দিয়ে সমস্ত গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেটা কাঁদে, খেয়ালও করে না।

নিজেদের ঘরের দাওয়ায় দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ চাপ বসে থাকল। মাথার মধ্যে অসংখ্য ভাবনা চিড়বিড় করে। কিন্তু শেষ হয় না, কোথাও পৌঁছায় না, ঘুরে ফিরে পাগল করতে থাকে। মনে হয়, নেই, নেই, নেই। একমাত্র রোজগেরে ছেলে হঠাৎ মরলে যেমন মনে হয়।

অন্ধকারের মধ্যে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে শেষকালে বিষ্টু বল্ল, "আচ্ছা তোরা থাক। আমি একবার বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের ওখেনে ধন্না দিয়ে আসি। কিছুই হবে না, তা কখনো হয়।"

রাণীর মনে হঠাৎ একটা ভয় জাগে। কিসের ভয় তখনি ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু খুব ভয়। মনে হয় একা, একেবারে একা। তাড়াতাড়ি

মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, "না, না, আমাকে একা ফেলে যেও না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

খোকাটা আবার ঘ্যান ঘ্যান কান্না সুরু করে।

বিষ্টুর মনেও ভয় হয়। আর এক ধরণের। মনে হয় বোঝা, প্রকাণ্ড ভারী বোঝা। না নামলে নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না। খেঁকিয়ে উঠে বলে, "মর মাগী, তুই আবার কোথায় যাবি! বসে থাক্, আমি এখুনি ঘুরে আসব।"

কিন্তু রাণী নাছোড়বান্দা। সঙ্গে সঙ্গে চল্ল।

...বাঁড়ুয্যে ঠাকুর বিপত্নীক। তাই ধম্মে খুব মতি। সুর করে করে মোহমুদ্গর পড়ছিলেন: 'কে তোমার স্ত্রী আর কেই বা পুত্র—এই সংসার হায়, বড়ই বিচিত্র।'

ওদের ডাকে উঠে এলেন। কে রে? ও বিষ্টু, তা এখন মত্তে গাঁয়ে এলি কেন? কাজ গেছে বলে অম্‌নি চলে এলি? দূর গাধা, ওখানে থেকেই আর একটা কাজের চেষ্টা কর্ত্তে হয়!

"চটকলে তো শুনিছি আজকাল খুব রোজগার। তা কিছু এনেছিস টেনেছিস? সেই কত মাস আগে ক'টা টাকা পাঠিয়েছিলি, তারপরে তো আর এক পয়সাও ঠেকাস নি। এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে আমাদেরও তো চালাতে হবে!

"পাগল নাকি, বলে চাল দেন! চাল কি কারো কাছে থাকবার জো আছে?—পুলিশ এসে ঘরে ঘরে হামলা দিয়ে সব কেড়ে নিয়ে গেল না!"

দূরে তাকিয়ে আবার বাঁড়ুয্যে ঠাকুর বলেন, "তোর সঙ্গে আবার কে রে? ওঃ তোর পরিবার! একেবারে সপরিবারে এসেছিস, এবার গাঁয়ে কোঠা বানাবি নাকি?"

নিজের রসিকতায় খুশী হয়ে বাঁড়ুয্যে আর একবার রাণীর দিকে চান। পাতলা অন্ধকার, তার মধ্যে ঘর থেকে দু একটা আলোর ফালি এসে পড়েছে। ছোট্ট কাপড়ে ঘোমটা টানতে গিয়ে বুকের কাপড়টায় টান ধরেছে। তার ওপরে অল্প আলো আর বেশী ছায়ায় বুকের খাঁজগুলো আরও গভীর দেখায়। মনে হয় বেশ পুরন্ত। অনাহারে গালের মাংস যেখানটায় শুকিয়ে এসেছে অন্ধকার সেখানটা ভরিয়ে দেয়। মনে হয় বেশ গোলগাল।

আন্‌মনে বাঁড়ুয্যে বল্লেন, "আচ্ছা, আসিস কাল দিনের বেলায়। দেখব কি করা যায়।"

পরদিন সকালে আবার বাঁড়ুয্যের ওখানে। এবার বিষ্টু একলা।

বাঁড়ুয্যে একেবারে কট্টর কাঠখোট্টা। "ধান টান দিতে পারব না বাপু, একমুঠোও না। জমিটাতে আমন উঠলে তাতে তোর কি? সে সব কেষ্টর সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে। নইলে খেত কি? ঘরের যা কিছু সব তো আগেই গব্বে ঢেলে বসেছিল। তারপর পাক্কা দুটী মাস খাওয়ালাম। এই বাজারে বেচলে কত টাকা হত! তা ছোঁড়াটা এমন নেমখারাম। যাবার সময় একটা পেন্নামও করে গেল না।"

অনুনয়, বিনয়, পা ধরে কান্নাকাটি। কিছুতেই কিছু না। একটু ভেবে যেন নেহাৎ অনুগ্রহ করবার জন্যেই বাঁড়ুয্যে বল্লেন, "ধান দিতে পারব না বাপু, পষ্ট কথা। তবে তুই হলি পুরোণো খাতক, একটা রাস্তা বাৎলে দিই। জমি তো তুই আর জন্মেও ছাড়াতে পারবিনে। তার চেয়ে জমিটা একেবারে আমার নামে লেখাপড়া করে দে। নগদ দশটা টাকা পাবি।

টাকা নিয়ে কি করবি? একেই বলে মুখ্যু চাষা। আরে তুই হলি বেটা ছেলে, জোয়ান মরদ। টাকা নিয়ে কলকাতা চলে যা, যাহোক একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবিই। কত বড় শহর, সেখেনে কত কাজ। কাগজে লিখেছে সেখেনে নাকি আবার লঙ্গর খুলেছে, বিনি পয়সায় খিচুড়ি খেতে দেয়। কিছু না পাস তাও তো পাবি।"

বিষ্টু বৌ ছেলের কথা ভেবে দোমনা করে। তাদের তো আর নিয়ে যাওয়া যায় না। কোথায় রাখবে? কি খাওয়াবে?

বাঁড়ুয্যে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "মেয়ে মানুষের কথা কেন ভাবিস? বেঁচে থাকলে ইস্তিরির কি আর অভাব হবে? গাঁয়ের সব পুরুষই তো পালাল, একটা বেটাছেলে দেখেছিস তোদের পাড়ায়? তাদের ভাবনা হল না আর তোরই যত ভাবনা!"

বিষ্টুর মনটা ভিজে আসছে দেখে বাঁড়ুয্যে তাড়াতাড়ি বল্লেন, "আচ্ছা নে বারোটা টাকাই দেব। চল্ চল্ ওঠ, শুভস্য শীঘ্রং। একেবারে বেলায়

বেলায় গিয়ে আজই লেখাপড়াটা রেজিষ্টারী করিয়ে নেওয়া যাক। পাঁচখান গাঁ পার হয়ে রেজিষ্টারী আপিস, ওঠ্ এইবেলা যাত্রা করি।”

দুজনে মিলে রওনা হলেন।

রাত্তিরেও বিষ্টু ঘরে ফেরে নি। রাণীও ঘুমোয় নি। একবার করে উঠছে, বাইরে এসে দেখেছে বিষ্টু ফিরেছে কিনা, আবার ঘরে গিয়ে খোকার পাশে জেগে কাটিয়েছে। কদিন যে কিছু খাওয়া হয়নি সে কথা পর্য্যন্ত একবারও মনে পড়ে নি। শুধু উৎকণ্ঠা। আর ভয়। সত্যিই কি বিষ্টু ফেলে পালাল।

সকাল হতে না হতেই ছুটল বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের বাড়ীর দিকে। পথে মানুষ আসে, দূর থেকে মনে হয় ঐ বুঝি বিষ্টু। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যায়, আবার কাছে এলে ভুল ভাঙ্গে।

…বাঁড়ুয্যে ঠাকুর বল্লেন, “আমি কি করব! আমি তো বরং মানা করলাম। বল্লাম বৌ-ছেলে ফেলে কোথায় যাবি? তা কি হতভাগা শুনল! কোথায় রওনা দিল—বল্ল আর গাঁয়ে ফিরছি না।” একটু থেমে বল্লেন, “তা বিষ্টুটার স্বভাব-চরিত্রই ঐরকম।”

রাণীর মনে হল যেন হঠাৎ কিসের সঙ্গে ভীষণ জোরে ঠোক্কর খেয়েছে, সমস্ত মাথাটার ভেতর ঝিমঝিম করছে। পা দুটো আর শরীরের ভার বইতে পারছে না। কখন, কি করে বাঁড়ুয্যের বাড়ী থেকে পথে এসে দাঁড়াল তা ঠাওরই হয় না।

অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকার। একটু আশা, একটু সান্ত্বনাও কোথাও নেই। মোক্ষদা পিসী শুনে বল্লেন, “ও আমি তখনই জান্তাম। একটা ছেলে ঘরে রইল না! দেখে নিস বিষ্টু আর ফিরছে না।” বলেই পিসী তাড়াতাড়ি দোর এঁটে দিলেন, পাছে রাণী হয়তো দুটো চাল চেয়ে বসে!

আশা নেই, তবুও রাণী সারা গাঁ বার দুই ঘুরে এল। যদি বিষ্টু এম্‌নি কোথাও বসে থাকে।

দিন যায়, রাত আসে, আবার সকাল হয়। ভাবনা তো আছেই, কিন্তু সে সমস্ত ছাপিয়ে পেটের ভেতর খিদের জ্বালা। কদিন ঠায় উপোস। ছেলেটার বুকের হাড় আর পাঁজরার হাড় এখন সমান জির জির করছে। নিজের পেটেও কেমন যেন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা। মনে হয় পিঠ আর পেট এক হয়ে গেছে। মুখের ভেতরটা বিশ্রী ভিজে, ক্রমাগত লালা ঝরে।

বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের ওখেনে একদিন একমুঠো চাল চাইতে গিয়েছিল। তা তিনি সোজা হাঁকিয়ে দিলেন। বল্লেন, “খবরদার এ বাড়ীতে আসিস নে। এখেনে কি মচ্ছব পেয়েছিস? বিষ্টু হারামজাদা জমিটুকুর জন্যে করকরে অতগুলো টাকা গুণে নিয়ে গেল, পেন্নাম বলেও একটা টাকা ফেরৎ দিল না। আর এখন তার ইস্তিরি এসেছেন—চাল দাও! যা মাগী অন্য জায়গায় ভিক্ষে করগে যা।”

ভিক্ষের জন্যেই কি কম ঘুরেছে! নিজেদের গাঁ তো বটেই, আশে পাশের কখানা গাঁয়ে দোরে দোরে হাত পেতেছে। মাগো! হাড় জিরজিরে ছেলেটাকে দেখেও কেউ এক মুঠো ভাত দিল না!

মেইতে একটুও দুধ নেই। তবু তাই বার বার ছেলেটার মুখের মধ্যে চেপে ধরে। ছেলেটা শান্ত হয় না। খুব চেঁচিয়ে কাঁদবার ক্ষমতা আর নেই। অল্প অল্প আওয়াজে কাঁদে, দাঁত দিয়ে মেই কেটে কেটে ধরে। ভয়ানক লাগে।

কিছুক্ষণ থামাবার জন্যে খালি জল খানিকটা জোর ক'রে ছেলেটাকে খাইয়ে দিয়েছিল। তা খালি পেটে সইবে কেন? একটু পরেই হড়াৎ করে সব বমি হয়ে গেল।

তবু ভিক্ষের জন্যে পথে পথে ঘোরে। আর ভাবে বিষ্টু তো চলে গেল।… উমেদি হলে, সেও কি এম্‌নি ফেলে পালাত? হয়তো পালাত না। কোথায় গেল, দক্ষিণের কোন্ মিলে? তখন যদি জেনে নিতাম! দুটী ভাতের ভাবনা আর ভাবতে হত না।

পথে পথে ভিক্ষে চায়। প্রায়ই কিছু মেলে না। বেশীর ভাগ লোক তো তাকিয়েও দেখে না। কদাচিৎ এক আধজন একটা ডবল পয়সা ফেলে দেয়। কিন্তু ভাত কেউ দেয় না। মাগো! ডবল পয়সায় কি হয়, তাতে তো কেউ একমুঠো চালও বিক্রী করে না।

কখনে সখনো দু একজন লোক কি রকম চারিদিক তাকাতে তাকাতে ফিস ফিস করে বলে, 'আমার সঙ্গে চল্, অনেক ভাত খেতে দেব।' কিন্তু বিশ্বাস হয় না। সাহসও বোধ হয় পুরোপুরি হয় না।

...ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রাণী ঘরে ফিরে এল। খিদের চোটে কেঁদে কেঁদে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে রেখে দাওয়ার খুঁটিটায় হেলান দিয়ে অবশভাবে বসল।

আকাশে রঙ্গের ছটা। রাঙ্গা আর বেগুনি আর আরও কত মেশানো রঙ্গের মধ্যে দিন তখন ফুরোচ্ছে। তার মনের মধ্যেও কি যেন ফুরিয়ে আসে।

খালি মনে হয়, নেই, নেই, নেই। কিছু নেই, কেউ নেই। আশা নেই, ভরসা নেই।...ছেলেটা বাঁচবে কি ক'রে?

নেই, নেই। গাঁয়ে ভাত নেই, গাঁয়ে ধম্ম নেই। ধম্মের বাঁধন, তাও ছিঁড়ে পালাল!

খিদেটা মাঝে মাঝে মোচড় দেয়, ভোলা যায় না। কিন্তু তার চেয়ে বেশী হয় ভয়। সামনের ভবিষ্যতটা সম্বন্ধে একেবারে ধারণাও করা যায় না, তাই মনে হয় আরও বেশী ভয়ঙ্কর। একদম শূন্য, খালি। ঠিক যেন পেটের ভেতরটা। তারই আতঙ্ক।

অন্ধকার ঘন হয়। ভাবতে ভাবতে কেমন একটা নির্লিপ্ত অবসাদ আসে। খোকাটা ঘরের ভেতর চেঁচাচ্ছে, উঠে গিয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে না। শরীর, মন সমস্ত অবশ।

জোনাকি জ্বলে। আবার, পেটের ভেতর, মাথার ভেতরও জোনাকি জ্বলে। জ্বলছে, নিভছে। ভরা পেট আর খালি পেট। কত তফাৎ!

আস্তে আস্তে বাঁড়ুয্যে ঠাকুর এলেন। "কে গা, বিষ্টুর বৌ নাকি?"

রাণীর ভাবান্তর হয় না। ঠাকুর মশাই এলেন, উঠে বস্, আসন দে, ঘোমটা টান্! না, তার কিচ্ছু না। অবশ ভাবে মনে মনে আওড়ায়, "ভাত। ছেলেটা খাবে কি? বাঁচবে কি করে?"

বাঁড়ুয্যে ঠাকুর দাওয়ার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খুব দুঃখু করলেন।

"বিষ্টুটা—সত্যিই পালাল! বৌ-ছেলেকেও দেখল না। হতভাগা, বদমায়েস।"

বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের পুরুষ্টু ভুঁড়িটা এগিয়ে আসে। দেখে রাণীর মনে হয়—ভাত। থালার ওপরে গোল ক'রে, উঁচু করে সাজানো ভাত। হঠাৎ খানিকটা অবসাদ কাটে। একটু আশা হয়।

বল্ল, "ঠাকুর মশাই গো! বড় খিদে। ছেলেটা খিদেয় কালই মরে যাবে। দুটীখানি চাল কি দেবেন না? আপনার বাড়ীতে দাসীর কাজ করব। দুটী চাল দেন ঠাকুর।"

ঠাকুর হো হো করে হেসে বল্লেন, "চাল কি অত সস্তা নাকি রে! তাহলে তো গাঁ শুদ্ধু মেয়েকে দাসী রাখা যায়!"

রাণীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। একেবারে দাওয়া থেকে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে। পিঠটা যে একেবারে খালি, ডান দিকের বুকের কাপড়টা যে অর্দ্ধেক খুলে গেল তা খেয়ালও করে না। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বার বার বলে, "দুটী চাল দাও ঠাকুর।"

মেয়ে মানুষের দেহ। হাঁটু গেড়ে পায়ে মাথা ঠেকাতে গিয়ে আধখানা ধনুকের মত বেঁকে পড়েছে। অন্ধকারের আবছায়ায় বাঁড়ুয্যের চোখে আরও লোভ জাগায়।

"আরে কি করিস, কি করিস" বলতে বলতে বাঁড়ুয্যে ঠাকুর ওর দুই গালে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরেন। তার পরে একটু মোলায়েম সুরে বলেন, "ছাড় ছাড়, উঠে বস।" বলে ওর বগলের নীচে চেপে ধরে আস্তে আস্তে উঠিয়ে বসিয়ে দেন। বেশ একটু সময় লাগে।

রাণীর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে, নিজের মাথাটা নামিয়ে নীচু সুরে বাঁড়ুয্যে বল্লেন, "চাল যে নিবি তার দাম দিতে পারবি? দাসীগিরিতে চালের দাম হয় না, বুঝলি।"

তারপর প্রায় ওর কানের কাছে আরও ফিস ফিস ক'রে বাঁড়ুয্যে বল্লেন, "চাল যদি চাস তো রাত দশটা এগারোটার সময় আমার ঘরে আসিস। ওই পেছন দিকে গিয়ে আমার বৈঠকখানা ঘরের পেছনের দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিবি। খুব সাবধানে, কেউ যেন টের না পায়। বুঝলি?" বলে ওর গালটা একবার হঠাৎ টিপে দিয়ে বাঁড়ুয্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান। দূর থেকে আর একবার বলেন, "বুঝেছিস তো?"

রাণী বোঝে। মাথার মধ্যে আবার যেন জোনাকি পোকার মেলা। জ্বলছে, নিভছে। একটু পরে ঘরের ভেতর উঠে গিয়ে খোকাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঠ হয়ে বসে থাকে।

বাঁড়ুয্যের ওখান থেকে রাণী যখন ফিরল তখন গভীর রাত। বাঁড়ুয্যে বলেছিলেন, "একেবারে ভোরে গেলেই হত। গাঁয়ে তো লোক নেই বল্লেই হয়, কে আর দেখবে?" তা রাণী শোনেনি।

ঘরে একটু চাঁদের আলো। ছেলেটা এক পাশ হয়ে ঘুমচ্ছে। হয়তো কতবার চেঁচিয়েছে। কত কেঁদেছে। গাল দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, তার দাগ এখনো শুকোয়নি।

রাণীর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। মাগো, যদি কোনো রকমে শেয়াল ঢুকত। ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে প্রায়-শুকনো মেইটা মুখে গুঁজে দেয়। আস্তে আস্তে বার বার বলে, "ধন আমার, যাদু আমার, মাণিক আমার।"

তিন

চাল যখন সোণা, আর সেই চালের বদলেই মেয়ে মানুষ, তখন একটার সখ আর কদিন ভাল লাগে!

বাঁড়ুয্যের সখও কদিনেই মিটল। রাণীকে বলে দিলেন, "আর আসিসনে। আমি আর চাল দিতে পারব না।"

তবু রাণী রাত্তিরে যায়। দরজায় টোকা মারে, শেষ পর্য্যন্ত ধাক্কাও দেয়। বাঁড়ুয্যের সাড়া নেই।

কতটুকুই বা চাল পেত! ছেলেকে নিয়ে দুজনের এক বেলাও ভর পেট হয় না। তবু তাই স্বগ্‌গ। তার জন্যে সব খোয়াতে পারে।

রাণী বাঁড়ুয্যের জন্যে ওৎ পেতে থাকে। পথে পেলেই বলে, "দোহাই ঠাকুর, দুটী চাল দাও। একেবারে পথে ফেলে দিও না।"

অনেক দিনের আধপেটা খাওয়ায় দেহের লাবণ্য একেবারে শুকিয়ে গেছে। বাঁড়ুয্যে অবাক হয়ে নিজের মনের ভাবেন, এই কুচ্ছিতটাকে কি

ক'রে ভাল লেগেছিল! চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করে হাঁকেন, "দূর হ মাগী নচ্ছার কোথাকার। তোদের মত আঁটকুড়ীর জন্য লোকে চাল নিয়ে বসে আছে। বেরো বলছি মাগী, বেরো—নইলে পুলিশ ধরিয়ে দেব।"

...তারপর? তারপর এ হাত সে হাত। কোথাও এক রাত্তিরের বদলে এক মুঠো খেতে পেল। আবার সাতদিন হয়তো পেল না।

মানুষ শুকিয়ে জানোয়ার।

আর ভাবে না। মাথায় কোনো চিন্তা ঢোকে না। শুধু ভাত·· ফেন··· কি খাব?

ঘর নয়, এখন পথে পথে। দিনে রাতে সাতটা গাঁ পাক দিয়ে আসে। হন্যে কুকুরের মত। যদি কেউ দুটী ভাত ফেলে দেয়, একটু ফেন দেয়।

মিঠাইয়ের দোকানের সামনে শুয়ে শুয়ে জুল জুল করে চেয়ে থাকে। শুধু দেখে। চাইবারও সাহস হয় না।

ছেলেটা ধুঁকছে। মাগো, জ্যান্ত ছেলের গায়ে এত হাড় থাকে তা কে জানত! শুয়ে থাকলে মনে হয় অনেকদিন আগে মরে গেছে। কবর খুঁড়ে কে যেন তুলে রেখে গেছে।

কিন্তু খায়। এখন আর দাঁড়াতে পারে না। তবু বসে বসে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাতের কাছে যা পায় মুখে তোলে।

ঐ শুটকো-হাড় ছেলেটাকে ধরেই চড়াচ্চড় চড়ায়। মনে হয়—কি কড়া জান, মরেও না!

...সেদিন সকালে মোক্ষদা পিসীর দুয়োরে এসে রাণী নাছোড়বান্দা। পিসী গো, একটু ফেন দেও। তরকারীর খোসাগুলো দেও। যা হোক কিছু দেও। কদিন এক দানাও পেটে পড়েনি।

"কিচ্ছু নেই রে, কিচ্ছু নেই। ফেন গেলে ভাত খাওয়ার দিন কবে ফুরিয়েছে।"

কিছুতেই এড়াতে না পেরে ছোট্ট এক মুঠো ছোলা এনে ছেলেটার হাতে দেন। ওমা, কি ছেলেরে বাবা! সবগুলো অম্‌নি তখুনি এক গব্বায় মুখে পুরে দিল।

রাণীর চোখে জল আসে। একটা ছোলাও খেতে দিল না। ভয়ানক রাগ হয়। ধপ ক'রে ছেলেটাকে মাটিতে বসিয়ে দেয়। মুখের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে দু একটা ছোলা বার করবার চেষ্টা করে।

ছেলেটা গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কাঁদে না। দাঁতে দাঁত দিয়ে ছোলা আটকে রাখে। জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

পিসী বল্লেন, "তা মৌ-গেরামে যাস না কেন? সেখেনে তো শুনিছি এখন নঙ্গর খুলেছে। মিনি পয়সায় এক বেলা খিচুড়ি খেতে দেয়।"

আগ্রহে রাণী বলে, 'সত্যি? কোন্ দিকে মৌ-গেরাম? বল না, এক্ষুনি যাব!"

"অনেকটা দূর বটে। পাঁচ সাতখান গাঁ পেরিয়ে। তা এখন গেলে বেলায় বেলায় পৌঁছতে পারবি।" পিসী তাকে মৌ-গ্রামের পথ বলে দিলেন।

ছেলেটার ওপর রাগ পড়ে না। ওকে ফেলে থুয়েই চলে যায়। অনেকটা দূর গিয়ে আবার মন কেমন করে। ফিরে এসে হ্যাঁচকা দিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয়। ফের চলে।

ঘুরে ঘুরে, লোকের কাছে পথ জিগ্যেস ক'রে যখন মৌগ্রামের লঙ্গরখানায় পৌঁছল তখন বেলা তিনটে চারটে হবে। পথের লোকগুলো কি মাগো! একটা ডবল পয়সাও কেউ ভিক্ষে দিল না।

লঙ্গরখানার সামনে কি ভিড়। চারিদিক থেকে অনাহারী মানুষ এসে জুটেছে। পুরুষ, মেয়ে, বাচ্চা-কাচ্চা।

কিন্তু কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আজ নাকি সরকার থেকে চাল আসেনি, তাই আজ লঙ্গর বন্ধ।

উঃ কি যন্ত্রণা! এত পথ হেঁটে এত আশা করে এসে শুধু ফিরে যেতে হবে। কাঙ্গালীরা বলে, "মিথ্যে কথা। চাল নেই তা কখনো হতে পারে না। আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে।" নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে।

কিন্তু কেউ সামনে যায় না। সেখেনে সেপাইরা পাহারা দিচ্ছে। গোঁফওলা, জোয়ান সেপাই। পুরু মুখ দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

রাণী চেয়ে থাকে। ওদের চেহারা দেখে দেখে মনে হয়—ডাল আর রুটী। পুরু, মোটা মোটা রুটী। অনেক রুটী, গোছা গোছা রুটী। আর ডাল। যত ইচ্ছে খাও।

ওরা পুরুষদের ধাক্কা মেরে হঠিয়ে দেয়। মেয়েদের আর একটু আস্তে। বলে 'হট যা এই মাগী।' মাঝে মাঝে চোখও মারে।

...নিরাশ ধুঁকতে ধুঁকতে আবার ফেরা। এবার আর পা চলতে চায় না। কেনই বা চলা? কোথায়ই বা যাওয়া?

খানিকটা দূর গিয়ে একটা পোড়ো বাড়ীর রকের ওপরে ছেলেটাকে বসিয়ে নিজেও বসল। উঃ পেটের কি জ্বালা। মাথা পর্য্যন্ত ঝিম ঝিম করে। একবার গড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে যেন জ্বালা আরও বাড়ে। আবার উঠে কুঁকড়ি শুঁকড়ি হয়ে বসল।

মনে আর কিছু আসে না। শুধু ভাবে—ভাত...রুটী...ডাল...ছোলা...

ছেলেটা রকের ওপর শুয়ে শুয়েই হাগল। ফিন্‌কি দিয়ে পাতলা জলের মত দাস্ত। অনেকটা দূর পর্য্যন্ত গড়িয়ে যায়। তার মধ্যে ছোলা—আস্ত আস্ত। ঠিক যেমন খেয়েছিল তেমন। দু একটা আধখানা হয়ে গেছে। নইলে খোসা শুদ্ধু ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে।

আস্ত ছোলা...খাবার জিনিষ...।কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে রাণী যেন ভূতে-পাওয়ার মত কতক্ষণ সেই দিকে চেয়ে চেয়ে বসে থাকে। তারপরে উঠল। সামনের ডোবা থেকে আঁচলা করে জল নিয়ে এল। আস্তে আস্তে গু ধুয়ে ছোলাগুলো আলাদা করল। আস্তে আস্তে সেগুলো আবার ধুলো। অতি যত্নে, যেন খুব দামী জিনিষ।

তারপরে একটা একটা করে খুঁটে খুঁটে খেল। একটা করে নেয়, কতক্ষণ ধরে দেখে, তারপর মুখে ফেলে আস্তে আস্তে সারা মুখময় ছড়িয়ে চিবোয়। যতক্ষণ একটা না একেবারে শেষ ততক্ষণ আর একটা হাতে তোলে না।

খেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল। পেটের ভেতর জ্বালা তো কমল না!

ছেলেটা আবার হাগল। কিন্তু এবার আর ছোলা নেই, শুধু জল আর সামান্য একটু ছিবড়ে। উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে রাণী দেখছে। কিন্তু নড়ছে না।

কতক্ষণ পরে আবার। ফিনকি দিয়ে শুধু জল। রাণী তাও উঠল না। ছেলেটাকে ধুইয়েও দিল না। ছেলেটার হাড়ের ওপর শুধু চামড়া, তাও যেন যন্ত্রণায় একটু কুঁচকে আসে। রাণী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যের অন্ধকার নামে। শীত করে। মাথায় ঘোরে ভাত···রুটী···ডাল···ছোলা···

পথ দিয়ে যেতে যেতে সেপাইটা ওদের সামনে থেমে ডাকল, "এই মাগী, রুটি লিবি ?" এদেশে থেকে থেকে সেপাই বাংলা শিখেছে।

রাণী ধড়মড় করে উঠে বসে। "কই গো, কোথায় গো, দাও দাও।"

"আরে এখানে নাই। হামার সঙ্গে আয়। রুটী মিলবে।"

ছেলেটা বোধ হয় এর মধ্যে আর একবার দাস্ত করেছে। সেই আ-ধোয়া ছেলেকেই কোনো রকমে হেঁচকে টেনে নিয়ে রাণী সেপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটল।

অঘ্রাণের সন্ধ্যে। বেশ শীত শীত করে। সেপাইয়ের গায়ে ভারী গরম ওভার কোট।

ঝোপের মধ্যে সেপাইই ওদের টেনে আনল। তারপর জাপটে জড়িয়ে ধরল। বল্ল "রোটী দেগা, পয়সা দেগা, লেকিন পরে।"

রাণী ছেলেটাকে মাটির ওপর শুইয়ে দিল। তারপর নিজে থেকেই তার পাশে শুয়ে পড়ল। পিঠে ঠাণ্ডা লাগে। ঝোপের মাথা দিয়ে আকাশ দেখা যায়।

গরম কোটটা খুলে ফেলে রাণীকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে সেপাই আবার বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে, "দূর মাগী, তোর লড়কাটার মু দেখলে সব খুশী দূরে যায়।"

ব্যস্ত হয়ে রাণী চিত হয়ে শুয়ে শুয়েই হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে সেপাইয়ের কোটটা কোনো রকমে তুলে আন্দাজে আন্দাজে ছেলেটার মুখের ওপর চাপা দিয়ে দিল। উঃ কি ভারী, তোলাই যায় না।

মনে ভাবে···ভাত, রুটী, ভাত, পয়সা। ভয়ানক লাগে। সেপাইয়ের বুকের নীচে দম আটকে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে।

···সেপাই উঠে দাঁড়িয়ে যখন আবার কোট পরছে তখন যেন ওঠাই যায় না। মাথা ঝিম ঝিম করে। বুকটা যেন গুঁড়িয়ে গিয়েছে।

পাশ ফিরে খোকার গায় হাত দেয়। একেবারে ঠাণ্ডা, হিম। ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে দুবার নাড়া দেয়। সাড়া নেই। চোখটা উল্টে গেছে। মরবার সময় ওর পিসতুত ভাইয়ের চোখটা যেমন উল্টে গিয়েছিল। আকুল হয়ে উঠে ছেলেটার দেহ কোলের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে।

সামনের দিকে নজর যায়। আরে, কোট পরে সেপাই যে চলে যাচ্ছে। রুটী তো দিল না! পয়সাও না। ছেলের দেহ মাটিতে ফেলে দিয়ে রাণী ছুটল। সেপাইয়ের পিছু পিছু।

সোমনাথ লাহিড়ী

বাংলার আধুনিক সংস্কৃতি ও ধনিক-বৃত্তি

প্রবন্ধ-শীর্ষ হ'তে এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে আমরা মার্ক্স প্রচারিত দ্বান্দ্বিক জড়বাদী। মার্ক্সীয় দার্শনিক জড়বাদ আমরা গ্রহণ না করলেও মার্ক্স যে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধনিকবৃত্তির প্রভাব প্রতিপন্ন করেছেন তার সমাজতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম এ কথা আমরা বিশেষ করে মানি। কাজেই বাংলার আধুনিক সংস্কৃতির স্বরূপ-নির্ণয়ে ধনিক-বৃত্তির পটভূমি দাঁড় করাচ্চি ব'লে আমাদের সম্বন্ধে শুদ্ধ এতটুকুই ধরে নেওয়া ন্যায্য হ'বে, যে জাতীয় সংস্কৃতি-গঠনে আমরা আর্থিক পরিবেশের প্রগাঢ় মূল্য আছে বলে স্বীকার করি এবং এ-ও স্বীকার করি যে কোন সামাজিক সমষ্টির সাধারণ সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপকে সন্ধান করতে হ'বে তার আর্থিক ও অন্যান্য পরিবেশ প্রভাবের মধ্যে। এই সব প্রাথমিক ব্যাপারে ভ্রান্তি-সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই কৈফিয়ৎ দিয়ে মুখ-বন্ধ করলাম ?

ধনিকবৃত্তির ইতিহাসে এর অভিব্যক্তির একটা. ক্রম-পর্যায়ের ধারা আছে। ধনিক বৃত্তি কোনও সমাজে প্রবর্ত্তন হয় ব্যক্তি-মালিকী রূপে—শিল্প বা ব্যবসায়-যন্ত্র গড়ে ওঠে ষোল আনা ব্যক্তি-বিশেষের মালিকীর উপর। এই স্তরে শিল্প বা ব্যবসায়ের আকার বা আয়তন বৃহৎ হয় না কিংবা বৃহৎ হ'লেও তা থাকে সম্পূর্ণ মালিক-সর্ব্বস্ব—এ যেন শিল্প-প্রতিষ্ঠার যুগে নূতন ধাঁচের জমিদারী-বনিয়াদ। তারপর আসে শিল্পোন্নতির স্তরে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠান-গঠনী ও অর্থ-নিয়োগী ধনিকবৃত্তি। শিল্প যন্ত্র যখন মালিক-সর্ব্বস্বতা হ'তে বিমুক্ত হ'য়ে প্রতিষ্ঠানের ভূমিতে এসে দাঁড়ায়, তখন তার জীবন-মৃত্যু আর মালিক-বিশেষের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিষ্ঠা-ঔদাসীন্যের উপর নির্ভর করে না, সমগ্র প্রচেষ্টাটীই তখন একটী যান্ত্রিক আকার ধারণ করে। মূলধন তখন যৌথ সংজ্ঞায় উন্নীত হয়—ব্যক্তিবিশেষের অংশীদারী যত বড়ই হৌক তা'তে এসে যায় না। এই প্রতিষ্ঠান-ধর্ম্মী স্তরের পর যে শিল্প-প্রচেষ্টার স্তর আছে তা'কে বলা চলে অর্থ-নিয়োগী। এই যুগে সমাজে কতিপয় ধন-কুবেরের আবির্ভাব হয় যাঁরা দেশের সমগ্র শিল্প প্রচেষ্টার উপরই আপনাদের মূলধন বিনিয়োগ করেন। উঁহারা সাক্ষাৎভাবে শিল্প প্রচেষ্টার সহিত লিপ্ত থাকেন

না, তবে দেশের ও অনুন্নত বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বিরাটাকার যে সব প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাদের প্রায় সকলটার পশ্চাতে থাকে এঁদের ধনবল। ধনিক-বৃত্তির এই হয় চরম অভিব্যক্তি—বলা হয়েছে যে যুক্ত রাজ্যের (U. S. A.) সমগ্র আর্থিক প্রচেষ্টার ভার বহন করে আছেন ৪২টী ধন-কুবের বা বাসুকী পরিবার।

বাংলা দেশে ধনিক-বৃত্তির স্বরূপ বুঝতে হ'লে প্রথমত লক্ষ্য করতে হবে যে এখানে শিল্প-প্রচেষ্টার আকার অতি সঙ্কীর্ণ এবং এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মূলধনে যতটা প্রচেষ্টা এ যাবৎ হ'য়ে এসেছে তা' সম্পূর্ণই হয়েছে মালিকী ভাবে। বাংলার সমাজে যৌথ মূলধনের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়-গড়ে উঠে নাই, তার কারণ ধনিকবৃত্তির সাধারণ নিয়ম অনুসারে মালিকী বৃত্তির যতখানি প্রসার হ'লে প্রতিষ্ঠান-মূলক বৃহত্তর প্রচেষ্টার জন্ম হ'তে পারে তা' এখানে হয়; ফলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সমবায় (co-operative) মূলধনের সহিত যৌথ মূলধনের পার্থক্য বুঝেন নি। কাজেই বিগত চল্লিশ বৎসরে বাংলার মাটীতে যে সহস্র সহস্র যৌথ আয়োজন অকালেই কালের তরণীতে তাদের ভ্রষ্ট চেষ্টাকে বোঝাই দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে তা'তে বিস্মিত হ'বার কিছুই নেই। আর এক কথা —বাংলা দেশে যে যৌথ প্রতিষ্ঠান দানা বাঁধতে পারে নি, শুধু তা'ই নয়, বিদেশী মূলধনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান আয়োজনের প্রতিযোগিতায় এখানকার মালিকী প্রচেষ্টাও বহুল পরিমাণে ব্যাহত হ'য়েছে। গৌরী সেন, অক্রুর দত্ত ও রামদুলাল সরকার এখন কিংবদন্তীতে পরিণত হ'য়েছে। রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ রায় ও প্রাণকিষণ লাহা, এঁদের মালিকী প্রচেষ্টার ক্ষীণালোকও আজ কোন নবীন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর প্রাণে উৎসাহের দীপ জ্বেলে দিচ্ছে না। উনিশ শতকের আশির কোঠায় মুকুন্দ লাইক ও যাদব বাঁড়ুয্যে, গোপাল ঘোষ ও দীননাথ দত্ত, যথাক্রমে কয়লার খনি ও চা-বাগান ব্যবসায়ের অগ্রণী হ'য়েছিলেন; দুঃখের ব্যাপার যে ঐ ঐ ব্যবসায়ে আজ অগ্রগতির পতাকা বাঙ্গালীর হাত থেকে খসে পড়েছে। বাঙ্গালীর মালিকী-ভাবে শিল্প-আয়োজন ব্যর্থ না হ'লেও আজকের দিনের উত্তর প্রসারের অনুপাতে অনেকখানি যে খর্ব্ব হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

তবে কি বল্‌তে হবে যে বাংলা দেশে ধনিকবৃত্তির প্রবর্ত্তন হয় নি? এক হিসাবে বল্‌তে গেলে হয় নি-ই বটে। বাংলা দেশে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জমিদারী ব্যবস্থার উপর। এই কর্ণওয়ালিসী ব্যবস্থা ঠিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, যেমন অনেকে মনে করেন। এর প্রকৃত আর্থিক রূপ ধনিক অথচ এই ধনিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছিল কোন শ্রেণী-বিশেষের মূলধনে নয়, ষোল আনা সরকারী ফতুয়াতে। কিন্তু মুস্কিল এই যে কোম্পানীর হুকুমে ধনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'লেও এই ধনিক-শ্রেণীকে রক্ষা করা যায় না—কেন না ভূমিজাত যে সম্পদ তার উৎপাদনে শ্রম-সম্পদের যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে তা নেই, ফলে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট কর্ণওয়ালিসের ধনিক সম্প্রদায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্পষ্টভাবে না হৌক অস্পষ্ট ভাবে ক্ষয়-চিহ্নিত হ'য়ে দেখা দিল। প্রায় ঐ সময়েই "বেঙ্গল কেমিক্যালে"র প্রবর্ত্তন ও লাইক-বাঁড়ুয্যের ঝরিয়ার খনিতে কুটী-সংস্থাপন।

ভূমি-কেন্দ্র ধনিক-বৃত্তির পরমায়ুর ক্ষীণতা যাই হৌক না কেন, ফলে বাংলা দেশে কিন্তু প্রবর্ত্তন হ'ল এক ধনিক-সেবী নিম্ন মধ্যবৃত্তি শ্রেণীর এবং তার সঙ্গে যোগ হ'ল ধনিক ইংরাজ সরকারের চাকুরী-জীবী সম্প্রদায়ের। ফলে কালের দিগন্তে যখন নূতন শতাব্দীর অরুণোদয় হ'ল তখন দেখা গেল যে ভূমি-নিষ্ঠ ধনিক-দিকপালেরা আর আকাশে নেই—বাংলা দেশের শহর গঞ্জ পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে এক বিরাট নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বলা বাহুল্য যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধনিক সমাজেরই অংশ—সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির দিক থেকে। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে বাংলার আর্থিক প্রচেষ্টায় ধনিক-বৃত্তি দানা বাঁধতে পারে নি বটে, তবে রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে বাংলা দেশে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হ'য়েছে তাঁদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টি ধনীর না হ'লেও সম্পূর্ণভাবেই ধনিক। এই ধনিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য দুইটী—এক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (individualism), দ্বিতীয় ধী-সর্ব্বস্বতা (intellectualism) অনেকে হয়ত বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করবেন যে এর ভিতর বাংলা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কোথায়, সমগ্র আধুনিক সভ্য জগতের সংস্কৃতিক রূপই কি এই দু'টি লক্ষণে চিহ্নিত নয়? জবাব এই যে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশের সম্বন্ধে এই বর্ণনা সত্য হ'লেও ভারতের সকল প্রাদেশিক সংস্কৃতির আধুনিক রূপ সম্বন্ধে তা খাটে

না। ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই বিশ শতকের গোড়াতে অত বড় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না যার উদ্ভব হ'য়েছিল বাংলা দেশেতে, এবং আজও বাংলার হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে-প্রভাব তার তুলনা অন্য কোন প্রদেশে নেই। তাই বল্‌ছিলাম যে আধুনিক বাংলা সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ধনিক—সামন্তবাদের ব্যক্তি-খর্ব্বতা ও আচার-আদর্শকে পঙ্গু করেই এর যথার্থ রূপায়ন।

এই ধনিক সংস্কৃতির কাছে আধুনিক বাঙালীর মন একদিনে কিংবা বিনা যুদ্ধে আত্মদান করে নি। সামন্তবাদী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধী-সত্যের জয়-বার্ত্তা এনেছিলেন আধুনিক বাংলায় সর্ব্বপ্রথম রাজা রামমোহন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি রাজার সেই বার্ত্তা ইন্‌সিণ্ডিয়ারি বোমার মত বাংলার মনঃশীল সমাজে আগুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। তারই ফলে হ'ল সামলিয়ে নেবার চেষ্টা—দেশী ভাবে বিদেশী ধর্ম্ম-আন্দোলন যার নাম হ'ল ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, বিদেশীভাবে দেশী নর-নারায়ণের পূজা যার নাম হ'ল প্রত্যক্ষবাদ (বা positivism) এবং পরে যা বেলুড়ে রূপান্তরিত হ'ল সেবা-ধর্ম্মে। এই প্রসঙ্গে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হ'ল বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত হিন্দু সংরক্ষণ আন্দোলন—কেননা আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি-গঠনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ধী-সত্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিম-সাহিত্যের মত আর অত তীব্র প্রচার আর কোথায়ও নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যে আদর্শবাদ এক কথায় তাহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কার-বিমুক্ত মনঃশীলতার বিরুদ্ধে চরম প্রচার ভিন্ন কিছুই নয়—গড় মান্দারণের পথে অশ্বারোহণ ক'রে বঙ্কিম-নায়ক কেবল ঝড়-ঝাপটাই খেয়েছে, গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসী হ'তে হল, প্রতাপের মৃত্যু ছাড়া অন্য গতি সম্ভবপর হ'ল না, শ্রীর জীবনে অন্ততঃ ভ্রাতৃহত্যার কারণ হয়েও জ্যোতিষার্থকে সার্থক হ'বার অবকাশ দিতে হ'ল। এই সবেতে গোঁজা-মিল কিছুই নেই—এই সবই হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত জীবন-দৃষ্টি। এই দৃষ্টি আধুনিক বাঙ্গালী গ্রহণ করে নি এবং করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষকের সর্ব্বনাশ উপলব্ধি করেও জমিদারী বন্দোবস্তকে বাংলার বৈষয়িক বনিয়াদরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ-ঐরাবত ধনিক সংস্কৃতির বেনো জলের স্রোত-ধারা রোধ করতেও একেবারেই অসমর্থ হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্র হ'লেন আধুনিক বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে বড় ট্র্যাজেডি।

আধুনিক বাংলা সংস্কৃতি সর্ব্বপ্রথম স্বরূপ লাভ করেছে রবীন্দ্র সাহিত্য ও সাধনায়। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের কোন ঐরাবতী প্রচেষ্টা ছিল না, তিনি পদ্মার চরে চরে নিঃসঙ্গ স্বপ্নে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু ধনিক সংস্কৃতিরূপ পদ্মার খরস্রোতের ধারা ফেরাবার কোন চেষ্টা করেন নি। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মনঃশীলতা ধনিক সংস্কৃতির প্রধান লক্ষণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের তা-ই প্রধান উৎস ও নির্য্যাস। একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ যে প্রকাশ-ধর্ম্মী সৌন্দর্য্যবাদ রচনায় প্রচার ও জীবনে সার্থক করে গেছেন তার তুলনা বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে কোথায় নেই, কিন্তু তা' হলেও এ অস্বীকার চলে না যে রবীন্দ্র-সাধনার বিস্ময়কর পরিণতি সম্পূর্ণই ধনিক-সংস্কৃতির সংজ্ঞার মধ্যেই আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-ধর্ম্ম বিচার-আশ্রয়ী, তা মনঃশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে নি; তাঁহার ব্যক্তি-ধর্ম্ম সম্পূর্ণই ব্যক্তিত্ববাদী, তা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করা দূরে থাক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে আধ্যাত্মিক মর্ম্মে গরীয়ান ও অর্থবান করেছে। বাংলার ঐতিহাসিক সংস্কৃতি-ধারায় যে অন্তঃসলিলা মানবিকতা, রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি তাকে উদ্ধার করে তারই উপর আধুনিক বাংলার সংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ধনিক-বৃত্তিকে ভর্ৎসনা করেছেন, প্রাচীন সমাজের মঙ্গলবুদ্ধিকে ব্যবসায়ী জীবনের প্রতিযোগীতার উপরে স্থান দিয়েছেন, তা হ'লেও কবি-প্রচারিত যে অধ্যাত্মধর্ম্মী প্রকাশবাদ তা' সম্পূর্ণই ধনিক। এইখানে বিশেষভাবে বক্তব্য যে রবীন্দ্র-সাধনায় যে আদর্শবাদ ও আভিজাত্য আছে তা ষোল আনা রবীন্দ্রনাথের নিজের, তাঁর প্রচারিত ব্যক্তি-ধর্ম্মের এরা অবিচ্ছেদ অংশ নহে। সাংস্কৃতিক বিশ্লেষকের চোখ দিয়ে দেখলে "চোখের বালি" থেকে "গৃহ-দাহ," "ঘরে বাইরে" "থেকে আগুন নিয়ে খেলা," রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে "আধুনিক" সঙ্গীতের যে সৃষ্টি হ'বে তা'তে আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সংস্কৃতির বীজ সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যেই নিহিত ছিল। আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথই হ'লেন সব চাইতে বড় আইরনি।

বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী আজ বাংলার সংস্কৃতিকে ষোল আনা প্রভাবান্বিত করে চলেছে—এটা পরিতাপ বা ক্ষোভের ব্যাপার নয়, লক্ষ্যের ব্যাপার মাত্র।

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

স্বপ্নভঙ্গ

সাত সমুদ্দুর পারে রূপার কাঠির ছোঁয়ায়
একান্ত আমার অপেক্ষায়
সুন্দরী সে রাজকন্যা চাঁপার বরণ
ঘুমে অচেতন।
সোণার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে
একদিন সুপ্রভাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে
বরণ করে আনব ঘরে
বুড়ীকে মেরে মরণ কৌটা চুরি করে।

সত্যিকার সমুদ্র যাত্রায়
সবুজ শুকানো শীতে গাঢ় কুয়াসায়
চির চেনা পথ হোল ভুল
সব হারা অতল অকুল,
নেমে এল 'এনসেন্ট মারিনার'
জীবনে আমার।
গেল নিয়ে
কত ভয় আশঙ্কায় ভাসিয়ে।
পুরাণো পিপাসা আছে
আর সীমাহীন জল আছে কাছে
জল জল শুধু নোনা জল
ছাতি ফাটা পিপাসায় নেই তার এক ফোটা ফল
মৃত্যু শুধু মৃত্যু আছে চারি পাশে পড়ি
আর আমি রোজ রোজ মরি।

গেরুয়া

তোমাদের পৃথিবীর ব্যপ্ত আঙিনায়
অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা অনেক অন্যায়।
তোমাদের মন থেকে তাই করি ঘৃণাভয় ;
আর বার বার থেকে থেকে মনে হয়,
তোমাদের পৃথিবী থেকে দূরে কোথাও সরে পড়ি।
সেখানে একটা নিজের জন্যে মনের মতন পৃথিবী গড়ি।

এই ম্যাডেনিং ক্রাউড থেকে অনেক দূরে ;
কোনও একটা স্তব্ধ পাহাড়ের উপুরে ;
যেখানে উঁচু টিলা স্তব্ধ, স্থির—
আর মাচায় তোলা একটি ছোট্ট কুটীর ;
যেখানে ঝর্ণার স্বচ্ছ শব্দ কানে আসে ;
যেখানে অনন্ত ছবির রীল চারি পাশে ;
আর তারি ছোঁয়া যে আমায় ভালবাসে ;
আর মহুয়ার রসে যেথায় মাতাল মন ;
তেমনি পৃথিবীর মতন।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পুস্তক-পরিচয়

ভারতের সংস্কৃতি।—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত। বিশ্বভারতী। ৭৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আট আনা।

এই বইখানা বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। লেখক একজন খ্যাতনামা এবং প্রবীণ ব্যক্তি। ভারতের সাহিত্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং গভীর জ্ঞানের কথা অনেকেই জানেন। বিশেষতঃ মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের ধর্ম্ম-সাহিত্যের সহিত তাঁহার চেয়ে অধিক পরিচয় কম লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যাঁহারা এই বইখানি পড়িবেন তাঁহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারেই উহা পড়িবেন।

সংস্কৃতি কথাটার মানে লইয়া একেবারে মতভেদ নাই এমন নয়। এই লেখকের মতে "ইহলোক নিয়ে সাধনা হল সংস্কৃতি, অনন্তলোক নিয়ে সাধনা হল ধর্ম্ম।" (৪ পৃঃ) ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যেই অনেক যুগের অনেক মানবমণ্ডলীর নানা দান মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতির চেয়ে ধর্ম্মেই প্রবর্ত্তকদের পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। সেই জন্যেই বোধ হয় তিনি সংস্কৃতির আলোচনা করিতে গিয়াও ধর্ম্মের কথাই বেশী বলিয়াছেন। ধর্ম্মে এবং ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক আচারে এবং সাধারণ জীবনে বাহির হইতে যাহা আসিয়া মিশিয়াছে, পরিপূর্ণ না হইলেও তাহার একটা বিবরণও তিনি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নানা মানবমণ্ডলীর বিচিত্র দান লইয়া ভারতে যে এক বিচিত্র সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে পাইতেছি। আর্য্যদের বৈদিক ধর্ম্ম ও অনার্য্যদের বেদ-বাহ্য ধর্ম্ম ও আচারের যে 'যুক্ত-বেণি' বর্ত্তমান ভারতীয় মানব-সমাজে দেখা যায়, তাহারই বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয়। এই বিরাট সংস্কৃতির প্রধান উপাদান ভারতীয় হিন্দুদের সভ্যতা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে ; তারপর বাহির হইতে এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্য্য ও আগন্তুক মুসলমান প্রভৃতির দানও ইহাতে মিশিয়া ইহাকে বৃহত্তর করিয়াছে ; ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। আর কি ভাবে

কোথায় এই মিলন মিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহার মনোহারী ইতিবৃত্ত হইতেও আমরা বঞ্চিত হই নাই। এই বিবরণ খুব বিস্তৃত না হইলেও চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ।

বেদ-পন্থীরা প্রতিমা পূজা করিতেন না, সুতরাং আধুনিক প্রতিমা পূজা বেদ-বাহ্য। 'উপবাস ব্রত প্রভৃতিও বোধ হয় বেদ-বাহ্য' (৫২ পৃঃ)। 'শিব ছিলেন শূদ্রের দেবতা' (২০ পৃঃ) ; সুতরাং শিবপূজা তাহাও অবৈদিক। গুরুর প্রতি ভক্তি বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু 'এই গুরুভক্তিটিও খুব সম্ভব আর্য্যেতর স্থান হতেই আর্য্যরা পেয়েছেন' (৭২ পৃঃ)।

শুধু দেবতা ও গুরুভক্তি নয়, বাহির হইতে আমরা পান, তামাক, সুপারী, আফিম, গুলি, চরস, আলু, কপি, বিলেতি কুমড়ো প্রভৃতিও পাইয়াছি। আমের মত ফলও বেদে নাই ; কলাও বোধ হয় পরে পাওয়া। (৫১ পৃঃ) 'মাছ খাওয়াটাও প্রধানত অনার্য্যদের কাছে শেখা' (৯ পৃঃ)। নৃত্যগীতও বোধ হয় অনেকটা বাহির হইতেই আসিয়া মিশিয়াছে। 'রোগের দিক্ দিয়েও কলেরা পূর্ব্বদিক হতে গেল পাশ্চাত্য জগতে, উপদংশ বসন্ত প্রভৃতি রোগ এল সেখান থেকে এদেশে' (৫১ পৃঃ)। 'কাজেই পরস্পরের মিলনে ভালমন্দ নানা জিনিসেরই লেন-দেন ঘটেছে' (৫১ পৃঃ)।

কিন্তু এই যে আদান-প্রদান, ইহার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি একটা উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে। সে কখনও পরকে লুপ্ত করিয়া নিজেকে প্রধান করিয়া তুলিতে চাহে নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা যেখানে গিয়াছে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করিয়া সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিলাণ্ডে, এমন কি, আমেরিকায়ও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ; "এখানে হয়তো সেরকম করে অন্যদের উচ্ছেদ করা সম্ভবও হয়নি, আর ভারতের ইতিহাস-বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়ও হয়তো অন্যরূপ" (৬ পৃঃ)। এই উদার মনোবৃত্তির ফলে আমাদের দেশে নানা জাতি নানা শ্রেণী নানা ভেদ-বিভেদ রয়েছে (৭ পৃঃ)। 'এগুলি সংস্কৃতির সহায়ক হলেও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে মহা সমস্যা হয়েছে' (৭ পৃঃ)। কিন্তু আমাদের মহাপুরুষেরা এই ভেদ-বিভেদের বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্যেও প্রীতির ও মহত্ত্বের যোগ-সেতু রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইটাই ভারতীয় সংস্কৃতির একটা পরম

বৈশিষ্ট্য (৭ পৃঃ)। "নানা সংস্কৃতির মিলনে হিন্দু সংস্কৃতি গড়ে ওঠায় তার মধ্যে গতিশীলতার প্রতি একটি শ্রদ্ধা ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখি ইন্দ্রের সার কথা, এগিয়ে চল। মধ্যযুগেও সার কথা, এগিয়ে চল। অগ্রসর-না-হবার-মত শিক্ষা আমরা আজকাল ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যেই বেশি দেখি—ইংরাজী সভ্যতা আসলে স্থিতিশীল বা কন্‌সার্ভেটিভ্" (৭৪ পৃঃ)। হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের সার এইখানে যেভাবে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে লেখকের উদার দৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি দোষ ধরিতে চাহেন নাই ; যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ তাহাই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। "সূর্য্যবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণান্ গৃহ্নন্তি সুজনাঃ"—সজ্জনেরা দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। মাছি ব্রণ খুঁজে, আর মৌমাছি খুঁজে মধু। ক্ষিতিমোহনবাবুও আমাদের সভ্যতার দোষ না দেখাইয়া তাহার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যই আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। আর, তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি যেভাবে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিপুল অধ্যবসায়, গভীর জ্ঞান এবং বিস্তৃত অধ্যয়নের পরিচয়ও আমরা পাই। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং বিচার-নৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও দুই একটী বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ প্রকাশ করিবার দুঃসাহস আমরা না করিয়া পারিতেছি না। প্রথমেই একটা অবান্তর এবং গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বস্তুর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বিবাহের প্রকার ভেদ আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের গ্রন্থকার গান্ধর্ব্ব-বিবাহকেই প্রাচীনতম পদ্ধতি মনে করিয়াছেন (১৭ পৃঃ)। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে তিনি একটী যুক্তি এই দিয়াছেন যে, পাত্রকে 'বর' বলা হয় আর 'বর' অর্থ যাহাকে বরণ করা হয় এবং এই বরণ গান্ধর্ব্ব-বিবাহে কন্যা নিজে করে। যুক্তিটী স্পষ্ট নয়। স্বয়ম্বরে কন্যা স্বয়ং বরকে বরণ করিত ঠিক ; কিন্তু তাহা ত ঠিক গান্ধর্ব্ব বিবাহ ছিল না। আর, ব্রাহ্ম-প্রাজাপত্য বিবাহে—যে বিবাহ এখনও হিন্দু সমাজে চলে, তাহাতেও—বরকে বরণ করা হয় ; কিন্তু সে বরণ করে সম্প্রদাতা—যে কন্যাকে দান করিবে, সে। সুতরাং 'বর' কথাটার ব্যুৎপত্তি হইতে গান্ধর্ব্ব বিবাহকে আদিম প্রথা মনে করিবার কোন অর্থ হয় না।

তা ছাড়া, হিন্দুদের সমাজে এবং অন্যত্রও বিবাহের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হইবে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ আদিম নয়। বর-কন্যার মনের মিল ঘটাইতে হইলে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ ও মিলনের সুবিধা ঘটাইতে হয়। সভ্যতার একটা বিশিষ্ট স্তরে না পৌঁছাইলে উহা সম্ভব হয় না। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের মিলন তপোবনের অন্তরালে ঘটিয়াছিল। বর্ব্বর ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতিদের মধ্যে পরস্পরের পরিচয়ের আগেই বিবাহ হইয়া যায়। মহাভারতের যুগেই বা কি দেখি? ভীষ্ম তাঁর ভাইয়ের জন্য স্ত্রী আনিলেন, জোর করিয়া। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে 'হরণ' করিয়াছিলেন—নিজে বৃত হন নাই, স্ত্রীকে বরণও করেন নাই। দ্রৌপদীই কি পাণ্ডবদিগকে 'বরণ' করিয়াছিলেন? সীতার বিবাহেই বা কি ঘটিয়াছিল? সর্ব্বত্র, সব সময় না হোক, কোন কোন সময়ে এবং অনেক দেশেই যে বল-পূর্ব্বক স্ত্রী-সংগ্রহ শৌর্য্যের অঙ্গ ছিল, তাহাতে কি সন্দেহ করা চলে? যুদ্ধে লিপ্ত জাতি বা ব্যক্তিরা পরাজিতের রমণীদিগকে হরণ করাটা কি যুদ্ধজয়ের অঙ্গ মনে করিত না? সুতরাং মনে হয়, বলপূর্ব্বক স্ত্রী-গ্রহণই গান্ধর্ব্ব বিবাহের চেয়ে আদিম পদ্ধতি। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও ইহারই প্রচলন বেশী দেখা যায়।

তারপরে, আমাদের সভ্যতার ঔদার্য্যের কথা। বর্ত্তমানে যে একটা সহন-শীলতা আমাদের রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বরাবরই কি উহা ছিল? রেল-গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভিড়ের মধ্যে যে উঠিতে চায়, সে শত্রু: ভিতরের সকল লোক তাহাকে বাধা দেয়। কিন্তু একবার কোন প্রকারে উঠিয়া পড়িতে পারিলে, সে-ও দলে ভিড়িয়া যায়; এবং তারপর যে উঠিতে চায় তাকে বাধা দেওয়ার জন্য ভিতরের সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। ভারতেও এক সময়ে যারা বিবাদ করিত, তৃতীয় পক্ষের আঘাতে তারা এক হইয়া যাইতেছে। হিন্দুর সমাজেও যে যে সম্প্রদায় এক সময় পরস্পরের ছায়া মাড়াইত না, মুসলমান কিংবা এইরূপ কোন তৃতীয় সংস্কৃতির সহিত সঙ্ঘাতে তারা তাদের বিভেদ অনেক সময় ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা মক্ষিকার মত দোষ অন্বেষণ করিতে চাই না, ইতিহাসের রূঢ় সত্যই প্রকাশ করিতে চাই। যে উদার মনোবৃত্তির কথা ক্ষিতিমোহনবাবু বলিয়াছেন, সত্যই কি উহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল? এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের

চেষ্টা কি কখনও করে নাই? তার জন্য কি রক্তারক্তিও হয় নাই? কোন হিন্দু রাজা বৌদ্ধদের কিংবা বৌদ্ধ রাজা হিন্দুদের উপর কখনই কি কোন অত্যাচার করেন নাই? কোন কাপালিক কি আচার্য্য শঙ্করের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিতে চাহে নাই? এবং শঙ্কর-শিষ্যগণ কি সেই কাপালিকের শিরশ্ছেদ করে নাই? তথা-কথিত 'পাষণ্ড'দের প্রতি চৈতন্য এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের মনোভাবই বা কিরূপ ছিল? বিষ্ণু-পূজার শ্বেত-চন্দন এবং তুলসী পত্র পর্য্যন্ত কি শক্তি-পূজায় নিষিদ্ধ নয়? অতীত ভারতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে রেষারেষি হইয়াছে তাহা প্রমাণ করা মোটেই কঠিন নয়; পরস্পরের প্রতি অনুদার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রচুর রহিয়াছে। বেদের সেই 'অনার্য্য দস্যু'রা কোথায় গেল?

তারপর গুহক-মিত্র রামচন্দ্র এবং আভীর-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের কথা উঠিয়াছে (৭ পৃঃ)। গুহক চণ্ডালকে রামচন্দ্র কোল দিয়াছিলেন ঠিক; কিন্তু সে কখন? রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত, বনচারী রাম চণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন কিন্তু সেই রামই যখন আবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন কি শূদ্র তপস্বী শম্বুককে তিনি হত্যা করেন নাই? তারপর রামের বড় কীর্ত্তি রাবণ-বধ; সুতরাং তিনিও কি রণ-জয়ী বীর হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই? আর, শ্রীকৃষ্ণও বাল্যকালে হয়ত আভীরদের সঙ্গে খেলাধূলা করিতেন; কিন্তু কুরুক্ষেত্রেও কি তাঁর সেই রূপ আমরা পাই? সেখানে কি তিনি রাজচক্রবর্ত্তী-রূপে বংশীর বদলে সুদর্শন হাতে নেন নাই?

আর ইউরোপীয় সভ্যতা কি সব সময়ই পর-বিধ্বংসী? সেখানে কি কোন 'লেন-দেন' ঘটে নাই? বিজয়ী রোম গ্রীক্ সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়াছিল, না উহাকে আপন করিয়া লইয়াছিল? আবার রোম-বিজয়ী উত্তর ইউরোপের বর্ব্বর জাতিরা কি রোমের সভ্যতা এবং ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই? রোমের সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কি তারা রোমের সভ্যতাও ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল? ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও কি একটা বিরাট সংমিশ্রণ নয়? ইহুদীদের প্রদত্ত ধর্ম্ম, গ্রীসের কলা এবং রোমের আইন ও রাষ্ট্রনীতি মিলিয়াই কি উহাকে সৃষ্টি করে নাই?

ইউরোপে ও ভারতে উভয়ত্র এই মিলনের একটা বৈষম্য এই যে ইউরোপে মিলন কম-বেশী সম্পূর্ণ হইয়াছে, ভারতে তাহা হয় নাই, এবং সেই জন্যই ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অনৈক্য এত প্রকট; অথচ ইউরোপে তত নয়। ইউরোপেও যে বিরোধ ও মিলনাভাব নাই, এমন নয়; পোল্যাণ্ড ও বল্কান রাষ্ট্রসমূহই তাহার দৃষ্টান্ত। তথাপি সেখানকার ঐক্য হয়ত ভারতের চেয়ে বেশী।

ইউরোপের বাহিরেও পাশ্চাত্য সভ্যতা সব সময় অনগ্রসর স্থানীয় সভ্যতাকে উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে কিংবা পারিয়াছে, এমন নয়। ভারতে, চীনে, উত্তর আফ্রিকায় এইরূপ উচ্ছেদ সম্ভব হয় নাই, তেমন চেষ্টা হইয়াছে বলাও কঠিন। তবে পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির অনুকরণ দুই দিকেই হইয়া থাকিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আরও একটু অবিচার ক্ষিতিমোহন বাবু করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ এই যে গ্রীক প্রভৃতিদের মধ্যে গুরুরা বিদ্যা বেচতেন" (৭২ পৃঃ)। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গ্রীকদের মধ্যে সোক্রেতিসের পূর্ব্বে বিদ্যা বিক্রয়ের প্রথা ছিল না। সোক্রেতিস নিজেও অকাতরে বিনামূল্যে বিদ্যাদান করিয়াছেন। তাঁর সম-সাময়িক সোফিষ্টরা (Sophists) প্রথমে মূল্য লইয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তার পরেও বিনামূল্যে বিদ্যা-বিতরণের পদ্ধতি একেবারে লোপ পায় নাই। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান মঠ ও আশ্রম প্রভৃতিতে যে বিদ্যা বিতরিত হইত, তাহার জন্য প্রয়োজন হইত দীক্ষা, মূল্য নয়। বর্ত্তমানে ভারত অ-ভারত সর্ব্বত্রই বিদ্যা কোন না কোন প্রকারে বিক্রীতই হইতেছে। এখন আর কোন কুলপতি ছাত্রদের ভরণ-পোষণের সঙ্গে বিদ্যা দান করেন কিনা সন্দেহ।

বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ একটু স্থাবর হইয়া পড়িয়াছে, ইহার অগ্রগতি মন্দ, ইহাই ক্ষিতিমোহন বাবুর মত বলিয়া মনে হয় (৭৪ পৃঃ)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসায় তিনি বলিয়াছেন যে "শ্রীকৃষ্ণের" মতো স্বাধীনমতবাদী এখনকার দিনেও যথেষ্ট স্বাধীনমতবাদী রহিয়াছেন, বলিতে হইবে। বাস্তবিকই কিন্তু তাহাই। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ প্রভৃতির

কথা চিন্তা করিলে ইহাই কি মনে হয় না যে, শ্রীকৃষ্ণের চেয়েও স্বাধীন মত প্রকাশের চেষ্টা ইদানীন্তন কালে প্রচুর হইয়াছে?

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের যে মূর্ত্তিটী আমাদের চোখের সামনে ভাসে তাহা এই। বৈদিক ধর্ম্মের একটা ধারা ন্যূনাধিক অব্যাহত ভাবে ব্রাহ্মণ, সূত্র, স্মৃতি সংহিতার ভিতর দিয়া শূলপাণি, জীমূতবাহন, ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে সংস্কারের চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা তাহা করিয়াছেন এবং অনেক ব্রাহ্মণও তাহাতে যোগ দিয়াছেন। একাধিক মন্ত্রপূত চতুষ্পদ অশ্ব লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ হইত; আবার তাহারই সঙ্গে—'উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্য্যশ্চক্ষু ধাতঃ প্রাণো…' ইত্যাদি বলিয়া অশ্বমেধের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও হইত। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—১।১।১)। কিন্তু মূল ধর্ম্ম বৃক্ষ এই সংস্কারের চেষ্টাকে অনেক সময়ই বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, টানিয়া আপন করিয়া লয় নাই; তার ফলে, সংস্কর্ত্তারা পৃথক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইয়া পড়িয়াছেন এবং ধর্ম্মের শত্রু বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এই ভাবেই সংস্কর্ত্তা বুদ্ধ বেদ-বিদ্বেষী পাষণ্ড আখ্যা লাভ করিয়াছেন। আর, এই জন্যেই দয়ানন্দ আর্য্য সমাজ এবং রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; হিন্দু সমাজ যেখানে ছিল সেই খানেই রহিয়া গিয়াছে। এখনও সনাতন-পন্থীরা প্রবল শক্তিতে সনাতন পন্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন; আর এখনও বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার উগ্র আড়ম্বর দেখা যাইতেছে। গান্ধির অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আন্দোলনের বিরুদ্ধেই কি কম শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে?

মধ্যযুগে মুসলমানধর্ম্মের এবং মুসলমান সমাজের সহিত সংস্পর্শে আনিয়া হিন্দু সমাজ নিজেকে সংস্কৃত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টাকে ক্ষিতিমোহন বাবু বড়লোকের বাড়ির তোলা জিনিস বাহির করার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। "বড় লোকের বাড়ীতে অনেক পুরাতন বহুমূল্য জিনিস যত্নে তোলা থাকে। অতিথি বিশেষের আগমনে সেগুলিকে সকলের সামনে বের করা হয়।" সেইরূপ মুসলমান-সাধনার আগমনের ফলে ভারতে প্রাচীন আদর্শ সব নূতন করিয়া লোকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়—নূতন করিয়া সেগুলির প্রচার করা হয় (৩৬ পৃঃ)। কিন্তু সেটা কি সত্যই পুরাতন আদর্শের

নূতন প্রচার, না নূতন করিয়া আত্ম-রক্ষার চেষ্টা? একেশ্বরবাদী, বর্ণভেদ বিহীন, অস্পৃশ্যতা শূন্য মুসলমান সমাজের নিজেকে আবার বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন হইয়াছিল; এবং ইহার মৃদু ও কঠোর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষারও প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সময়েই কবীর, নানক প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। একটা সংস্কৃত হিন্দু ধর্ম্ম এবং সংস্কৃত হিন্দু সমাজ গড়িয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মূল সমাজের সংস্কার সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি? সকল সংস্কর্তারাই ত শেষ পর্য্যন্ত সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া রহিলেন। যাহারা হয়ত অন্যথা হিন্দু-সমাজের বাহিরে চলিয়া যাইত, তাহারা কবিরপন্থী নানক-পন্থী প্রভৃতি হইয়া বিবদমান দুই সমাজের মধ্যস্থলে জায়গা লইল। একদিকে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের ধারা অক্ষুণ্ণ চলিয়াছে, অপর দিকে তাহার সহিত সমান্তরাল ভাবে একটা সংস্কারের স্রোতও উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। উভয়ের পরিপূর্ণ মিলন, সম্পূর্ণ সমন্বয় এখনও সংস্কারকদের বাঞ্ছিত বস্তু হইয়াই রহিয়াছে।

সাম্য, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী ভারতে বহু উচ্চারিত হইয়াছে, একথা কেহ অস্বীকার করিবে না। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার বাণীও উচ্চারিত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমানে হয়ত উহাই বেশী উচ্চারিত হয়। কিন্তু সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও স্বাধীনতার কথা ভারতের বাইরে কি কেহ শোনে নাই? যীশুর বাণী ত অবহেলার জিনিষ নয়। ফরাসী বিপ্লবের রুশ-বিপ্লবের রক্তস্রোতের মধ্যেও ত সাম্য-মৈত্রীর কথাই বড় ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজ এবং তাহার বাহিরে বৃহত্তর মানব সমাজ তাহার কতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? এই খানেই সভ্যতার ব্যর্থতা আসিয়াছে। গীর্জ্জায় রবি-বাসরে সমবেত জনতা ত্যাগ, তিতিক্ষা ও প্রেমের বাণী শুনিয়া নিয়া সপ্তাহের আর ছয় দিন অস্ত্রের কারখানায় গুলি বারুদ কামান বন্দুক বোমা নির্ম্মাণ করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিফলতা এইখানে। আর আমাদেরই বা কি? যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ মহাবীর হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি পর্য্যন্ত অমৃতের বাণী ত আমাদিগকে কম শোনান হয় নাই। কিন্তু সমাজ আমাদের যেমনটী হওয়া উচিৎ তেমনটী হয় নাই। ভবিষ্যৎ সাধক ও কর্ম্মীদের জন্য বিরাট, অকর্ষিত ক্ষেত্র এখনও পড়িয়া রহিয়াছে।

নিজেদের অতীতকে অত্যধিক প্রশংসা করার বিপদ্ এই যে তাহাতে অতিরিক্ত আত্মতৃপ্তি ও আত্ম-প্রত্যয় উৎপন্ন হয়; এবং আদর্শ সংস্কারের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে উহা নানা বাধা সৃষ্টি করে। সেই জন্যই অতীতের প্রাপ্য প্রশংসা তাহাকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ত্রুটী ও অসঙ্গতির কথাও মনে করা হয়ত ভাল। এইখানেই ক্ষিতিমোহন বাবুর সঙ্গে বোধ হয় আমাদের প্রভেদ। দোষান্বেষণের জন্যই আমরা দোষ খুঁজিতে যাই না; কিন্তু দোষ বাদ দিয়া দেখারও পক্ষপাতী আমরা নই। বস্তুটীর সম্পূর্ণ উপলব্ধির জন্য তাহার দোষ ও গুণ, সার্থকতা ও ব্যর্থতা উভয়ই দেখা দরকার।

ক্ষিতিমোহন বাবুর বেলায়ও আমরা তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদের কথা সেই জন্যেই উত্থাপিত করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বইখানার প্রচুর প্রশংসাও না করিয়া পারিতেছি না। বইখানা পড়িতে ভাল লাগে, উহাতে অনেক শিখিবার ও জানিবার আছে; এবং ভারতীয় সংস্কৃতির যে সংহত মূর্ত্তি তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় মাত্রেই তৃপ্তি ও গৌরব অনুভব করিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ—শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০।

বিজ্ঞানের আজ দুটি দিক,—ব্যবহারিক আর জ্ঞানের দিক। এর জ্ঞানের দিকটা জনসাধারণের তেমন জানা নেই বললেই চলে। তারই খানিক এই পুস্তিকাটিতে পরিবেশিত হয়েছে, যথাসম্ভব সহজ, আড়ম্বর বিহীন ভাষায়।

বিজ্ঞানের সৌধ রচনায় প্রমাণটাই হল বড় বনেদ। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ, তাদের সংযোজনের ফলে গড়ে ওঠে বিজ্ঞানের সূত্র। তারা আবার উত্তরকালে বিবিধ পর্য্যবেক্ষণের ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। তবে কি কেবল যুক্তিই বিজ্ঞানের সার কথা? না, বিজ্ঞানে বিশ্বাসেরও স্থান আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার গোড়াতেই রয়েছে এ বিশ্বাস,—বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের একানুবর্ত্তিতায় বিশ্বাস। এসব কথা পুস্তিকাটিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর

বিশ্বজগতের যা আদিতম উপাদান, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির কথা সহজ করে, সাধারণের সুপাঠ্য করে লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বিজ্ঞানের জ্ঞানের দুটি ধারা,—আমাদের সুখ সুবিধার জন্যে বিজ্ঞানের সূত্রের প্রয়োগ করা আর জাগতিক শৃঙ্খলা ও নিয়ম আবিষ্কার করে, সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটিত করা। দ্বিতীয়টির অনুসন্ধানই হল মানুষের অন্তর ধর্ম্ম,—যা' মানুষকে চালিত করে সত্যের পথে। এ অনুসন্ধান কেবল দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গীভূত নয়, আধুনিক বিজ্ঞানও ক্রমে দর্শনের চরম উত্তরের দিকেই অগ্রসর হয়ে গেছে। আইনষ্টাইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অমর গবেষণা ক্রমশঃ দর্শনবাদের কথা শোনাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের এ হল সূক্ষ্মতম গবেষণা। এর কথা বুঝতে হলে, বিজ্ঞানের, বিশেষ করে গ্রহ, নক্ষত্র আর অন্যান্য পদার্থের নিয়মের একানুবর্ত্তিতার কথা জানতে হবে। এ সকল উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত পরিচ্ছেদগুলিতে সন্নিবেশিত আছে।

লেখক ভূমিকায় বলেছেন, ভাষা আর প্রকাশের জন্যে তিনি 'বিশ্বপরিচয়ে'র পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। তা'তে তাঁর রচনা মনোজ্ঞ ও সরস হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে ক্রিয়াকে বাক্যের মাঝখানে বারবার দিয়ে কোন কোন অংশ শ্রুতিভার হয়ে উঠেছে। বইটিতে আনুপূর্ব্বিক আধুনিক বানান ব্যবহার করলেও, দু' এক জায়গায় বানানের প্রাচীনতা রয়ে গেছে। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এসব সামান্য ত্রুটি সংশোধিত হয়ে যাবে।

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ কারণে এবার "লক্ষ্মীছাড়ী" (উপন্যাস) প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে "লক্ষ্মীছাড়ী" নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

১৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৫০

পরিচয়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপসংহার

ভারতীয় সমাজের উৎপত্তি এবং উহার ক্রমবিবর্ত্তন ও বিকাশের যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান ও অনুসরণ করিতে গিয়া দেখা গেল যে, ভারত অতিপ্রাচীন দেশ; বোধ হয় বর্ত্তমান জগতের জাতি নিচয়ের মধ্যে ভারতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতি। তাহাদের কৃষ্টিও অতিপ্রাচীন; ইহার উত্থান ও পতন কয়েকবার হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শারীরিক-নরতাত্ত্বিক হিসাব অনুযায়ী ভারতে নানা মূলজাতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু একটা বিশিষ্ট প্রকারের শারীরিক লক্ষণযুক্ত মূলজাতির সমকৃষ্টি ও সমভাষাগত একটা জাতিতাত্ত্বিক জাতির (Ethnic Unit) উদ্ভব হয় না। এক-কৃষ্টিগত জাতির মধ্যে নানা প্রকারের শারীরিক লক্ষ্মণের লোক থাকে, সেইজন্য একটা বিশিষ্ট কৃষ্টির সহিত একটা মূলজাতিকে সনাক্ত করা যায় না।

বর্ত্তমানের বিজ্ঞানের সংবাদ এই যে, ভারতের কৃষ্টির আদিযুগ পুরাতন প্রস্তরযুগ (Palaeolithic age) হইতে ধরা যায়। দক্ষিণ ও মধ্যভারতের (১) শিলাগাত্রে যেসব আদিমজাতীয় আলেখ্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সহিত আফ্রিকা ও স্পেনের আদিমজাতীয় আলেখ্যের সাদৃশ্য আছে

১। J. A. Soc. Lii (1883), P. 50 ff; J. R. A. S. 1899, P. 95 ff; J. B. O. R. S. IV. 1918, P 298.

বলিয়া কথিত হয়। এইজন্য অনুমিত হয় যে, একই প্রকারের জাতি দ্বারা এই সকল ছবি প্রস্তরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। এই জাতিকে পণ্ডিতেরা Brown Race, অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরীয় জাতি (Mediterranean Race) আখ্যা প্রদান করেন (২)।

ভারতের সভ্যতার মূল যে অতি প্রাচীনকালেই নিহিত (খৃঃ পূঃ ৫০০০—৪০০০ ?) ছিল তাহার অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রাচীন উত্তর ভারতের সহিত পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ-পারস্যের প্রাচীন এলাম ও সুমের-এর মধ্য দিয়া এশিয়া মাইনরের হেতিতদের দেশ পর্য্যন্ত ভারতীয়-বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল *। তৎপর সিন্ধু-উপত্যকায় সভ্যতার নিদর্শন সমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই তথ্য নিশ্চিত ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। গর্ডন চাইল্ড বলেন, খৃঃ পূঃ ৪০০০ সালের শেষে মহেন-জো-দাড়োর বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা গ্রীসদেশের আথেন্সের পেরিক্লিয়যুগের সভ্যতা বা ইওরোপের মধ্যযুগের সভ্যতার সহিত সমানভাবে তুলনা চলিতে পারে (৩)। এই স্বীকারোক্তির মূল্য অতি মহার্ঘ্য, কারণ পেরিক্লিয়যুগে গ্রীসের কলাবিদ্যার কৃষ্টি উহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল।

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার সহিত ঐতিহাসিক বৈদিকযুগের সভ্যতার সম্বন্ধ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। মার্শাল বলেন, ইহা বৈদিকযুগের পূর্ব্বতর সভ্যতা, বৈদিক-আর্য্যদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এইস্থলে আবিষ্কৃত নর-কঙ্কালসমূহ মধ্যে "আর্য্য" জাতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অবশ্য গৌণভাবে "নতি, নেতি" পদ্ধতি দ্বারা "আর্য্য" অর্থে তিনি প্যান্-জার্ম্মানীয়

২। V. G. Childe—"The Most Ancient East", Pp. 37-39.

* সুইডেনের প্রত্নতত্ত্বের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক Montelius ১৯২০ খৃঃ লেখককে এই তথ্য প্রদান করেন। এলামের রাজধানী সুসার Ceramic art-এর সহিত ভারতীয় Artএর তিনি সাদৃশ্য দেখান। তাঁহার Kultur des Ostens নামক পুস্তকে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহকারে তিনি এই সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই পুস্তক সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের পুস্তকে এই তথ্য লিপিবদ্ধ আছে।

৩। V. G. Childe—op. cit. P. 221.

'নিডিক' জাতি বুঝিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, মার্শাল স্বয়ং স্বীকারই করিয়াছেন যে সিন্ধু-সভ্যতার বেশীর ভাগ প্রতীকই বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এমতাবস্থায় বৈদিক কৌমদের খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতকে ভারতের আবির্ভাবের তারিখ নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক। এই বিষয়ে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে। ইহাদের আবির্ভাবকাল তিলক খৃঃ পূঃ ৬০০০ শতক, অধ্যাপক য়াকোবি খৃঃ পূঃ ৪৫০০ শতক, ভিন্টারনিজ খৃঃ পূঃ ৪০০০—৩০০০ শতক বলিয়া বলেন। তিনি আরও বলেন যে, এই তারিখ কেহই নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না (৪)। বস্তুতঃ সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতার স্তরের যুগের সহিত ঋক্‌বেদের সভ্যতার স্তরের সময়ের অত্যাশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। লেখক বলেন, উভয়েই Chalolithic age (তাম্রযুগ), অর্থাৎ নব-প্রস্তর ও লৌহযুগের মধ্যবর্ত্তীকালের সভ্যতার চিহ্ন বহন করে। আরও দেখা যায়, উভয় সভ্যতার শব-সৎকার করিবার রীতি একই প্রকারের। অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে দগ্ধ-অস্থি কলসীতে (urn) ভরিয়া মাটিতে প্রোথিত ও সমাহিত করিবার নির্দ্দেশ আছে (৪।৪।১—৪।৫।১০)। আবার সিন্ধু-সভ্যতার মৃৎশিল্পের (pottery) চিত্রের সহিত সুমার, এলাম, ঈজিপ্তএর পার্থক্যও আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় (৫)। পুনঃ মহেন-জো-দাড়োতে প্রাপ্ত করাত ও তীরের ফলা (parabolic saw and the spearhead with undeveloped mid-rib) (৬) সুমের-এ আবিষ্কৃত হয় নাই, এইজন্য ইহাকে সুমেরএর সভ্যতার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যায় না।

পুনরায় হারাপ্পায় কতকগুলি পৌরাণিক (mythological) চিত্র অঙ্কিত আছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, এই সকল চিত্রে মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবনের ঘটনা অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্রে উৎক্রান্তি বা বৈতরণী গরু (যাহা মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে দান করা হয়) এবং যমের দুইটি কুক্কুর (ঋক ১০।১৬।১০-১২)

৪। Winternitz, "Geschichte der indischen Literatur." Pp 249-250.

৫। K. N. Dikshit, "Prehistoric Civilisation of the Indus-Valley", Pp. 50-51.

৬। Swami Sankarananda, "Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus", P 94.

চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় (৭)। এই বিষয়ের রিপোর্টার বলিতেছেন, এই চিত্রের সহিত ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৪, ১৬ ও ১৮ সূক্ত সমূহের তথ্যের সহিত মিল (parallelism) মনে জাগিয়া উঠে। কিন্তু তিনি বলেন, এই তুলনা আর অগ্রসর করা যায় না; কারণ এই চিত্র আংশিকভাবে সমাধির (post-fractional burial) দ্রব্যে পাওয়া যায়, পূর্ণ দগ্ধ (cremation) সম্পর্কীয় নয়; আর বৈদিক-আর্য্য ও হারাপ্পার লোকদের সম্বন্ধ এখনও সঠিক সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। কিন্তু এতৎসম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র আলোচিত সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিক-সূক্তেই আংশিকভাবে সমাধির কথা উল্লিখিত আছে; আর গৃহ্যসূক্তেই কলসীতে আংশিক-দগ্ধ হাড় সমাহিত (fractional or partial burial in an urn) করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের বিষ্ণুপুরাণ ও অগ্নিপুরাণ পাঠে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে হিন্দুর শবকে সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ করিবার অনুজ্ঞা তাহাতে নাই। হারপ্পায় আবার কলসীতে পুরিয়া সমাহিত করা শিশুদের শব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রথাটি হিন্দুদের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। মধ্য-এশিয়ার আনাউ (Anau) নামক একটি স্থানের ৫০০০ বৎসরের পূর্ব্বেকার ভূগর্ভস্থিত স্তরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এবম্প্রকারেরই শিশুর কলসী-সমাধি আবিষ্কার করিয়াছেন (৮)। ক্রীট্ দ্বীপেও এই প্রকারের শিশুর সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রীসের এথেন্সেও এই প্রকারের আবিষ্কার লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ইহা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির প্রথার নিদর্শন, আবার হারাপ্পায় H৬৯৮নং চিহ্নিত স্থানটিতে একটি নরকঙ্কাল ও তাহার পার্শ্বস্থিত একটি রোমন্থনকারী পশুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সহিত ঋগ্বেদে (১০।১৬।৪) মৃতদেহ সংকারের সময়ে একটি ছাগল উৎসর্গ করিবার (অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চি। যাস্তে শিবাস্তু ন্যো জাতবেদ স্তাভি য হৈনং সুকৃতাম্ লোকম্"!) প্রথার সহিত মিল দেখা যায়। এই প্রকারে সিন্ধু উপত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সহিত বৈদিক প্রয়োগের অনেক মিল

৭। Excavation at Harappa, Ch. VI. Pp 207-209.

৮। Pumpelly, 'Explorations in Turkestan" (Carnegie Publications,

দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য অনুমিত হয়, সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় ভারতীয় আর্য্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল!

শেষে নর-করোটির কথাপ্রসঙ্গে মার্শাল বলিয়াছেন, সিন্ধু-উপত্যকায় আর্য্যজাতির করোটি প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু "আর্য্য" বলিয়া জগতে কোন জাতি ছিল না বা এখনও নাই। "আর্য্য" শব্দটি ভাষা অর্থে প্রয়োগ হয়। বৈদিক আর্য্যদের শারীরিক লক্ষণ কি ছিল, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। ইউরোপের প্রত্যেক জাতি (nation) নিজেদের খাঁটি এবং আসল আর্য্য বলিয়া জাহির করেন। জার্ম্মানেরা একটা নর্ডিক জাতির কল্পনা করিয়া বলেন যে, তাহারাই আসল আর্য্য এবং জার্ম্মানী বা উত্তর ইওরোপ তাহাদের আদিস্থল ছিল। এই জাতিকে তাঁহারা লম্বা-মাথা সরুনাক দীর্ঘাকার নীলচক্ষু কটাচুল বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন এবং এই শ্রেষ্ঠমানব (Herren voelk) জাতির পদচিহ্ন তাঁহারা বেদের ভারত পর্য্যন্ত অনুসরণ করেন! কিন্তু বেশীরভাগ জার্ম্মানগণ এই জাতায় নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পর (৯) ফ্রান্সের Solutre নামক স্থানে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের ভূগর্ভস্থিত একটি স্তরে গোলাকৃতি করোটি আবিষ্কৃত হয়। এই সময়েই জার্ম্মাণীর Ofnet নামক যায়গায় মৃত্তিকার উপরোক্ত স্তরে (Azilian Epoch) একই স্থানে যুগপৎ লম্বাকৃতি ও গোলাকৃতির করোটি আবিষ্কৃত হয়। এতদ্বারা পূর্ব্বেকার নর্ডিক মতবাদ পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য হয়। এখন নীলচক্ষু, কটাচুল বিশিষ্ট উত্তর-ইউরোপের জার্ম্মানভাষী মানবই নর্ডিক ও আর্য্য বলিয়া রাজনীতিক ঢক্কানিনাদ করা হয়। আর একদল নরতাত্ত্বিক এসিয়াস্থিত সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের কোন এক যায়গায় Proto Nordic (নর্ডিক-পূর্ব্ব) জাতির উৎপত্তির কল্পনা করিতেছেন (১০)। কিন্তু তাহাতেও আর্য্য-জাতির উৎপত্তি সম্পর্কীয় রাজনীতিক বিবাদ মিটে নাই। অন্যপক্ষে হালের

No. 73).

৯। "L' Anthropologie", XXXV, P 189; Keith—Antiquity of Man, P 139 ff, 91.

১০। E. Eickstedt, "Rassen Kunde und Rassen geschichte der Menschheit', P 263 f.

ইংরেজ ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, 'নর্ডিক' নামে একটা মূল-জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব (১১)।

এই কথা এস্থলে এই কারণে উল্লিখিত হইল যে, ভারতীয় বিজ্ঞানে এই সাম্রাজ্যবাদীয় মতটি প্রবিষ্ট করান হইতেছে। সিন্ধু-সভ্যতায় যদি নর্ডিকের অস্তিত্বের অভাব বেদে উহার নিদর্শন খুঁজিবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা অনেকদিন হইতে হইতেছে। যদি ভারতের ইতিহাসে তাহার অভাব হয় তাহা হইলে হিন্দুকুশ পর্ব্বতস্থিত কাফির প্রভৃতি জাতির মধ্যে যে ব্লণ্ড (নীলচক্ষু ও কটাচুল বিশিষ্ট) লোকের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহারাই নাকি বৈদিক আর্য্য-সম্পর্কিত জাতি! মহেন-জো দাড়োর শেষের দিকের আবিষ্কৃত দ্রব্যসমূহ মধ্যে লম্বামাথা, লম্বামুখাকৃতি ও উচ্চ-নাসিকাবিশিষ্ট নরকরোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে (১২), আবার গোল-মাথা, উচ্চ বা সরু নাসাবিশিষ্ট করোটি পূর্ব্বেই সিন্ধু-উপত্যায় পাওয়া গিয়াছে। মহেন-জো-দাড়োর নরতাত্ত্বিক পরীক্ষক ডাঃ গুহ বলিতেছেন "ইহা সম্ভব যে বড় মাথা বিশিষ্ট মূলজাতির একটি অংশ (constituent) এবং ভারতে যাহার আবির্ভাব আর্য্যগণের আগমনকালের সহিত মিলে (whose advent in India appears to synchronise with the Aryan invasion) (১৩)।

অবশেষে ভারতে আর্য্য অভিযানের সমকালীন লম্বামাথাবিশিষ্ট জাতির সংবাদ জানা গেল। কিন্তু মেগালিথ-কৃষ্টি সম্পর্কীয় যে-জাতির অস্তিত্ব মহেন-জো-দাড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা যে ইউরোপীয় বা আর্য্যভাষীয় তাহার প্রমাণ কি? ফরাসী নরতাত্ত্বিক Letourneau এবং ইংরেজ বৈজ্ঞানিক Elliot Smith ইহাকে আফ্রিকাজাত বলেন। শেষোক্তজন বলেন, মেগালিথ-কৃষ্টির লোকেরা আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-পারস্য দিয়া সিন্ধু-উপত্যকায় আসিয়া উপনীত হয়, আর অপর একটি শাখা পারস্য হইতে মধ্য-এশিয়া হইয়া উত্তর-ভারতে আগমন করেন। মেগালিথ-কৃষ্টির এই লোকদের 'আর্য্য' বা 'নর্ডিক' বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। তৎপর উত্তর-পশ্চিমের পার্ব্বত্য জাতিদের ভারতীয় আর্য্যগণ ঘৃণা করিয়াই আসিয়াছেন; তাঁহাদের ভাষাকে 'পৈশাচিক'

১১। Huxley, Haddon, Carr-Sounders. "We Europeans", P 118.
১২। Dr. Guha, "Further Excavations at Mahenjo-daro"
১৩। Guha—Census of India 1931, Ethnographical, Pp LXIX—LXXI

আখ্যা দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা 'পিশাচ' আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছেন। মনু আবার তাঁহাদিগকে "ব্রাত্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্বারা বোধগম্য হয় যে, তাহারা হিন্দু-কৃষ্টির বাহিরের লোক ছিল। পুনঃ একাদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ঐতিহাসিক আল-বেরুণী বলিয়াছেন যে, পশ্চিমের পাহাড়ে যে-সকল জাতি বাস করে তাহারা ভারতীয় জাতি বা ভারত-সম্পর্কীয় জাতি। তাহারা অতি বর্ব্বর। এই জাতিকে বেদে আনয়ন করিয়া ভারতে নর্ডিকত্বের একটা সুরাহা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতীয় আর্য্যদের প্রতি সুবিচার হয় না। আর এই জাতি যে প্রাচীনকাল হইতেই ঐ অঞ্চলে বসবাস করিতেছে তাহারই বা প্রমাণ কি? ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারীদের মতে অনেক মধ্য-এশিয়ার জাতি মুসলমান আক্রমণের সময়ে পামীর পার্ব্বত্যাঞ্চলে পলায়ন করে। গালচা বা কাফিরেরা তাহার প্রমাণ। শক এবং কুইসাংরা এই অঞ্চলে বাস করিত, বালতি (Greek-Balatai) জাতি তাহাদের বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়। পক্ষপাতশূন্য পণ্ডিতেরা 'আর্য্য' বলিলে একটা মূলজাতি বুঝেন না, 'আর্য্য' একটা জাতিতাত্ত্বিক-কৃষ্টিগত-সমবায়-সঞ্জাত লোকসমষ্টি মাত্র।

ইওরোপের প্রত্যেকদেশের স্বজাতিপ্রেমিক পণ্ডিতেরা নিজজাতিকে 'আর্য্য' বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কাহার মতে, 'আর্য্য' লম্বামথা বিশিষ্ট ভূমধ্য-সাগরীয় জাতি, কাহারও মতে 'আর্য্য' গোলমাথা সরুনাক বিশিষ্ট আল্‌পিন্ বা আরমেনেইড্ জাতি, আবার কাহারও মতে 'আর্য্য' ব্লণ্ডজাতীয় উত্তর ইউরোপীয় জাতি। এতদ্বারা প্রতীত হয় যে, এই বিষয়ে প্রত্যেকেই একটি করিয়া মত মাত্র উত্থাপন করিয়াছেন (It is a matter of opinion only). বর্ত্তমানে সভিয়েট রুশের পণ্ডিতগণ জার্ম্মাণ মত খণ্ডন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শিলালিপি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যে, এসিয়া মাইনরের ইউফ্রেটিশ নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্ত্তী স্থানে "মিটানী" নামক একটা জাতির বাস ছিল। তাঁহাদের দেবতাদের নাম ছিল বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয় এবং তাহাদের Numerals ছিল সংস্কৃত ভাষানুযায়ী (১৪)। উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার

১৪। Forrel—Acht Sprache der Boghaz—Keni Inscriften; Otto Winckler-এর রিপোর্ট এবং the Indian Gods of the Mitanni'— Publications of the Christiania India Institute. No. I দ্রষ্টব্য।

পর পণ্ডিত মহলে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। কেহ বলিলেন, তাহারা ভারতীয় বৈদিক জাতির শাখা, কেহ বলিলেন, তাহারা ইউরোপীয় ব্লণ্ড-নর্ডিক যাহারা ককেসাস পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া ভারত অভিমুখে অভিযানের পথে উক্ত স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন (Indians on their way to India) (১৫)। সভিয়েট রুশ বৈজ্ঞানিকেরা ককেশাস ও এশিয়ায় প্রাপ্ত খৃঃ পূঃ ৪০০০—৩০০০ বৎসর পূর্ব্বের প্রত্নতাত্ত্বিক ও খোদিত-লিপি (inscriptions) সমূহ পাঠ করিয়া এই সকল ভিন্ন প্রকারের তথ্যাবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। রুশ-এর Academy of Sciencesএর অন্তর্ভুক্ত Institute of Orientalogyর সভ্য Academician V. V. Struve তথাকথিত "Aryan" জাতিসমূহ ও নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে নূতন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কল্পিত 'আর্য্য' জাতি যাহা উত্তর ইউরোপে উদ্ভূত বলিয়া জার্ম্মান স্বজাতিপ্রেমিকেরা দাবী করেন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা পরীক্ষিত ও বিশ্লেষিত হইলে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অলীক রচনা বলিয়া প্রমাণিত হয় (are an invention from beginning to end) (১৬)। ষ্ট্রুভে বলেন, একটি ক্ষুদ্রজাতি খৃঃ পূঃ ৩০০০—২০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান আরমেনিয়ার নিকট বাস করিত। তাহাদের নামের মূল "আর" শব্দ 'আরমেনিয়া ; 'আরারাট পর্ব্বত', 'আরমাভির' নগর প্রভৃতিতে আজও রক্ষিত হইতেছে। ইনি বলেন, আর্য্যগণ ককেশাস পর্ব্বতের দক্ষিণে উদ্ভূত হয় ; তাঁহারা 'ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতি ছিল না, ইহারাও 'জাফেতিক' ভাষাভাষী ছিল, অর্থাৎ প্রাচীন জর্জ্জীয় এবং ককেশাস পর্ব্বতের অন্যান্য বর্ত্তমান জাতিসমূহের ভাষার অন্তর্গত ভাষা বলিত (Jaffetic group of Language).

রুশ-পণ্ডিতের ব্যাখ্যার নির্ভুলতা বৈজ্ঞানিক সমাজ বিচার করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, আর্য্যজাতির উৎপত্তি বিষয়ে নানামুনির নানা মত এবং তাহা স্বজাতিপ্রেমিকতার পক্ষপাতশূন্য নহে। সুতরাং প্যান-জার্ম্মানীয় মত দ্বারা ভারতীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে

১৫। Huesing, "Voelkerschichten in altem Iran", M. A. G. W. XLVI, P 210.

১৬। Moscow News, May 28, 1943.

কেন? ইহা সত্য যে ভারতীয় বিজ্ঞানেও শ্রেণী-লক্ষণ (class character) বিরাজমান। এদেশে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ, দেশী বনিয়াদী স্বার্থ ও ব্রাহ্মণ্য-বাদের বনিয়াদী স্বার্থ একত্রিত হওয়ার ফলেই ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যায় বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়।

ইতিহাসের বিড়ম্বনা বিষয়ে ইংরেজ লেখক মুইর বলেন, জাতীয়তার ভাব-প্রণতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জার্ম্মান-পাণ্ডিত্য অন্যান্য জাতি অপেক্ষা টিউ-টনিক জাতির গৌরব প্রদর্শনের জন্য ইতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা করে। "This was the Doctrine of Racialism···England, not unflattered, in course of time adopted it and it still forms the implicit basis of much of our treatment of history ··Germanism by reaction, produced Slavism···a doctrine of Latinism also arose." ইহা হইতেছে জাতিত্ববাদে বিশ্বাস···ইংলণ্ড খোসামুদীর তোয়াজ পাইয়া কালক্রমে এই মতটি গ্রহণ করে এবং আজও ইহা আমাদের ইতিহাস আলোচনার অলঙ্ঘণীয় ভিত্তি হইয়া আছে···জার্ম্মানবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শ্লাভবাদের উদ্ভব হয়··· ল্যাটিনবাদও এইরূপে উত্থিত হয় (১৭)।" এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় সাহিত্যে আলোচনায় দেখা যায় যে জাতিত্ববাদের উদ্ভবের পর বিজ্ঞানও তদনুযায়ী বর্ণ ধারণ করিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক হইতে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ততঃ, ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীসের পেলাসগীয় ও হোমার বর্ণিত হেলেনে জাতিদের একই মূলজাতি বলা হইত। কিন্তু পরে তাহাদের দুইটি বিভিন্ন জাতি বলা হইতে থাকে, এবং হোমারের হেলেনেরাও নাকি উত্তর-ইওরোপের 'নর্ডিক' জাতির। তদ্রূপ রোমের অভিজাতগণ নাকি নর্ডিক জাতির, আর ইরানের হাকামিনি সম্রাটগণ ও বেদের আর্য্যগণও নাকি নর্ডিক জাতি। এই সময় হইতে আবার 'White-man's burden, Control of the Tropics, Whiteman's Superiority, 'Herren Volk' প্রভৃতির মত ক্রমাগত উত্থিত হইতে দেখা যায় ; আর প্রাচ্যদেশ সমূহের ইতিহাসের ব্যাখ্যাও তদনুযায়ী হইতে থাকে। পরাজিত শাসিত শ্রেণীর লোকেরা এবং অনভিজ্ঞগণও তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস

১৭। Ramsay Muir, "Nationalism and Internationalism", Pp 83-85.

করিতেন। এই সাম্রাজ্যবাদীয় মনোবৃত্তি ফেবিয়ান সোসালিষ্ট H. W. Wells-এর মধ্যেও দেখা যায়। তিনি জগতের ইতিহাসকে Race Struggle (জাতিগত সংগ্রাম) দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। এই প্রকারেই সিন্ধু-উপত্যকার ও বৈদিক কৌমগুলির পার্থক্যের কথা সরকারী লেখকদের কাছে শোনা যায়।

এখানে নির্ভয়ে বলিতে পারা যায় যে 'আর্য্য' বলিলে ভারতে নীলচক্ষু কটাচুল বিশিষ্ট লোক বুঝায় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার অর্থে 'মহৎ, শিক্ষিত, ভদ্র, প্রভৃতি লোক বা লোক-সমষ্টিকে বুঝাইত। বেদের টীকাকার মহীধর বলেন, বৈদিকসাহিত্যে 'বৈশ্য' অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইত,—'শূদ্ররারিয়াউ' (শূদ্র ও আর্য্য) শব্দই তাহার প্রমাণ।

কিন্তু বৌদ্ধদের কাছে ইহার ভিন্ন অর্থ ছিল। ভারহুতের বৌদ্ধ শিলা-লিপিতে 'ভদন্তস আয়া-ভূতরক্ষিত' শব্দ উৎকীর্ণ আছে। অধ্যাপক বড়ুয়া ইহার ব্যাখ্যাকালে বলেন, যেসব ভিক্ষুগণ 'আর্য্যত্ব'তে (Aryanhood) অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের সম্বোধনে 'আয়া" শব্দ ব্যবহৃত হইত। বৌদ্ধের নিকট যিনি ইন্দ্রিয়, আচার-ব্যবহার ও মতের গোঁড়ামী (dogmas) হইতে বিমুক্ত হইয়াছে তিনিই 'আর্য্য' (১৮)। ইহা দ্বারা এই শব্দের অর্থ কৃষ্টির ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নীত হইতে দেখা যায়। আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'আর্য্য'কে 'আর্য্যপ্রাণ' (১৩, ১৪১) বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। তিনি আরও বলেন, গোলামের ধন প্রবঞ্চনা করিয়া নিলে, কিম্বা 'আর্য্য' বলিয়া যেসব সুবিধা সে ভোগ করে তাহা বঞ্চনা করিয়া লইলে (আর্য্যভাব অপহরন্ত), কোন আর্য্যের জীবনকে গোলামীতে পরিণত করিলে এক্ষেত্রে জরিমানা রূপ শাস্তির অর্দ্ধেক (জরিমানা) হইবে (১৩।১৪২)। এখানে আবার 'আর্য্য' শব্দটির রাজনীতিক অর্থ পাওয়া যায়। মৌর্য্যযুগে 'আর্য্য' একজন স্বাধীন নাগরিক, এই তথ্য পাওয়া যায়।

এই সকল কারণে ভারতের ইতিহাসে 'আর্য্য' নামক একটা মূলজাতির অস্তিত্ব খোঁজা ও তাহার কীর্ত্তিকলাপ অনুসন্ধান বা সেই দৃষ্টিকোণ্ দ্বারা ভারতীয় কৃষ্টি ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আর্য্য ভাষাভাষী ভারতীয়দের কৃষ্টি ও তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করা চলিতে পারে।

১৮। B. M. Barua & G. Sinha—Barhut Inscriptions, P 6, 1926.

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন উত্তর-ভারতের সহিত পশ্চিম-এশিয়ার যোগাযোগ ছিল। লেখকের অনুমান, উত্তরে মধ্য এশিয়ার 'আনাউ', পূর্ব্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারত, পশ্চিমে এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত এসিয়ার মহাদেশটি এক কৃষ্টিচক্রের (one cultural complex) অন্তর্গত ছিল। এইজন্যই ভারতের জাতিতাত্ত্বিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও পৌরাণিক (mythological) অনেক অনুষ্ঠানের সহিত এই সকল দেশের প্রাচীন জাতিদের জনশ্রুতির সৌসাদৃশ্য আছে। হিন্দুর মহাপ্রলয়ের গল্পটির সহিত সেমিটিক গল্পের মিল রহিয়াছে। বেদের 'পণিস' জাতি পশ্চিম-এসিয়ার ফিনিসীয় জাতি সম্পর্কীয় হইতে পারে। সংস্কৃতে ওজন করিবার মান 'মণ' শব্দের সহিত ব্যাবিলনীয়, হেতিত, ইরানী ও গ্রীসের উক্ত প্রকারের কথার মিল আছে। এতদ্ব্যতীত সুমের আক্কাড ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহে প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয় (১৯)। পারস্যের আবেস্তার জনশ্রুতির সহিত বেদের অত্যাশ্চর্য্য মিল আছে। হিন্দুর আচারের অনেক অনুষ্ঠানের সহিত ভূমধ্য-সাগরীয় প্রাচীন জাতিদের অনেক বিষয়ের মিল আছে (২০)। পুনঃ ভারতীয় লিঙ্গপূজার (Phallic-worship) সহিত পশ্চিম-এসিয়ার এবম্প্রকারের পূজার মিল কেহ কেহ অনুমান করেন। বর্ত্তমানের বর্ণাশ্রমীয় মন্দিরের প্রতিমার পূজা-পদ্ধতির সহিত প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় পূজার অনুষ্ঠানের অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রতিমার সম্মুখে বাজনা বাজাইয়া পূজা করা, পশু বলি দেওয়া, হাঁটু গাড়িয়া জোড়হস্তে প্রতিমার সম্মুখে প্রার্থনা করা প্রভৃতি উক্ত দেশ সমূহের প্রাচীন প্রথা ছিল। এজন্যই আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারী গ্রীক্ পণ্ডিতগণ এদেশের দেবতাদের তাঁহাদের স্বদেশীয় বলিতেন। প্রার্থনা-পদ্ধতির সাদৃশ্যটি ম্যাগাস্থি-নিসের চক্ষে ধরা পড়ে। তিনি বলেন, লোকে দেবতার সম্মুখে যেভাবে প্রার্থনা করে, ভারতীয়েরা রাজার সম্মুখে সেই প্রকারে আবেদন জানায়। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ধর্ম্ম (২১), সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত ব্রাহ্মণ্য-

১৯। Ipsen, 'Sumero-akkadische Lehnorter in Indogermanische in Forschunger", XII P 417.

২০। B. N. Datta, Notions on Purification and Taboo in Society. Cal. Review, Oct, 1940.

২১। ব্যাবিলনীয় ধর্ম্ম বিষয়ে Jastrow এবং Kingএর পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বাদের অত্যাশ্চর্য্য মিল দেখা যায় ; এসব কারণে (২২) বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন জগতের ধর্ম্ম ও সামাজিক পদ্ধতি ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদে এখনও জীবিত রহিয়াছে। শেষে হিন্দুদের দ্বারা গরুকে দেবত্বে উন্নীত করা অহিন্দুদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুধর্ম্মের ইহা একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। কিন্তু গুপ্তযুগের পূর্ব্বে গো-হত্যা পাপ বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না, অথচ সেই সময় হইতে ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ রূপে মান্য হইতে থাকে। এতৎ প্রসঙ্গে ভারতের ধর্ম্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ হইতেছে এই যে, প্রাচীন মিশরীয় জাতির (২৩) মধ্যে গো-জাতীয় (heifer—গো-বৎস) অবধ্য ছিল ; এজন্য গরু অন্যান্য পশু অপেক্ষা সম্মাননা প্রাপ্ত জীব ছিল (Herodotus II, 41). মেসোপোটেমিয়ায় বলদ-পূজা (Steer-cult) ছিল (২৪)। সেখান হইতে এই পূজা-পদ্ধতি ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে বিস্তৃতিলাভ করে (২৫)। এই প্রকারের পূজার সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান যুগের গো-পূজার কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহাও জ্ঞাতব্য।

প্রাচীনকালের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান এখনও বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই ; যাহা হইয়াছে তাহাতে পুরাতন সংস্কার ও ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এজন্য পূর্ব্বে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বিশারদগণ বৈদিকযুগের প্রাচীন হিন্দুকৃষ্টির যে-ছক কাটিয়া গিয়াছেন তাহা এখন আর গ্রহণ করা চলে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২৩। J. G. Wilkinson—The Manners...Egyptians, Vol. III, Ch. IV. P. 44.

২৪। Childe—op. cit. P. 87 ff.

২৫। S. Feist—Kultur Ausbreiting und Herkunft der Indogermanen, P 41.

২২। ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্বের তুলনামূলক পাঠে ইহা সহজেই চক্ষে ধরা পড়ে। উত্তর-ভারতের পাঠান বাদশাহ সেরশাহের মহাভারত ও সাহনামা প্রভৃতি পাঠে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে প্রাচীন ভারত, ইরান ও আরবের এক ধর্ম্মই ছিল ; সেজন্য তাঁহার ভারতের একটি ইতিহাস লিখিবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল। হিন্দী মাসিক 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় বাদশাহের Private Secretary-র অপ্রকাশিত "রোজ নামচা" হইতে তাঁহার বংশধর সাসেরামী সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীছাড়ী

(১১)

দু'পক্ষ কবে কেটে গেচে। কৈ কোথাও কিছু নেই। চাঁপা ক্ষেপে উঠেচে। ছেলেপিলে দেখলে ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। ভাবে কাউকে ধরে বুকের ভেতর চেপে নেবে। কিন্তু ওরা যে ওর নিজের নয়, ঐটুকুনই ওকে দাবিয়ে রেখেচে।

রাখালী পুঁটু শশী যে দুর্গাকে মা বলে ডাকে, তাতেই চাঁপার বুকের ভেতর চনমন করে ওঠে। ততোই ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুর্গাকে তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করে, হ্যাঁ বৌ, তবে যে বোষ্টম দিদি বললে।

বৌ অন্য কাজের অছিলা করে নতুন কথা তোলে। সে সব কথা চাঁপার কানে পৌঁছোয় না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাগ্দীপাড়া থেকে একটা ছেলে চ্যাঁচাচ্চে শোনা গেল। —ওমা মাগো। সন্ধ্যের বাতাসে ডাকটা চাঁপার কাছে এসে পৌঁছেচে। চাঁপার কেবল কেবল মনে হতে লাগল, যাই না একবার।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দাবায় গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বৌ, যাব? ছেলেটা বড্ড ডাকচে।

বৌ বললে, কোথায় যাবে এই রাত্তিরে, ছোটগিন্নি। পরের ছেলে, তোমার কি বল!

চাঁপা ভাবলে, তাই ত, পরের ছেলে। কিন্তু ক্রমশঃই চাঁপা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ও আর অপেক্ষা করতে পারে না। একদিন দুপুরে একা একা গিয়ে হাজির বোষ্টুমির বাড়ি। বললে, কৈ বোষ্টম দিদি, তবে যে বললে দু'পক্ষ। শুক্লপক্ষ কেটে গিয়ে কবে কেষ্টপক্ষও শেষ হয়ে গেচে।

বোষ্টুমি বললে, ভগবানের হাত। আমরা কি করব বল। আমরা ত আজন্মকাল অবধি শুনে আসচি। তবে একথা মিথ্যে হবার নয়, এ তোমায় বলে দিলুম, চাঁপা ঠাকরুণ।

ক্রমে আরো দু'পক্ষ কেটে গেল। কোথায় বা কি! দুর্গা আড়ে আড়ে লক্ষ্য করে, চাঁপা যেন ছেলেগুলোর জন্যে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়।

শশী-রাখালী-পুঁটুকে চাঁপা যেন ঠিক আগের মতন নিতে পারে না। ও জেনেছে যে, ওরা ওর নিজের নয়। ওর মনে তাই একটা অশান্তি জেগেচে। কি করবে ভেবে পায় না। অস্থির হয়ে উঠেচে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ঘাটে কাপড় কাচতে গিয়ে চাঁপা ফিরে এল। একটু ইতস্তত করে শশীকে ডেকে নিয়ে গেল। এটা বৌয়ের নজর এড়াল না।

শশীকে কোলে করে চাঁপা ঘাটের ধাপের ওপর বসল। আগেকার মতন এখন শশীর আর অন্ধকারকে তত ভয় নেই। তাই চাঁপার বুক ঘেঁসে বসে বলল, কি দিদি ?

চাঁপা বলল, শশী, তুই লক্ষ্মীছেলে, নয় ?

শশী মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে মাথা নাড়লে।

চাঁপা হঠাৎ শশীকে বুকের ওপর চেপে নিয়ে ওর গালে একটা চুমু খেলে। বললে, তোকে কাল নারকেল নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মালপো গড়ে দেব।

শশী কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে চাঁপা বললে, শশী আমার লক্ষ্মীছেলে, সোনা-মাণিক। আচ্ছা শশী, শিগগীর বলদিকিনি—

চাঁপার গলা স্পষ্টই থরথর করে কেঁপে গেল। শশী যেন ভয় পাবার মত কি বুঝলে। তাই তাড়াতাড়ি বললে, কি ?

ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে চাঁপা বললে, শুধু একবারটী শশী—

শশী বললে, কি ?

হঠাৎ লজ্জায় চাঁপার সমস্ত শরীর মন অবসন্ন বোধ হতে লাগল। ও চুপ করে রৈল।

ওর কোলের মধ্যে শশী নড়ে উঠল একবার। শশী যে ওর কোলে, এই সাড়াটা ও যেন সবে পেলে এমনি করে চমকে উঠল।

চাঁপা মন্তের মতন তাড়াতাড়ি বললে, শশী, বলদিকি, মা।

শশী আজ হঠাৎ চাঁপার এমনতর ভাবে আশ্চর্য্য হয়ে গেচে। ও বোকার মতন তাড়াতাড়ি বলে ফেললে, মা।

চাঁপা যেন ঘি পাওয়া আগুনের মত জ্বলে উঠল। বল্‌ল, শশী, দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, বুঝলি, আর একবার বল। যেমন তোর মাকে ডাকিস, মিষ্টি করে।

শশী চুপ।

চাঁপা ওর গালে মাথায় মুখে পাগলের মতন কতকগুলো চুমো খেলে। শশী দেখলে, এ চুমুগুলো তো মিষ্টি নয়; ওর লাগচে। ও গালে হাত বুলোতে লাগল।

চাঁপা বললে, শশী, বল্ না।

শশী বললে, বাবা যে তোমাকে দিদি বলতে বলেচে। চাঁপা বললে, আচ্ছা তা বলিস্। কিন্তু এখন একটীবার বল না শশী—ওমা, মাগো।

তবুও শশী চুপ করে রইল।

চাঁপা বল্‌লে, বলবি না তো ? এক্ষুনি তোকে শ্যালের গত্তে ফেলে দিয়ে আসবো। দাঁড়া।

শশী ভয় পেয়ে দুহাতে চাঁপার কোমর জড়িয়ে ধরে, বুকের মধ্যে জোর করে মুখ গুঁজে রৈল।

চাঁপা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল। শশীকে বুকে চেপে ধরে বসে রইল।

শশী সবে একটু একটু মুখ তুলচে। চাঁপার বুকে তার ঘসড়ানি লাগচে। অমনি চাঁপা যেন জেগে উঠল। বল্‌লে, কিরে শশী, বলবি না তো।

শশী ওর দিকে মুখ তুলে চাইলে। অন্ধকারে চাঁপা দেখতে পেলে না।

চাঁপা বল্‌লে, আচ্ছা শশী, তা হলে,—

শশী ফিসফিস করে বললে, কি ?

চাঁপা ওর কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি চুপি কি বল্‌লে।

শশীর বয়েস প্রায় পাঁচ হতে চলল। রাখালী আর পুঁটুর জন্যে ওকে স্তন্যপান ছাড়তে হয়েছে অনেক আগে। এতদিনকার অনভ্যাসের পর ওকথায় শশীর অবাক লাগল। কারণ, সব কটা দাঁত গজিয়ে অবধি রাজ্যের জিনিস চিবিয়ে আসচে। কাজেই স্তন্যপানের অভাবটা ওর আর মনেই ছিল না। এইসব নানা রকম মনোভাবে শশী শেষ পর্য্যন্ত চুপ করেই রৈল।

চাঁপা ওর মাথাটা তুলে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরলে। বললে, খা না।

চাঁপার জোর করা দেখে, আর গলার স্বরে কাঁপন শুনে শশী রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। কারণ ওর দিদিকে এমনভাবে আর কখন দেখে নি। তাই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বললে, দিদি, ঘরে চল।

চাঁপা ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল শশীর গালে। ভ্যাংচানোর সুর করে বললে, ঘরে চল! দিদি!

শশীর কান্না শুনে ওর মা শশব্যস্তে এসে হাজির। দেখলে, চাঁপা ঘাটে বসে আছে। আর শশী ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদচে। মার সাড়া পেয়ে শশী তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল। ওর কান্নার মধ্যে বৌ আর কিছু আবিষ্কার করতে পারলে না। শুধু শুনলে, ছোটগিন্নি মেরেচে। বৌ অবাক। ছোটগিন্নি কখন ছেলেদের গায়ে হাত তোলে না। সে যাই হোক। বৌ ছেলেটাকে ট্যাঁকে পুরে প্রায় লাফাতে লাফাতে ঘরমুখো হল ছোটগিন্নির স্পর্দ্ধার গুণগান করতে করতে। ওর ছেলে, ও যা ইচ্ছে করবে তাই বলে পরের কি অধিকার যে, ওর ছেলের গায়ে হাত তোলে!

(১২)

শশীর মুখ থেকে সব খুঁটিয়ে শুনে নিয়ে বৌ তো চোখ কপালে তুলে বসে রৈল। ও ভেবেই পেলে না, এসব আবার কি! রাত্তিরে শশীর বাপকে নিয়ে বৌ পড়ল। বলতে লাগল, বলি ব্যাপার কি! ছোটগিন্নি যা বলে সব তাতেই যে বড় সায় দেওয়া! ওর কাছে যে বড় খোকাটি বনে যাওয়া হয়। বলি, কানে গেচে খবরটা?—বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল।

বৌয়ের মুখ খারাপের ঘটা দেখে চন্দোর আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, চুপ কর হারামজাদি। ছোটগিন্নি বয়েসে ঢের ছোট হলেও ওকে মার মতন ভক্তি শ্রদ্ধা করি।

বৌ যেন রীতিমত একটা থাবড়া খেলে। ওর বলবার আর কিছু রৈলো না। কিন্তু বুঝতেও পারলে না, ব্যাপারটা কি? শশীকে নিয়ে শেষে—? পরের দিন সকালবেলা মুখ ভার করে বললে, ছোটগিন্নি, তুমি আর আমার ছেলেমেয়ের সংশ্রবে থেক না।

চাঁপা কোন উত্তর দিলে না। ও একেবারে মূক হয়ে গেল।

এদিকে মুস্কিল। চন্দর হঠাৎ ওকে মা বলে ডাকতে লেগেচে। অত বড় জোয়ান চন্দরের মুখে মা ডাক শুনে চাঁপার একটানা-মনে হঠাৎ একটা ঘা লাগল যেন। ও আজকে হঠাৎ খুঁজে পেলে মা-ডাকে তিলমাত্র মিষ্টি নেই। অবাক হয়ে তাই ভাবতে লাগল।

কিন্তু তার সময় ছিল না। কারণ মন এতক্ষণে হঠাৎ গতি বদ্‌লালে নতুন দিকে। লজ্জায় চাঁপা একেবারে মরমর। অত বড় একটা জোয়ান মদ্দ যে ওকে মা-মা করবে, এতে চাঁপার যেন কি রকম খারাপই লাগতে লাগল। একটা দিন কোন ক্রমে ও সহ্য করলে। পরের দিন সকালে চন্দরের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘাড় হেঁট করে আস্তে আস্তে চাঁপা বললে, ছাখ, আমি তোমার চেয়ে অনেক ছোট, আমাকে মা বলে ডাকলে ভারি লজ্জা করে। তার চেয়ে ছোট গিন্নিই বল।

দু-একদিন লক্ষ্য করে করে বৌ দেখলে, চাঁপা চণ্ডী ঠাকুরের বাড়ী রীতিমত যাতায়াত সুরু করেচে। বৌয়ের সন্দেহ হল—। একদিন দুপুরে গিয়ে ছাখে, চণ্ডী ঠাকুরের মেয়ে কুন্‌কীটাকে কোলে নিয়ে, বসে বসে গাল মেলিয়ে গল্প হচ্চে। বৌয়ের সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। কিন্তু কেন যে, তাও ভাল করে বুঝতে পারলে না।

এই ক'দিনেই চাঁপা একেবারে আলাদা মানুষ। যতক্ষণ ঘরে থাকে, মুখে রা নেই। হাসি তো কবে গেচে। দুর্গার আর ভাল লাগচে না। চাঁপার কি উপায়, তাও ভেবে পায়নি। চন্দরের সঙ্গে সেই যে বৌয়ের চটাচটি হয়ে গেচে, তারপর আর কথাবার্ত্তা নেই। ছেলেগুলো বাপের পাত্তা পায় না। মার সঙ্গে কোনও দিন মিশতে শেখেনি। অথচ, চাঁপার কাছে যাওয়া নিষেধ। ওদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে। শশীর তো দিনের মধ্যে বিশবার চাঁপার কাছে যাবার চেষ্টা। শুধু মার রাঙা চোখ দেখেই দমে যায়। রাখালীটা অতো বোঝে না। তাই বেচারি রোজ খায় বেধড় ঠ্যাঙানি। এই রকম করে সব দিক থেকে, ঐ ছোটগিন্নির জন্যেই সংসারটা যেন পণ্ড হতে বসেচে। সব যেন ছাড়াছাড়া ভাব। দুর্গা মনে মনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে। চাঁপাকে ওই কি কম ভালবাসে! কিন্তু উপায় কি।

চাঁপার আড়ালে একদিন কুন্‌কীর মাকে দুর্গা কথাগুলো আগাগোড়া সব বললে। ঠানদিদি সবটা শুনে তো অবাক। কপাল চাপড়ে বললে, হা আমার পোড়াকপালী রে।

হঠাৎ বিদ্যুতের চমকের মতন তাড়াতাড়ি বৌ যেন আগাগোড়া মিলিয়ে কথাটা বুঝলে। চাঁপার মন দিয়ে, তার দিক দিয়ে, কথাটা ও একবারও

ভাবেনি। মেঘমুক্ত আকাশের মতন ওর বুকের ভেতরটা যেন প্রসন্ন হাসি হাসতে লাগল। একা একা বাড়ী আসতে আসতে দুর্গা ভাবতে লাগল, সত্যিই ছোটগিন্নির কপাল পোড়া। তা নইলে আর ওর অবস্থা এমন হয়। ঘরদোর-স্বামীপুত্তুর কিছুরই অভাব থাকতো না তো। কথাটা ওর মনে যেন ব্যথা হয়ে লাগতে লাগল। ওর ভেতরকার মা যেন আজ একেবারে সম্পূর্ণ জেগে উঠল। চাঁপার অভাবটা আজ যেন ওর নিজের বুকে বিঁধতে লাগল। আহা, চাঁপা ঐটুকুন মেয়ে, ওর জীবনের সাধ আহ্লাদ সব ঘুচে গেচে। দুর্গার চোখ দিয়ে জল ঝরঝর করে পড়তে লাগল। আজ ওর কেবলই ইচ্ছে করতে লাগল দৌড়ে গিয়ে চাঁপাকে খুব জোরে বুকে চেপে রাখে।

বাড়ি এসে দুর্গা একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করলে। শশীটা কোথায় গেচে, তাই সে বেঁচে গেলো। বৌ, রাখালী আর পুঁটুকে অকারণ ঠেঙিয়ে হৈ হৈ বাধিয়ে দিলে। তারপর তাদের টেনে হিঁচড়ে এনে চাঁপার সামনে দুম্ করে বসিয়ে দিয়ে বললে, ছোটগিন্নি, তুমিই বাড়ীর গিন্নি। দেখতে হয় ছাখ, না পারো সব চুলোয় থাক। আমি বাড়ীর বৌ। কেন সব তাতে মাথা দিয়ে মরি। আমি পারব না।

মেয়ে দুটো চাঁপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কিন্তু চাঁপা সেই যে চুপ করেচে, আর কথা কয়নি। সেই যেদিন বৌ বলেছিল, আমার ছেলেমেয়ের সংশ্রবে থেক না, ছোট্‌গিন্নি, সেদিন থেকে চাঁপা চুপ, যেন পাষাণ-প্রতিমা।

বৌয়ের আজ অত হাঁকডাকে চাঁপা একটু ভুরু কুঁচকে শুধু বল্‌লে, কি ব্যাপার বৌ।

দুর্গা একেবারে কেঁচো হ'য়ে গেল। ও ভয় পেলে চাঁপার এ স্থির মূর্ত্তি দেখে।

চাঁপা তখন গোয়াল ঘরের কানাচে বসে খড় কুচোচ্চে। বৌ জল আনতে যাই বলে কলসী কাঁখে করে শশীকে খুঁজতে বেরোলো। দেখলে, পাঁশ গাদার পাশে একা বসে শশী একটা কাঁঠালপাতায় কাঠি গিঁথচে আর খুলচে। আড়াল থেকে শশীর মুখখানা দেখে বৌয়ের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। শশী

তো এক মুহূর্ত্ত একলা চুপ করে বসে থাকবার ছেলে নয়। দুর্গার বুকের ভেতর কান্না যেন হু হু করে উঠল।

দুর্গা ডাকলে, শশী।

শশীর ওঠবার নামও নেই। দুর্গা এগিয়ে এসে ছ্যাখে, শশীর চোখ দিয়ে নিঃশব্দে টপটপ করে জল ঝরচে। হাতে কিন্তু সে পাতাটা গিঁথচে আর খুলচে। দুর্গার বুক ভেঙে এল। ডাকলে, শশী।

শশী চোখ তুলে শুধু একবার চাইলে। চোখ চক্‌চক্ করচে। মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে কঠিন হয়ে গেচে।

চাঁপাই শশীর জীবন। দুর্গা কতটুকু। সেই চাঁপাকে পায়নি ও। কতটা লেগেচে দুর্গা যেন বুঝতে পারলে। যে-শশীকে মারধর করলে বাড়ি মাথায় করে বেড়ায়, কেউ সামলাতে পারে না এক চাঁপা ছাড়া, সেই শশীর চোখে জল, অথচ মুখে রা নেই। দুর্গা একেবারে অবাক হয়ে গেচে।

শশীর মাথায় হাত রেখে বললে, ছোটগিন্নি ডাকচে, যাবি না? শশী কলের পুতুলের মতন টপ্ করে লাফিয়ে উঠল। তারপর দৌড়।

বৌয়ের যেন মন থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

শশী এগিয়ে এল। কিন্তু চাঁপার কাছে নয়। গোয়ালের একটা খুঁটি ধরে পাক খেতে লাগল। দেখলে, চাঁপা ফিরেও চায় না। সেখান থেকেই ও শেষে ভয়ে ভয়ে ডাকলে, ও দিদি।

চাঁপা কচকচ করে আপন মনে খড় কুচিয়ে যেতে লাগল। চাঁপাকে চুপচাপ থাকতে দেখে শশী দমে গেল। তবুও ও একবার বললে, দিদি গো।

চাঁপা গর্জ্জে উঠল। যা, যা, আমার সঙ্গে কথা কইতে হবে না।

শশী নিজে থেকে আসেনি। ওর মা ডেকে দিয়েচে। তার ওপর চাঁপার ধমক খেয়ে শশীর মুখখানা মা-মরা ছেলের মতন নিরুপায় হয়ে গেল। ফ্যাকাশে মুখখানা সে খুঁটির গায়ে ঠেকিয়ে নীরবে চাঁপারই দিকে চেয়ে রৈল। ব্যাথা পেয়ে ঐ টুকুন কচি ছেলেটার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

হঠাৎ চাঁপার চোখ পড়ল। ও জানতেই পারে নি যে শশী অমন করে কাঁদচে। চাঁপার বুকের ভেতর যেন ঝড় উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে

শশীকে বুকে করে নিয়ে গেল। তবুও শশী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো না। ও চাঁপার কানের কাছে মুখ এনে কান্নাগলায় বললে, এই তো বলচি, ওমা মাগো। চাঁপার মুখখানা ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শশীকে বুকে চেপে ধরে মাথায় গাল ঠেকিয়ে রাখলে।

কিন্তু চাঁপা সেই যে কেমন শক্ত হয়ে গেচে আর তার বদল হল না। চাঁপার হাসিতে সে ভেঙে-পড়া চাঞ্চল্য নেই। যেন পুরোপুরি পাষাণ প্রতিমার মুখের হাসি। এটা চাঁপার জীবনের নতুন পর্ব্ব সুরু।

গোয়ালের ঝাঁপের পাশ থেকে বৌ চুপিসাড়ে সরে গেল। পাছে ছোট গিন্নি আবার জানতে পারে।

(১৩)

কালের আরও কয়েকটা পাতা খসে গেল, নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে। চাঁপা আর কোনদিকে চাইতে পারে না। সব সাদা। কোথাও একটু রঙের টান নেই যে চোখ দুটোয় একটুখানি আটকায়, মনটা তিলের জন্যে বাঁধা পড়ে। টগর নেই, শশী নেই, রাখালী নেই, পুঁটু নেই। চন্দোর আর ওর বৌ তো পর। ওর গ্রাম কোথায় গেল। আর কিছু না হোক গাছের গা ঘেঁসে ঘেঁসে, পুকুরের পাড়ে পাড়ে, বাঁশের শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে মাড়িয়ে, নির্জ্জন পথে একা একা খানিকটা চলে গেলেও তো মনটা ভরে। এতবড় অসহায় মনে হল নিজেকে। কোনও দিকে কেউ নেই, কিছু নেই। খালি পর আর পর। ওর আজ মনে মনে কান্না পেতে লাগল। কিন্তু চোখে জল এল না। কতদিন পরে ওর আজকে প্রথমে মনে পড়ল, সেই ওদের উঠনের তুলসীতলা। সন্ধ্যের অন্ধকারে দাবায় বসে ওর মনটা নুয়ে এল। বললে, হে তুলসী নারায়ণ, আমার একি শাস্তি। আমার কেউ নেই কেন?

শশীর সঙ্গে রাখালীর সঙ্গে ও একটু একটু হাসে। সে আঁকা-হাসি। তাতে শব্দ নেই। শুধু আছে রেখা। সুখের সঙ্গে তার যোগ নেই। পাষাণ-প্রতিমার হাসি যেমন কঠিন। রাখালী অতশত বোঝে না। কিন্তু সুস্থিল শশীর। ও অনেকটা বুঝেচে। সে বোঝায় বুদ্ধির দরকার করে না। ভালবাসা দিয়ে যা অনুভব করা যায়। চাঁপার মনের সূতো ছিঁড়ে গেচে—এই কথা। ছোট্ট পাখীটির মতন শশী চাঁপার আশেপাশে বারে বারে ঘুরে আসে। কিন্তু

চাঁপার ছোঁয়া, ছায়া, আঁচ, কিছুই হয়ত ওর গায়ে লাগে না। আহা, শশী এটুকুন মানুষ। ওর মনে লেগেচে ভালবাসার মার, কি করে সইতে হয় তা তো ওর জানা নেই। সেইজন্যে বজ্জাৎ ছেলের সব দুষ্টুমি আজ একটা জায়গায় জড় হয়েচে। সে ওর দিদি। চাঁপাতে ওর মন লেগেচে। কাঁঠালতলায় একা একা সামান্য কি সব লতাপাতা নিয়ে কি খেলা করে। বোধ হয় কিছু ভাবে। কি জানি, কচি মনের ঘা-খাওয়া ভাবনা কিরকম করে চলে। তারপর ও কখন যে সেই কাঁঠালতলার ধূলোয় ঘুমিয়ে পড়ে কে জানে! শশীর আর খাওয়াদাওয়ার কোন বালাই নেই। নিজেই চুপ করে থাবা থাবা করে ভাত গেলে। আর, এদিক ওদিক কিসের আশায় চায়। রাখালী ওর পাত থেকে একখানা আলু তুলে নিলে সেই শশী সব আলু-গুলো রাখালীর পাতে ছুঁড়ে দেয়। তারপর শুধু ভাত গোগ্রাসে গিলে গজগজ-করতে করতে উঠে যায়। কোথায় গেল ওর সেই দুর্জ্জয় পুরুষকার। যা দিয়ে শশী সবাইকে হার মানিয়েচে এক চাঁপা ছাড়া। ভরদুপুরটা শশীর ঘুমোবার সময়। কিন্তু সারাদিনটা ও পেয়ারা গাছের ডালে বসে বসে ডাঁসা পেয়ারাগুলো চিবোবে। আর লাল পিঁপড়েগুলোকে টিপে টিপে মারবে নয়ত ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মধু টেনে খাবে। একেবারে একা একা, চুপচাপ। এসব কি চাঁপা দেখেনি? দেখেচে। তবুও কি করে অমন শক্ত হয়ে থাকে সেইটেই আশ্চর্য্য।

দুর্গা চেয়েছিল ছোট গিন্নিকে শাসন কর্ত্তে। মানা করে দিয়েছিল ওর ছেলেদের সংশ্রবে থাকতে কিন্তু ফল হল উল্টো। ও নিজেই যেন শাসন হয়ে গেল। মুখে অবশ্যই চাঁপা কোন ঝগড়া করে নি। শুধু মুখ বন্ধ করেছিল। এতবড় মার বৌ বোধ হয় আর কখন খায়নি। ও জানে মেয়েদের রাগ হলে তারা কোমর বেঁধে খাংরা নিয়ে তেড়ে আসবে। আর পুরুষের রাগ হলে, চ্যালা কাঠ আর লাথি। কিন্তু একি! ছোট গিন্নিকেও অনেকবার অনেক রকমে দেখেছে। কিন্তু এইখানটায় ও কোন পাত্তা পায় না। অথৈ জলের মতন, শীতের কুয়াসার মতন, অমাবস্যার রাতের মতন, অজানা, অচেনা, আর নতুন। চাঁপা যে হঠাৎ সংসারের কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল—কোথায় ঘরদোর নিকানো, গরুবাছুরের সেবা, লাউকুমড়োর মাচা বানানো, উচ্ছে লঙ্কা

চ্যাড়শের চাষ করা—এসব কি ? উদয়-অস্ত চাঁপার যেন নিঃশ্বেস নেবার সময় নেই। সন্ধ্যের পর একা একা হয় তেঁতুলের বীচি ছাড়াবে, না হয় নারকেল পাতা চিরে ঝ্যাঁটার কাঠি বার করবে। বৌয়ের সঙ্গে কথা শুধু খাবার সময়—থাক্ বৌ, আর দিও না—এই পর্য্যন্ত। তাতে ঝাঁঝ নেই, উষ্মা নেই, ভালবাসা নেই, সামান্য খাতিরও নেই। চাঁপাকে কি আর বলতে যাবে? ছেলেগুলোকে নিয়ে ঠ্যাঙাঠেঙি মুগরোমুগরি যা করবার তা শেষ হয়ে গেচে। চন্দরকে আর বলবার বাকী কিছু নেই। নিজে নিজে গজগজ করে নিজের মরণ কামনা করবার মতন তরল মনের অবস্থা আর নেই। যেন দুর্গাকে টুকরো টুকরো করে রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া হয়েচে। এ কি জ্বালা। রাবণের চিতে কি এমনি ধিকি ধিকি জ্বলেছিল! চাঁপা কি মনে করলে না করলে তাতে ওর বোয়েই গেল—এ কথা দুর্গা ভাবতে পারচে না কেন? ভালবাসার একি অভিশাপ! কাজেই বৌ মনে মনে রস-না-পাওয়া গাছের মতন শুখিয়ে উঠ্‌ল। একদিন তাই চন্দরকে বললে, দেখ, ভাবচি বাবাকে একবার দেখে আসি, অনেকদিন হল—। আর ছোট্-গিন্নি তো রৈল, যা হোক সেদ্দমেদ্দ করে দেবে এখন।

চন্দর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, হুঁ!

বৌ বুঝলে না এ 'হুঁ' মানে কি। জিগ্যেস করবারও সাহস হয় না।

শেষে চন্দরই বললে, কিন্তু শশী কি মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

কিন্তু বৌ চায় মুক্তি। দুটো দিনের জন্যেও অন্ততঃ। এখানে ওর দম আটকে আসচে। নিঃশ্বেস নেবার বাতাস পাচ্ছে না যেন। তাই তাড়াতাড়ি বললে, দু-চারটে দিন বৈত নয়।

কিন্তু পরের দিনই একটা অঘটন ঘটল। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় চন্দর ঝাঁঝের মাথায় বাড়ী ঢুকল। শরীরের সব রক্ত বোধ হয় তখন ওর মাথার ভেতর টগবগ করে ফুটচে। উঠনে পা দিয়েই চন্দর দেখলে, চাঁপা দাবায় বসে একা একা তেঁতুলের বিচি ছাড়াচ্চে। সোজাসুজি দাবার ছেঁচতলায় চাঁপার কাছে এসে চন্দর উত্তেজিত হয়ে বললে, হুকুম দাও ছোট গিন্নি, শালার নন্দমুদীকে নির্ব্বংশ করে দি। আমার হাতে তিনশ লেঠেল। শালাকা-শালা ধান চাল

পাট তিসি সরষের দাম নাবিয়ে দিয়েচে, বলে, আমার ব্যবসা লাটে তুলবে। বল, লুঠতরাজ করে, আগুন লাগিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দি।

চাঁপার ভুরু উঠ্‌ল কুঁচকে। কুচকুচে কাল মাথা নিয়ে ওর শিরদাঁড়া উঠ্‌ল সোজা হয়ে। গোখরো সাপের মতন। তারপরে তেঁতুলকাটা বঁটি-খানাকে শুইয়ে রেখে চাঁপা তেমনি ঘাড় সোজা করে বললে, দুমুঠো খেতে দিও, একখানা পরতে দিও, আমায় কিছু জিগ্যেস কর না। এই বলে আস্তে আস্তে চাঁপা ওর অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

চন্দর যেন আগুনের কুণ্ড থেকে বেরিয়ে বরফ-জলে পড়ল। চাঁপার কথা সাদাসিধে সোজা, অল্প। কিন্তু অত উত্তেজনার পর চন্দরের শরীর মন হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা খেয়ে অসাড় হয়ে গেল।

ছেলেরা সব খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েচে। চাঁপার ঘরের ভিতর শুধু আঁধার। রাত নেমে এসেচে। গ্রাম নিশুতি। এইমাত্র একটা তক্ষক ডেকে ডেকে থামল। চারিদিকে চুপচাপ। উঠানের কোণে লাউয়ের মাচাটার লম্বা লম্বা ছায়া পড়েচে। চন্দর দেখলে রান্নাঘরের ভেতর আলো জ্বলচে। তারি আভায় বৌয়ের মুখখানা পোড়ান সোনার মতন জ্বলজ্বল করচে। চন্দর বললে, হ্যাঁরে বৌ—।

ব্যস। আর বলতে হল না। দুর্গা একেবারে ভেঙে লুটিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। চন্দর অবাক! দুর্গাকে এত কাতর হতে কখন দেখেনি ও। ওর মাথার ভেতর গণ্ডগোল বাধল। কিন্তু চন্দর কঠিন পুরুষ। হেঁট হয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটা তুললে।

বললে, ওসব ন্যাকামি রাখ। কি হয়েচে বল।

বলবার কথা সামান্য, দু কথায় শেষ হয়। কিন্তু দুর্গার মনে হল, একথা বলে শেষ করা যায় না। বুঝানোও যাবে না।

কিন্তু চন্দরের দেরি সইচে না। চুলের মুঠোয় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, বল না, হারামজাদি, আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্চে যে।

কিন্তু তাতেও দুর্গার সমস্যা এমন সরল হ'ল না যে এক কথায় বলতে পারে—চাঁপাকে ওর ছেলেমেয়ের কাছ থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে দিয়েচে। নিঃশব্দে ওর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। ওর স্বামী যে ওর চুলের মুঠি

ধরে ঝাঁকানি দিচ্চে, ঘা-কতক যদি মারে তা হলে হয় হয়ত বৌয়ের একটু স্বস্তি বোধ হয়। কারণ, কথাটা জানাজানি হয়। একটা যা হয় নিষ্পত্তি হয়—ও একলা এ ভার আর সইতে পারচে না।

চন্দরের পেছনে যে চাঁপা কখন দাঁড়িয়েচে, তা ও জানতেও পারেনি। শাসনের স্বরে চাঁপা বললে, তুমি কি বৌকে মারবে নাকি?

চন্দর থতিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। চাঁপাকে পেয়ে বৌ যেন বাঁচল। যেন সাহস পেলে। চন্দরকে লক্ষ্য করে সবই বললে। চাঁপা চুপ।

চন্দর বললে, ওঃ, তাই জন্যে বাপের বাড়ি যাবার তাড়া? আচ্ছা।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর চন্দর ঘর থেকে দুটো বালিশ বগলদাবায় করে নিয়ে চল্ল চণ্ডীমণ্ডপে শুতে। চাঁপা সদর দরজায় খিল দিয়ে উঠোন পার হয়ে ফিরে আসছিল।

চন্দর বললে, মাথাটা আজ ভাল নেই ছোটগিন্নি, চণ্ডীমণ্ডপে একলা একলা আজ শুইগে।

চাঁপা বললে, তা হয় না। তুমি না হয় আমার ঘরে শোও, আমি দাবায় শোবো অখন।

হঠাৎ চন্দরের মাথা জ্বলে উঠ্‌ল। বললে, দেখ ছোটগিন্নি, তুমি পদে পদে আমায় ওরকম বাধা দিও না।

সাপের মাথায় ঘা লাগল। কতদিনকার কত কি জমা ছিল বোধ হয়। চাঁপা গর্জ্জে উঠল, কি বললে! তারপরেই গলা কেমনতর আটকে এল। বললে, চণ্ডীমণ্ডপে দরজা নেই, ঝাঁপ নেই, সারারাত্তির শ্যাল কুকুর সাপখোপের আড্ডা হয়ে থাকে। তুমি সেইখানে শোবে। আর আমরা ঘরে শোব! যাও, তাই শুতে যাও। আমিও এই অন্ধকার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব, দেখি তুমি কেমন আটকাতে পার।

চাঁপার মাথা থেকে ঘোমটার শেষটুক খসে পড়ল। মত্ত ঘোড়ার মত সেই সাবেকী চালে, তেজী চাঁপা পা ফেলে ফেলে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

চন্দর সেই রাত্তিরে উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। আচ্ছা, ঐজন্যেই কি লোকে সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু এ ভাবনা চন্দরের

টিকল না। কারণ, মনে হল ছোটগিন্নি ঘরে গিয়ে কান্না চাপবার চেষ্টা করচে। ঘরে ঢুকে চন্দর বললে, ছোটগিন্নি, মাফ কর। আমি বুঝতে পারিনি। মাথাটা আজ ঠিক নেই। আমি ঘরেই শুচ্চি। তুমি রাগ করে থেক না।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে চাঁপা বললে, ওমা আমি রাগ করব না? তুমি ওই আষাঢ়ে জায়গায় শুতে যাচ্ছিলে! চল, শোবে। বলে চন্দরের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল।

চন্দর গিয়ে ঘরে ঢুকল। চাঁপা রান্নাঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলে কেউ নেই। দাবার এককোণে বৌ ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে রয়েচে।

চাঁপা বললে, হ্যাঁ বৌ, তুমি ভুতের মতন অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েচ যে? তামাকটামাক সেজে দাওগে।

ভোরবেলা পুকুরে গিয়ে ডুব দিতে না পারলে চাঁপার সারা দিনমানটা শুখনো লাগে। পুকুর ঘাট থেকে ফিরতে ওর একটু দেরীই হল। ভিজে কাপড়ে একটা কলসী কাঁখে নিয়ে সদর দরজার কাছে এসে দেখলে একটা গরুর গাড়ী। তাতে টিনের একটা তোরঙ্গ আর একটা বিছানা। ভাবতে লাগল, এই সকালে কে এলো? কিন্তু উঠোনের ভেতর পা দিয়ে চাঁপার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। সক্কালবেলা একি কাণ্ড। চন্দর শশীকে একটা পুরনোকালের কল্কা দেওয়া কোট পরিয়ে দিচ্ছে। চাঁপা কিছু বললে না। জলের কলসীটা দাবায় নাবিয়ে রেখে ঘরে ঢুকল না। দাবার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুলের সঙ্গে ভিজে গামছা জড়িয়ে জল নেংড়াতে লাগল। শশীকে জামা পরিয়ে চন্দর সোজা চলে এল রান্নাঘরে, দুর্গাকে শুধু রাশভারি গলায় বললে, কিরে বাপের বাড়ী যাবি না?

বৌ রান্না আরম্ভ করেচে সবে। উনুনের দিকে মুখ করে বসে রৈল। বেশী কথার লোক আর যেই হোক চন্দর নয় কাজেই চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দুর্গা আজ দশ বছর এই লোকের সঙ্গে ঘর করেচে। কাজেই জানে, এ চুপ করে থাকা কত ভয়ঙ্কর। ধরতে গেলে এই তো সেদিনকার কথা। লাথি খেয়ে দুর্গা উল্টে পড়ল একটা বাটির কানার ওপর। আর কপাল কেটে রক্ত বেরল ঝরঝর করে। তারপর? কি আর! চন্দর

চলে গেল আড়তে। ফিরল না তিনদিন। বৌ আর কি করবে। আঁচল দিয়ে কপালটা পুঁছে ফেললে। তারপর ছেলেমেয়ে ঘর সংসার আর কি। কিন্তু তখন ছিল একলা। এখন চাঁপা রয়েচে যে। তার সামনে এমনতর ব্যাপার খারাপ দেখতে লাগবে, এই ভাবলে দুর্গা। আর কিছু না হোক, চন্দর যে এক্ষুনি ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলতে পারে। তাই জন্যে যেই চন্দর ধমক দিয়ে উঠল, কিরে? ওমনি দুর্গা কাঠের মতন উঠে দাঁড়াল শুধু। তিজেলে তখন ডাল সেদ্ধ হচ্ছে। তারি ফ্যানা উপচে উঠচে হাঁড়ির কানায় কানায়। এই তো একপলা তেল ফেলে দেবার সময়। কিন্তু থাক্। কারণ এক্ষুণি গিয়ে গাড়ীতে উঠতে হবে, এই ও মনে মনে বুঝলে।

বৌকে দাঁড়াতে দেখে চন্দর বললে, বাপের বাড়িতে যাবে, সাজগোজের দরকার কি। ঐ এক কাপড়েই চল।

কিন্তু রান্নাঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে দাবায় পা দিতেই চন্দর চমকে উঠল। একি! চাঁপা দাঁড়িয়ে। সেই গরদের থানখানা পরেচে। চন্দরই তো কিনে এনে দিয়েছিল। বলেছিল, ছোটগিন্নি তোমাকে হাতে করে থান দিতে লজ্জা করে, কিন্তু কি করব। চাঁপা তো হেসে আকুল। বলে, বাঃ তোমার কি দোষ! আমি বিধবা হয়েচি, জাতে পতিত হয়ে গেচি, আমারি তো পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল, তোমার কি? কিন্তু কাপড়খানা বেশ। আমার ভারি লোভ হচ্চে। আচ্ছা শুধু যদি খুব একটুখানি, সরু লাল পাড়ের মতন থাকত, তাতেও দোষ হত? বলে আবার হাসি। সেই কাপড় এতদিন চাঁপা একবারও পরেনি। আজ ওর হল কি? নেয়ে এসে কাপড়খানা পরেচে। তাতে যেন চাঁপার গৌরব বেড়েচে। চাঁপার মধ্যে অজানা কামনাও আছে অচেনা সংযম ও আছে। চাঁপা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি কি বৌকে তাড়িয়ে দিচ্চ?

চাঁপার একি সর্ব্বনেশে কথা। প্রশ্ন নয়, রাগ নয়, ভয় পাওয়া নয়, অনুযোগ নয়, শুধু উল্লেখ মাত্র। এতেই চন্দর ভীষণ ঘাবড়ে গেল। কোন উত্তর জোগাল না। আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল।

দুর্গার ভয় পাওয়া মুখখানা দেখে চাঁপার ভারি মায়া হল। বললে, ম্যাগো, বৌ, তুমি কি! ছ্যাখ ডালটা বোধ হয় ধরে গেল।

চাঁপা ছ্যাখেনি শশী ওর পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েচে। দাবায় বেরিয়ে এসে চাঁপা শশীকে বললে, কিরে শশী, কোথায় যাবি? দূর পাগলা, দেখলি না, তোর বাবা তোদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। জানিস্ না? আমার ওপর খুব রাগ হয়েচে, তাই।

শশী কি বুঝলে, সেটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু ওর মুখে দেখা গেল, ছেলেমানুষটা হয়ত একটা অজানা ভয় পেয়েচে।

চাঁপা ওর মাথায় হাত রেখে বললে, তোর বাবার ওসব মিথ্যে কথা। মামার বাড়ী নিয়ে যাবে, না হাতি। যা যা, খেলগে যা। এই বলে চাঁপা এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে। একটা হ্যাঁচকা টানে টিনের তোরঙ্গটা গরুর গাড়ী থেকে মাটিতে ফেললে। দেখলে, রাখালীটা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। সেটা নিজে হাতে বয়ে এনে দুম্ করে দাবায় ফেললে। তার পর সোজা চলে এল একেবারে চন্দরের ঘরের ভেতর। চন্দর তখন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে টিকেয় আগুন ধরাচ্চে। বললে, তুমি আজ আড়তে যাবে না?

মুখ না ফিরিয়েই চন্দর বললে, হুঁ। চাঁপার গলায় একেবারে সুর বেজে উঠল। বললে, চল আমিও যাব, তোমার সঙ্গে।

চন্দর অবাক। টিকেখানা কল্কের ওপর রেখে চাঁপার দিকে ফিরে বললে, কোথায় যাবে?

চাঁপা একেবারে নতুন হয়ে মেতে উঠ্‌ল। বললে, বাহারে, এর মধ্যে ভুলে গেলে। সেই যে নন্দ মুদী? তাকে একবার দেখব না!

এমন বলবার ধারা চাঁপার, যেন আজ সকালে, এই সবে, চন্দরের সঙ্গে ওর দেখা হল। আর মনটি বেশ ভাল আছে।

চন্দর বললে, তুমি যাবে?

চাঁপা বললে, ওমা যাব না? সে তোমার এতদিনকার ব্যবসা লাটে তুলবে বলেচে, দেখি একবার লোকটাকে।

চন্দরের মনে পড়ল নিজেকে। বললে, তা হয় না ছোট গিন্নি। তুমি মুকুজ্জে বাড়ীর বৌ। তুমি যাবে কোথাকার এক মুদীর আড়তে, এটা বাজে কথা।

চাঁপা বললে, মুকুজ্জে বাড়ীর বৌ তাতে কি! তাই বলে বজ্জাতকে শাসন করতে হবে না বুঝি?

চন্দরের মুখে হাসি এল। বললে, সে ব্যাটা চন্দর মুকুজ্জেকেই বড় গেরাজ্জি করে, তা তুমি। হুঁ!

চাঁপা বললে, বেশ, তুমি না নিয়ে যাও, আমি একলাই যাব। গরুর গাড়ীটা এখন রয়েচে ত!

চন্দরের চোখ ঘোলা হ'য়ে এল। কিন্তু চাঁপা সত্যিই বেরিয়ে গেল। চন্দর কিছুতেই ওই কথাটা ভেবে পায় না, ছোট গিন্নির অত জোর কিসের! যে চন্দরের পাঁচ সাত হাজারের ব্যবসা, দু চার হাজারের তেজারতি, জায়গাজমি, প্রজাপাঠক, লেঠেল-আমলা হাতে আছে, যার মাথায় বুদ্ধি আছে, মুখে ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য—সেই লোককে চাঁপার মতন একটা ছোট মেয়ে পদে পদে কিসের জোরে সব থেকে নাকচ করে দিচ্চে! ওর মনে হল ও পারবে না চাঁপার সঙ্গে।

চাঁপা একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে গরুর গাড়িতে উঠে বসল। শশীকে ডেকে বললে, ওরে তোর বাবাকে শিগগির আসতে বল, বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

চন্দরের তামাক খাওয়া হল না। ছাতা বগলদাবায় করে বেরিয়ে পড়ল। ও বুঝেই উঠ্‌তে পারলে না, ছোট গিন্নির ব্যাপার কি? দুর্গাকে গালাগালি করবার জন্যই ও রেগে গেছে, না সত্যিই নন্দ মুদীকে শাসন করতে চলল। এখানকার এই গোলযোগ আর ভাল লাগচে না, তাই খানিকটা এড়াতে চাইচে। কোনটা? চন্দরের নিজের ব্যবহারে লজ্জা বোধ হয়েচে। কারণ বৌয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে অন্ততঃ ব্যবহারটা ভাল করা উচিত ছিল। আর তা ছাড়া ও ভেবে দেখলে, চাঁপার সঙ্গে ওর জোর চলবে না। কাজেই, গরুর গাড়ির কাছে গিয়ে খুব নরম করে বললে, ছোট গিন্নি তুমি ত বুঝতেই পাচ্চ, এটা ভাল হবে কি! বরঞ্চ তোমার নাম করে নন্দকে এখানে ডেকে পাঠাব।

খিল খিল করে চাঁপা হেসে উঠ্‌ল। বললে তবেই হয়েচে, নন্দ আসবে এখানে? ভারি ত জান! চল না, খুব একটা মজা হবে। বলেই গাড়োয়ানকে গাড়ী ছাড়তে ইসারা করলে।

নিতান্ত অবসন্নের মতন চন্দর ছাতা মাথায় দিয়ে গাড়ির আগে আগে চলতে লাগল। ওর মাথায় আর কুলোয় না, এসব কি হচ্চে!

দুর্গা নিজের ভাবনায় রান্নাঘরে ছিল। চাঁপার কথা শোনে নি। কিন্তু শশীর মুখে যেই শুনলে, ওমা, দিদি চলে গেল, সে যেন চাবুকের একটা ঘা। উঠতে পারলে না। রান্নাঘরে বসে বসে দুর্গার মুখ সাদা হয়ে ঘেমে উঠ্‌ল। বুঝতে পারলে না, চাঁপা তাই বলে, শশীকে রাখালীকে ছেড়ে সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে চলে যেতে পারে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাংলায় স্বাধীনতার কবিতা

কাব্যসৃষ্টি-শক্তির অলৌকিকত্বে যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরাও স্বীকার করেন, যে, শক্তিমান কবি অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার দ্বারা সাধারণের অভাবিত-পূর্ব উপায়ে চিত্তাকর্ষক কথা রচনায় সিদ্ধহস্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত আলঙ্কারিকেরা ব'লেছেন, এর নাম 'রীতি'। রীতি, মানে, পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী। আধুনিক ইংরেজী কবিতার একজন সংকলয়িতা ব'লেছেন, "though it is true that the best poets in any age are those who are most successful in finding an idiom close enough to the world in which they live, it is also true that the poetical progress of an age can only be represented by those poets whose work is a genuine development of what has gone before." একটি বিশেষ যুগের বিশেষ 'idiom' যাঁর আয়ত্ত, ভাবপ্রকাশে তাঁর আর কোনো বাধা থাকে না। এই idiom অবশ্য কাব্যক্ষেত্রের idiom, সংসারক্ষেত্রের নয়। কাব্যক্ষেত্র এবং সংসারক্ষেত্র তাই ব'লে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। সংসারক্ষেত্রের ভিত্তি অবলম্বনেই কাব্য জগতের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তা'র সুদূরচারী নভোমণ্ডলে নিত্য পরিচিত সংসারের স্থূল পদাঙ্ক চিহ্নিত হয় না। ভারতচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক পাঠকের মনোহরণে যে সমর্থ হ'য়েছিলেন, তার কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সাহিত্যের idiom তাঁর করতলগত ছিল। অবশ্য তৎকালীন সাহিত্যের নভোমণ্ডলে তৎকালীন সংসারের স্থূল পদাঙ্ক যে চিহ্নিত হয়নি, একথা জোর ক'রে বলা যায় না।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য প্রধানতঃ বর্ণনধর্মী। বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই বর্ণনার প্রাচুর্য চোখে পড়ে এবং বর্ণনমূলক রচনায় যেহেতু কাব্যিকে মননের অধিক অবকাশ নেই, সেই কারণে, বাংলা মঙ্গল কাব্য অথবা বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতে কাব্যের যথোচিত সূক্ষ্মতা অনুপস্থিত। এই ঐতিহ্যেই ভারতচন্দ্র লালিত এবং পরবর্তীকালে প্রায় মধুসূদন দত্ত পর্য্যন্ত এরই ঢেউ এসে আমাদের কাব্য-সাহিত্যের তটপ্রান্তদেশ স্পর্শ করেছে। মধুসূদন কাব্যের আঙ্গিক নিয়ন্ত্রণে যে পরিমাণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন,

তা'র ভাববস্তুর সংস্কার মোচনে ঠিক সে পরিমাণ শক্তির প্রমাণ রেখে যান নি। সংস্কৃতের আলঙ্কারিকেরা যা'কে ব'লেছেন 'সিদ্ধরস', সেই বস্তুর অসদ্ভাব ঘ'টেছে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে। কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব তা'কে বলা যায় না। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন ক'রে তিনি যা' লিখেছেন, তা'তে সহজ সাধারণ মানুষের মন স্ফটিক-দীপ্তিতে কোথাও বিশেষ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠেনি। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে অবশ্য আমাদের সংসারের কাছাকাছি, ঘনিষ্ঠ ভাবলোক রূপায়িত হ'য়েছে, কিন্তু আঁটসাঁট চতুর্দশপদের শৃঙ্খলের মধ্যে উদ্বেলিত সমুদ্রের কতোটুকুই বা ধরা যায়? আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি ছাড়াও ছন্দে বাঁধবার মতো আরো এক জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন বিহারীলাল। বিহারীলাল চক্রবর্তীর পূর্বে আমাদের কবিদের বাসনা অপৌরাণিক, অ-কীর্তিমণ্ডিত, সহজ মানুষের অন্তর্মুখী কল্পনার অভিমুখে বিশেষ উদ্রিক্ত হ'তে পারেনি, এ অভিমত শুদ্ধ চিত্তেই পোষণ করা যায়। বিহারীলাল এ পথের প্রথম পথিক, তাঁকে পথ আবিষ্কার এবং নির্মাণ—দুইই ক'রতে হ'য়েছে। তখন থেকে বাংলা কাব্যের প্রবাহ যে পথে চ'লেছে, সে পথ স্থূল সংসারের বন্ধুরতার মধ্যবর্তী নিষ্কলঙ্ক রজত-স্রোতের সঙ্গে তুলনীয়। অথবা অন্য উপমার সাহায্য নিলে বলা যায় যে, এর পূর্ববর্তী কাব্যলোকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ এই ত্রিবিধ বস্তুর সৃষ্টি হ'য়েছিল,—হয়নি কেবল মরুৎ এবং ব্যোম্। এই দুটি সূক্ষ্মতর পদার্থ উত্তরকালের সামগ্রী।

ঈশ্বর গুপ্ত পারিপার্শ্বিক মানব-সংসারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু মরুৎ-ব্যোমের বাসনা তাঁর ছিল না। কবিগানের অন্যতম রচয়িতা এবং পৃষ্ঠপোষক হ'য়েও সমসাময়িক সমাজের অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবলোকের ক্ষণিক, চকিত পরিচয় তিনি মাঝে মাঝে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনাবলীর তুলনায় এ ধরণের দৃষ্টান্ত আয়তনে নগণ্য। লঘু হাস্য-পরিহাস, গ্রাম্য কৌতুকপ্রবণতা এবং সর্বগ্রাসী শব্দপ্রীতি—এই ছিল গুপ্ত-কবির বিশেষত্ব।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তেরই জ্ঞাতিস্থানীয়। বয়সে তিনি গুপ্ত-কবির তুলনায় প্রায় পনেরো বছরের ছোটো ছিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু সাহিত্যিক প্রবণতার বিচারে ঈশ্বর গুপ্তের এতো নিকটবর্তী কবি বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে আর কেউই নেই। ঈশ্বর গুপ্ত আধ্যাত্মিক কবিতাবলীও লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর কাব্যের বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল সমসাময়িক সমাজ। আর Parsons যেমন ব'লেছেন, "the poetical progress of an age can only be represented by those poets whose work is a genuine development of what has gone before",—ঈশ্বর গুপ্ত এই বিচারেও উত্তীর্ণ হবেন, কারণ তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কবিওয়ালাদের তিনি স্বগোত্র। তিনি নিজে এবং তাঁর পরবর্তী কবি রঙ্গলালও কবিগান রচনা ক'রেছেন। এই উভয় কবিই তাঁদের জীবন-কালে ঐতিহ্যাশ্রয়ী, আধুনিক কবি হিসেবে সম্মান পেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকাল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ স্বীকৃতির যুগ। যে রাজনৈতিক চৈতন্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে প্রকাশিত, তা'র কোনও ক্ষীণ সূচনাও তাঁর পূর্বকালীন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রিটিশ প্রভুত্বের প্রতি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধাবোধই ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঈশ্বর গুপ্তের আন্তরিক সম্মতি ছিল না। তা'র প্রমাণ আছে তাঁর একাধিক কবিতায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'ভারত সন্তানের প্রতি'—এই শিরোনামায় রচিত তাঁর একটি চতুর্দশপদী কবিতার উল্লেখ করা যায়। তা'র প্রথম কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হ'লো :—

পরাধীন ভারতের প্রিয় পুত্র যত।
ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে রবে আর কত ॥
ক্রমেতে হইল শূন্য সুখের কলস।
এখন হরিছ কাল হইয়া অলস ॥
উঠ উঠ শয্যা ছাড শুয়ে কেন আর।
বাহিরেতে কি হ'য়েছে দেখ একবার ॥

অনেক আশা নিয়ে পরাধীন ভারত-সন্তান হয়তো রাজনীতির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। কিন্তু 'বাহিরেতে' তখনো বিশেষ কিছুই হয়নি।

সিপাহী বিদ্রোহের মত ঘটনাতেও বাংলা কবিতার শান্তিকুঞ্জ অন্ততঃ ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুকাল অবধি অনুপদ্রুত ছিল। তাঁর "যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাবলী"তে এর প্রমাণ আছে। ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রতি যে অসীম শ্রদ্ধাবোধে মধুসূদন দত্ত সর্ব্বাঙ্গীন ইংরাজ হবার বিফল সাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন, সেই শ্রদ্ধাবোধে বর্তমান আলোচ্য কবির চৈতন্যও আচ্ছন্ন ছিল। আত্মবোধের অভাববশতঃ অকৃপণ আত্ম-নিন্দায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। বিশ্বাস করা শক্ত, যে, উল্লিখিত পংক্তি কয়েকটি যাঁর রচনাভুক্ত, নিম্নবর্তী কাব্যাংশও তাঁরই ;—

ভারতের অবোধ দুর্ব্বল লোক যত।
ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত ?
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর ॥

প্রাচীন যুগের স্বাধীনতাবোধ সম্বন্ধে John Stuart Mill লিখেছেন, "By liberty was meant protection against the tyranny of the political rulers." ঐ রচনারই কয়েক পংক্তি পরে তিনি আবার ব'লেছেন, "Their powers was regarded as necessary, but also as highly dangerous," ঈশ্বরগুপ্তের স্বাধীনতা মানে, সম্ভবতঃ, ব্রিটিশ ছত্রচ্ছায়ার অত্যাচারহীন আশ্রয়। সুতরাং সমসাময়িক সমাজব্যবস্থায় তাঁর অসন্তোষের সততা স্বীকৃত হ'লেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির স্তর থেকে তাঁর রচনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতাবোধ বিশেষ অগ্রসর হয়নি। চণ্ডীমঙ্গলে, ধর্মমঙ্গলে, নাথগীতিকার কোনো কোনো স্থলে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বহু রচনায় রাজার ও প্রজার কর্তব্য অথবা প্রজার ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া,—ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কবির মন্তব্য লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। খনার বচনে সর্ব্বসাধারণের যাতে উপকার হয়, এমন কাজের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করবার উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু দেশাত্মবোধের মধ্যে যে তীব্রতা ও অনৌদার্য্য,—যে পরসম্প্রদায়বিদ্বেষা আত্মকেন্দ্রিকতার সম্ভাবনা আছে, তা' এসব রচনায় অনুপস্থিত। "Rule Britania, Rule the Waves"—ঠিক এই শ্রেণীর চূড়ান্ত স্বার্থপরতা অবশ্য বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু হ'য়ে উঠতে কোনোদিনই

পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বাধীনতা-প্রীতি অন্তরে পোষণ করতেন, সে হ'চ্ছে পূর্ব-পশ্চিমের সমবায়ে জাত এক সংস্কৃতির ভূমিকায় মানুষ মাত্রেরই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণোপযোগী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বাধীনতার অন্যতম কবি ব'লে নাম ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলীতে শাসক বা অন্য কোনো শ্রেণীর প্রতি শাসিত ভারতবর্ষের তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়নি। নিজের দেশ সে কাব্যে বরণীয় হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু পরের দেশ মানচিত্র থেকে মুছে ফেলবার উপদেশ দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর তোরণের লিপি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে,—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং"। তাঁর 'স্বদেশ' নামক গ্রন্থভুক্ত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি—এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা ইহাই ধর্ম নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধ-মূলক ; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।"

বস্তুতঃ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাবোধ বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,

"নেশন্" শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই।...য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না।"

রবীন্দ্রনাথের Nationalism এবং অন্যান্য বহু রচনায় অনুরূপ মত প্রচারিত হ'য়েছে। তাঁর 'ভারততীর্থ' সমস্ত জাতিধর্মের মিলনক্ষেত্র, তাই ভারতবর্ষকে তিনি তীর্থক্ষেত্র ব'লেছেন।

বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে পাশ্চাত্য স্বাধীনতাবোধ কেন যে দেখা দিতে পারেনি তা'র কারণ লক্ষ্য করা গেল। ঈশ্বরগুপ্তের রচনায়

পরাধীনতার অসন্তোষ এবং রাজশক্তির প্রশস্তি দুই-ই আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথে বাংলাদেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষ উদার সমন্বয়ের ক্ষেত্র হিসাবে আধ্যাত্মিক মালভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি পণ্ডিত সমাজে একটি সুপ্রচলিত মত হচ্ছে এই যে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় প্রথম স্বাধীনতার কবিতা লিখে গেছেন। এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গলালের একটি কবিতার যে অংশ প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় সেটি স্কুল কলেজের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত এবং প্রায় সমস্ত শিক্ষিত বাঙালিরই কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত।

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

এই উদ্ধৃতিটি কোন্ বাঙালি ছাত্রেরই বা অবিদিত ? এর পূর্বপ্রসঙ্গ বা ভূমিকাটি স্মরণ করলে রঙ্গলালের দৃষ্টিকোণ সম্যক্ বোঝা যাবে। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় লিখিত রঙ্গলালের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানকালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক মৎ-কর্ত্তৃক রচিত হইল।"

উল্লিখিত কাব্যাংশ এই পদ্মিনী-উপাখ্যানের অন্তর্গত। ভীমসিংহ পাঠান-দের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের যখন উত্তেজিত করেন, তাঁর তখনকার উক্তি হিসাবে এই কথাগুলি রঙ্গলাল বসিয়ে দিয়েছেন।

অধ্যাপক Gilchrist সাহেব দীর্ঘকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Nationality' সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় ব'লেছিলেন, "A nationality lives either because it has been a nation, with its own territory and state, or because it wishes to become a nation with its own territory and state."

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলা দেশে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত হবার উপযুক্ত অবস্থা যখন ঘটেনি, সেই সময়ে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে রঙ্গলালের আবির্ভাব। কাজেই স্বাধীনতার কথা ব'লতে গিয়ে তাঁকে পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হ'য়েছে। আর রঙ্গলালের কাব্যে যে স্বাধীনতাবোধ রূপায়িত হ'য়েছে, সে স্বাধীনতা ঈশ্বর গুপ্তের পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসকের মনোরঞ্জন বিধানের পরামর্শ নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের অথবা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবের মিলনভূমি প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আগ্রহও নয়,—সে স্বাধীনতাবোধ হিংস্র এবং কুটিল এবং নির্ভীক। বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়ের এবং মিলনের কথা লিখলেও, তাঁর রচনায় বরং এই জাতের ঝাঁজ ছিল। তাঁর ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, তাই সে রচনার একদিকে যবন-বিদ্বেষ, অন্যদিকে ইংরাজের প্রতিরোধ। রঙ্গলালের কাব্যে যবন-বিদ্বেষ ফুটেছে কিন্তু ইংরাজের জন্য তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। ইংরাজি সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। ইংরাজী আদর্শে কাব্য রচনার ইচ্ছা তিনি সর্বান্তঃকরণে পোষণ করতেন কিন্তু সহিষ্ণু একটি দেশের স্কন্ধে ইংরাজী শাসনের যোয়াল থাকা ভাল কিংবা খারাপ—এ সব বিষয়ে তাঁর আবেগতপ্ত কোন মন্তব্য তিনি ছন্দে বাঁধেন নি। তথাপি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দটি আমরা ভুলতে পারি না। মধুসূদনের প্রথম নাটক "শর্মিষ্ঠা" এবং রঙ্গলালের রাজপুত কাহিনী "পদ্মিনী উপাখ্যান"—দুইই ছাপা হয় এই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। যবন-বিদ্বেষ প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে ছিল না, তা' নয়—কিন্তু স্বাধীনতা এই শব্দটকে অবলম্বন ক'রে পর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এরকম উত্তেজনা এর আগে আর উচ্চারিত হয়নি। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক স্বাধীনতাবোধের কবিতা লেখা হ'ল। ত'র অনেক পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে W. C. Banerjir

সভাপতিত্বে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভার অনুষ্ঠান ঘটে এবং তা'রও প্রায় দশ বছর পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রথম 'স্বরাজের' দাবী উপস্থিত করে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা স্বাধীনতাবোধের কবিতা লেখার জন্য যে idiom জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, সে idiom রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ত্ত ছিল। তাই বিংশ শতাব্দীর অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাঁকে যত ক্ষুদ্র এবং জঘণ্য মনে হোক্ না কেন,—সমসাময়িক কালে রঙ্গলালের খ্যাতির পরিমাণ কম ছিল না।

হরপ্রসাদ মিত্র

কুন্তলার সংসার

তারপর একদিন সিঁদুর উঠল কপালে, সানাই উঠল বেজে, গান হল অনেক, ঘোমটা উঠল মাথায়, কুন্তলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্রীবিলাসের সাথে রওনা হবার আগে এক সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কুন্তলা এল সৌদামিনীর বাসায়। বারান্দায় গিয়ে চুপে চুপে ডাকল—'মাসিমা, অ মাসিমা।'

'যাই রে' ভিতর থেকে মাসিমার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, যথাসময়ে দরজাও খুলে গেল—'অ মা, কুন্তলা তুই—একা এসেছিস, বিলাস এলো না?' 'একাই এসেছি মাসিমা,' ধীরে ধীরে কথা কয়টি বলে, কুন্তলা হাত বাড়াল সৌদামিনীর পায়ের দিকে, কিন্তু হাত পা স্পর্শ করেই রইল কিছুক্ষণ, সৌদামিনী বুঝতে পারলেন কুন্তলা কাঁদছে—দু'হাত ধরে ওকে তুলে ধরলেন, বললেন—'নে আর কতক্ষণ আমার পা ছুঁয়ে থাকবি।'

এত ধীর এত স্থির, এত আদর মাখান কথায় কুন্তলার ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। একথা যে ওরই প্রাপ্য—আর কারো নয়, মাসিমা ছাড়া, কে বুঝবে আজকের ওর এই যাত্রার অর্থ। এবাড়ীর সব কিছু যে আজ ওরই হতো, এর প্রতিটি ধূলিকণা, এই বাড়ীর প্রতিটি কোণ যে ভরে উঠত ওরই হাসিতে, কথা কয়ে উঠত ওরই গানে, ওরই অভিমানে। কিন্তু সে শুধু স্বপ্নই হয়ে রইল। সব ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, তাও যেন জানে না, শুধু জানে আর পাঁচজনের মত ওর বিয়ে হয়ে গেল, যাচ্ছে স্বামীর কর্ম্মস্থলে সংসার করতে। সে সংসারের কল্পনাও করেছে, সে সংসারও গড়ে তুলেছে মনে মনে একান্তে, যে সংসারের সামগ্রিক অধিকারিণী হয়ে ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল নিভৃতে, সে সংসার এ সংসার নয়। সেখানে হয়ত সবই আছে, শুধু নেই মাসিমা, আর নেই বিকাশ। কুন্তলার মনটা হঠাৎ অমনস্ক হয়ে উঠল, বিকাশ এখন কোথায়! হয়ত ঢাকায় হয়ত কলকাতায়, হয়ত আরো দূরের কোন অন্ধকার মত জেলখানার ততোধিক অন্ধকার কোন ঘরে বসে ভাবছে। কি ভাবছে। কুন্তলাকে কি? কুন্তলার চোখ জলে ভরে এল।

'নে কেঁদে আর কি করবি', সৌদামিনী ওর চোখ মুছিয়ে দিলেন—'আমারই কপাল মন্দ, তা না হলে' কিছুক্ষণ চুপ করেও তিনি আবার বললেন—'তুই আর কি করবি, বয়েস তো আর থামিয়ে রাখা যায় না, আর বিলাসও তো খুবই ভাল, এখন মন দিয়ে সংসার করগে।'

'ওঁর চিঠি পেয়েছ কোন!' মাঝপথেই কুন্তলা বলে উঠল।

'পেয়েছিরে, বিকাশ ভালই আছে—ভালই আছে।'

'ওঁকে তুমি জানিয়ো একথা।'

'নিশ্চয় জানাবো।' সৌদামিনী বললেন—'তুই এবার যা, রাত হয়ে এলো, আর দেখ, চিঠিপত্র দিস্ কিন্তু।'

কুন্তলা মাথা নাড়লো। আরেকবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিল ঘরের দিকে। একি শুধু স্মৃতি হয়েই রইবে চিরকাল। হয়তো তাই। স্মৃতি হয়েই বেঁচে থাকবে। বিকাশও থাকবে স্মৃতি হয়েই। সরকারের চাপে অনেকেই তো তার অতীতকে ভুলে গেছে। হয়তো ভুলে যাওয়াই নিয়ম। নইলে লোকে বাঁচতো কি করে। আজ যত কঠিন এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া, বছর কয়েক পরে এ কথা মনে হলে হাসিও হয়তো পাবে। মনে হবে কি অদ্ভুত ছেলেমানুষী। কুন্তলা বেরিয়ে এল।

কত ছোট ছোট স্মৃতি, কত হাসি, কত স্বপ্ন ওকে পথের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। বিকাশের কথাগুলো, বিকাসের সশব্দ হাসি, বিকাশের সেই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখা, ভয় পাওয়া সেই দৃশ্যগুলো কুন্তলার মনে পড়তে লাগল। হঠাৎ মাঝখানে যেন বিলাস কিরকম হয়ে গেল। কথা বলতো কম, মুখের দিকে চাইত না, ঠাট্টাও করত না। একদিন কানে কানে কি যেন সব বলল। কুন্তলাতো শুনেই ভয়ে কাঠ। ক্রমে ক্রমে রাত বেশী করে বাসায় আসত, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দু'টো জ্বলছে, কিসব বই পড়ত রাত জেগে জেগে। মাসীমা কত বলতেন—কিছুই ফল হত না।

একদিন দুপুরে মাসিমা ওঘরে ঘুমিয়ে, কুন্তলা চুপে চুপে বিকাশের ঘরে ঢুকেই স্থির হয়ে রইল। বিকাশের হাতে ওটা কি। কুন্তলাকে দেখেই বিকাশ কিরকম হয়ে গেল। তারপর কি রাগ তার। যা তা গালাগালি।

কুন্তলা চুপ—যেন বোবা হয়ে গেছে, যেন ওর রক্তে জোয়ার নেই। কতক্ষণ পর অদ্ভুত নরম গলায় বিকাশ ডাকল—'কুন্তলা।'

কুন্তলা যেন শুনতে পেল বহুদূর থেকে কে যেন ওকে ডাকছে। বিকাশ কাছে এসে ওকে স্পর্শ করল—বলল, 'কুন্তলা আমি আজ চলে যাচ্ছি, মাকে তুমি দেখ, আর, আমি যদি—শুষ্ক গলায় বিকাশ উচ্চারণ করল 'আমি যদি আর না ফিরি তবে……', কথা শেষ না করেই ঝড়ের বেগে ও বেরিয়ে গেল। কুন্তলা যেন স্বপ্ন দেখছিল, না দিল ওকে বাধা, না বুঝলো ওর কথা, না ডাকল একবার নাম ধরে।

দিন কয়েক পরে খবরের কাগজে এক ঘটনা পড়ে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে, দৌড়াতে দৌড়াতে দৌড়াতে কুন্তলা এবাড়ীতে এল, এসে দেখে মাসীমা মেঝেতে উপুড় হয়ে গোঁ গোঁ করছেন। কোথায় জল, কোথায় লোক, কোথায় ডাক্তার। সেদিনের কথা কি কুন্তলা কোনদিন ভুলবে, না ভুলতে পারে?

কলকাতায় এসে কুন্তলা পেতে বসল তার সংসার। সংসার ছোট, সে নিজে আর তার দক্ষিণ যার দাক্ষিণ্যে এ সংসার চলে, আর শ্রীবিলাসের এক পিসীমা যিনি ওকে বড় করেছেন। বিয়ের পরে যা হয়, স্ত্রীকে আদর করা, নতুন যায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সবই স্বামীর কর্ত্তব্যের মত শ্রীবিলাস করে গেল। প্রতিদিন ন'টা ছ'টা অপিস করে ক্লান্ত মনে বাসায় ফিরে স্ত্রীর হাতের চা খেয়ে না জানা গানের কলি উচ্চারণ করত, আর যখন তখন কুন্তলাকে অস্থির করত আদর দিয়ে। ক্রমে আদর তার অত্যাচার হয়ে দাঁড়াল। সুন্দরী স্ত্রী তার গর্বের বস্তু। কেরাণীর পক্ষে যা দুর্লভ। বছর গড়িয়ে এল। কুন্তলা সন্তানবতী হল। যথাসময়ে একটি ছেলের মা হল।

ছেলের নাম কি হবে এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে আসর বসল।

শ্রীবিলাস বলল—'বললে না কি নাম!'

'তুমিই বল না!'

'তোমার নামটিই বল না!'

'যদি ভাল হয় রাখবে সে নাম।' কুন্তলা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

'ঠিক রাখব।'

'যদি বলি বিকাশ।'

'এত নাম থাকতে ওনাম', শ্রীবিলাস ঠাট্টা করে বলল—'ওনামে কাউকে চিনতে নাকি!'

'যদি বলি চিনতাম।'

'তা চিনতেই বা—প্রেমিক ছিল না কি তোমার?'

'কেন হিংসে হয় নাকি!'

'না হিংসে করে আর কি করব, আমার যা পাওয়ার তা আমি পেয়েছি।'

'কি পেয়েছ!'

'সবশুদ্ধ আস্ত তোমাকে! 'কাজেই আর হিংসে করে কি করব, তবে করুণা করব তাকে।'

'ইস কি উদার দেবতা', কুন্তলা হেসে ফেলল, ছেলেকে কোলে তুলে বলল, 'শুনচিস্ খোকা তোর বাবা কি উদার।'

এমনি করেই দিন যায়। সময়ের পাখায় মুহূর্তগুলো উড়ে উড়ে যায়। সংসারের খরচ বেড়ে ওঠে। কিন্তু আয়ের অঙ্ক বাড়ে না। আলো পড়া ঘর ছেড়ে আরো অন্ধকারে উঠে আসতে হয়। পালঙ্ক ছেড়ে তক্তপোষে বিছানা হয়।

শ্রীবিলাসের আদরও ক্রমে কমে আসে। কুন্তলার হৃদয়ের জোয়ারও ধীরে ধীরে বয়। মাঝে মাঝে মন আকুল হয়। নাম ধরে ছেলেকে ডাকলে মনে পড়ে কোনো অতীতকে, কোন ছোট স্বপ্ন, কয়েকটি হাসি, একটি ছোট্ট অন্ধকার ঘর স্মৃতিতে ভিড় করে। চেষ্টা করে তাকে জীবন্ত করতে। মাঝে মাঝে হোচট খায়। মাঝে মাঝে কলরব করে উঠে। ক্রমশঃ সংসার আরো করুণ হয়ে আসে। শ্রীবিলাস খিটখিটে হয়ে উঠে। কুন্তলাও ছেলেকে চড় চাপড় লাগায়, ধোঁয়ায় ভরা ঘরে বসে কি ভাবে। শ্বাশুরীর কথায় রাগ হয়ে ওঠে। বছর পেরিয়ে যায় সময়ের পাখায়। এমনি দু'বছর গেল। কুন্তলা আবার সন্তানের জননী হল। এবার আর সেই স্বপ্ন নেই, ঠাট্টা নেই, হাসিও নেই। আছে তিক্ততা আর বাঁচাবার আকুলতা। চিন্তান্বিত শ্রীবিলাস মাসের শেষে হাত বাড়ায় বন্ধুদের কাছে, কিম্বা লোন কোম্পানীর কাগজে দস্তখত করে। সংসার বেড়ে উঠে। অন্ধকার ঘর ছেড়ে আরো অন্ধকারে এসে বাসা

নেয়। তক্তপোষ ফেলে দিয়ে মাটিতে আশ্রয় নেয়। প্রেমিক স্বামী যথারীতি অত্যাচারী হয়ে ওঠে। দারিদ্র্যের সাথে আদিম ক্ষুধা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। কুন্তলা ভয়ে কাঠ হয়ে আসে। বাধা দেয়, ককিয়ে ওঠে। কিন্তু বৃথা, সবই বৃথা। কেরাণীর স্ত্রীর আর শক্তি কত! আর বাধাই বা দেবে কি করে! ঐ একটি সান্ত্বনা, ঐ একটি ঐশ্বর্য্যই আছে দারিদ্র্যের। যক্ষ্মা রোগীর মত শুকিয়ে আসে যৌবন। স্বামীর লালসা আর কতদিন। আগের কুন্তলা এখন মৃত। ক্রমে এক মুঠো করে ভাত কমতে লাগল। বুকের দুধ শুকিয়ে আসতে লাগল। ছোট সন্তানের চীৎকারে ছোট ঘরটা ফেটে পড়বার উপক্রম হল। ক্লান্ত কেরাণী চীৎকার করে উঠে—'থামাও থামাও ওকে।' 'কি করে থামাব?' কুন্তলা আরো চেঁচায়।

'বুকের দুধ দাও।'

'দুধ নেই।'

'কেন কি হল'—শ্রীবিলাস রাগে একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে উঠলো। স্বামীর ইতরতা কুন্তলাকে ঠাণ্ডা করে দেয়। শ্রীবিলাস আরো উৎসাহ পেয়ে বসে। মৃতকে মারবার আগ্রহে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যা খুসী বলে যায়। কুন্তলা চুপ করে শোনে। যেন সে কত অপরাধী। তার অপরাধের শাস্তি এখন সে স্বেচ্ছায় নিচ্ছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কোন সুদূরের এক ঝলক ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাস এসে ভরে দেয় ওর ক্ষুধার্ত্ত আত্মাকে। মনে মনে বলে, 'বিকাশ ভুলিনি তোমাকে, বাঁচিয়ে রেখেছি তোমাকে সন্তানের মধ্য দিয়ে, অত্যাচারের মধ্য দিয়ে, সান্ত্বনার মধ্য দিয়ে, মৃত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।'

হঠাৎ এক দুঃসংবাদ। সহর আরো চঞ্চল হয়ে উঠল। আতঙ্কিত নরনারী। ভয়ার্ত চকিত দৃষ্টি। বাজার আগুন। শ্রীবিলাস ত্রস্তে এসে ভয়ে চীৎকার করে উঠল, 'বাঁচবো না, আর বাঁচবো না।'

বুঝতে না পেরে কুন্তলা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

'হাঁ ক'রে কি দেখছ, এবার মরতে হ'বে, এসে গেছে একেবারে, ঘরে এসে গেছে', শ্রীবিলাস পাগলের মত বলে উঠল—'রেঙ্গুন গেছে, আকিয়াব গেছে, এবার কলকাতা।'

যুদ্ধ, ছাই এ যুদ্ধ কি আর থামবে না। সেই কবে বিয়ের বছর কোথায় কোন সুদূরে যুদ্ধ বেধেছিল শুনেছে, এখনও তা থামে নি! কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! লোকগুলো কি সব পাগল হ'য়ে উঠল নাকি? কত লোক বলির পাঁঠার মত মারা যাচ্ছে। কেউ কি দেখছে না! কুন্তলা ভেবে আর কুল পায় না। ইতিমধ্যে বিয়ের কাপড়গুলো সব শেষ হয়েছে। ভগ্নাংশ যা যা আছে তাই সেলাই করে লজ্জা ঢাকা দিতে হচ্ছে। এর পর কি হবে? শ্রীবিলাসেরও একই অবস্থা। পাঞ্জাবীটার আর নেই কিছু। কুন্তলার উদাস চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

সংসারের অবস্থা আরো কঠিন হয়ে এল। শ্রীবিলাস ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বাজারে চাল নেই! কি আশ্চর্য। চাল নেই। একথা কি কেউ ভেবেছে কখনো! বাংলা দেশে চাল নেই! সংসার শুকিয়ে আসতে লাগল। ছেলে দু'টো শীর্ণ হতে শীর্ণতর হল। শ্রীবিলাসের দিকে চাওয়া যায় না। কুন্তলার চোয়ালের হাড় দু'টো বেরিয়ে এসেছে যেন মরা মানুষ। ওকে দেখলে রাগ হয় না, হয় করুণা। রাস্তায় রাস্তায় দেয়াল উঠতে লাগল। দেয়াল কেন? শোনা যাচ্ছে বোমা পড়বে নাকি? এরই মধ্যে ওদের বাসার ধার দিয়ে একদিন সকালে চীৎকার করতে করতে কতকগুলো ছেলেমেয়ে লাল একটা নিশান আর কককগুলো লাল কালিতে লেখা কাগজ নিয়ে চলে গেল। চীৎকার করে কি সব বলছে। কুন্তলা জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল অপসৃয়মাণ জনতার দিকে। ওর ব্যাকুল চোখ দু'টো যেন কি খুঁজছে তাদের মাঝে। ও যদি পারত ওরকম চীৎকার করতে! ও যদি পারত নিজের অবস্থা জানাতে সমস্ত পৃথিবীকে গলা ফাটিয়ে, তা হলে বোধ হয় ভেতরের চাপা ব্যথা কিছু কমতো। এইতো সংসার, কুন্তলা মনে মনে ভাবলে—এইতো আমার সংসার, ছেলে দু'টো চীৎকার করে মরছে না খেয়ে, স্বামী চোখের সামনে সারাদিন খেটে এসে মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়ছে, আর নিজে……কুন্তলা দীর্ঘ নিশ্বাস নিল।

দিন যায়। সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তবুও নতুনতর স্বাদ—নতুনতর অভাব এনে দিন পূর্ণতর করে গেলে। একবেলা খাওয়া অনেক দিন থেকেই চলছে। এখন বুঝি তাও হয় না। শ্রীবিলাস গেছে চাল আনতে কিউতে। কয়েকদিন থেকে এই কিউতে দাঁড়ান হচ্ছে আর এক কাজ।

রাত থাকতে বিছানা থেকে উঠে গজরাতে গজরাতে শ্রীবিলাস বেরিয়ে যায়। বেলা দশটায় আসে ফিরে, কোনদিন শূন্য ঝুলি নিয়ে, কোনদিন সেরখানেক নিয়ে। এসেই চীৎকার করে কুন্তলা আর ছেলে দু'টোর আর পিসীমার পিণ্ডি চটকাতে আরম্ভ করে, পরে রাগ করে অফিসের উদ্দেশে ত্রাহি মধুসূদন করে ছোটে। আর এদিকে সতী সাধ্বী কুন্তলা স্বামীর পথের দিকে থাকে চেয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপোষ করে। স্বামী না খেলে নাকি স্ত্রীর খেতে নেই। বারংবার এ কথাটা পিসীমা বলতে বলতে কুন্তলার এক কান হয়ত ভরেই দিয়েছে।

টাকার যখনই অভাব হয় কুন্তলা বাড়িয়ে দেয় ওর শীর্ণকায় হাতখানি স্বামীর দিকে। নিরুত্তরে একে একে হাত থেকে নিরুদ্দেশ হয় বিয়েতে পাওয়া সোনার অলঙ্কারগুলো। শেষ পর্য্যন্ত কালকে কানের ঝুমকো দু'টোও গেছে বিশু পোদ্দারের দোকানে। ঝুমকো দু'টো খুলবার সময় ওর চোখে এসে পড়েছিল জল। অনেক স্মৃতি ফিরে এসেছিল ওর মনে। কিন্তু অভাব যেখানে বড় সেখানে এসব স্মৃতির কোনই দাম নেই। অতীতকে মনে রাখবারও কোন বিলাসিতা নেই।

আজ এখনো চাল নিয়ে শ্রীবিলাস ফেরেনি। বেলা হয়ে গেল অনেক। ক্ষুধার্ত ছেলে দু'টো পায়ের কাছে চীৎকার করে ঘুর ঘুর করছে। কুন্তলা যে কি করবে তা ভেবেই পেল না। ওদিকে বুড়ী পিসীমাও ছেলেমানুষের মত গজরাতে আরম্ভ করেছেন। এসব যেন কুন্তলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আরম্ভ করা হয়েছে। এতটা অভাবের কথা নিজে স্বপ্নেও কখন ভাবেনি। এ দুর্দশার কথা কার কাছেই বা বলবে! বাবা তো বিয়ে দিয়েই খালাস পেয়েছেন। একটা চিঠি পর্য্যন্ত লেখেন না বছরখানেক ধরে। মেয়ে যে তাঁর আছে তাও তো মনে করা দুষ্কর। পেয়েছিল আমাকে তাই বধ করেছে।' কুন্তলা শুধু শুনেই যায়। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কি আছে ওর আর আছেন মাসীমা! তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার কি আর মুখ আছে? কি বলে চাইবে! তারপর দিনরাত শ্রীবিলাসের ইতরতা ওকে তিলে তিলে পুড়িয়ে মারুক আর কি। আর বিকাশদা এখন কোথায়? এখনো কি জেলে না ছাড়া পেয়েছে? সেদিন শ্রীবিলাসের এক বন্ধু এসেছিল, কথায় কথায় বললে—অনেককে নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিকাশ দা কি ছাড়া পেয়েছে? অনেক

দিন বিকাশকে ভাববার এমন প্রচণ্ড অবসর ওর আর ইদানিং হয়নি। হঠাৎ ওর চমক ভাঙ্গলো পিসীমার কথায়।

পিসীমা ডাকছেন—'বৌ, ও বৌ।'

'কেন।' কুন্তলা ধীরে উত্তর দিল।

'বিলাস তো এল না এখনো?' চিন্তান্বিত কণ্ঠে পিসীমা বললেন, 'কি উপায় হবে গো—সূয্যি যে মাঝখানে এসে পড়ল।'

কুন্তলা বলল—'অফিসের তো সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কি যে করি।'

'দেখ না একটু এগিয়ে।'

'আমি কোথায় দেখব পিসীমা!'

'তাও তো বটে—ঘরের বৌ, তুমি কোথায় যাবে!' পিসীমা উঠতে উঠতে বললেন—আমিই দেখি একটু এগিয়ে।'

'আপনি কোথায় দেখবেন—রাস্তাঘাট চেনেন না', পিসীমাকে উঠতে দেখে কুন্তলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'তা ছাড়া উনি তো হারিয়ে যান নি, বোধ হয় কাজে আটকে গেছেন।'

কিন্তু পিসীমার যাওয়া হল না। ঘরের দরজা ঠেলে একটি লোক জিজ্ঞেস করল—'এটা কি শ্রীবিলাস দত্তের বাসা?' তারপর ভেতরে ঢুকেই কুন্তলাকে বলল—'আপনি কি তার স্ত্রী?' হাতছানি দিয়ে ডাক দিল—'একটু শুনুন।' কুন্তলাতো লজ্জায় হিমসিম খেয়ে গেল। চেনে না শোনে না একি আশ্চর্য ব্যাপার! দেখে লোকটি আবার বলল—'শুনুন না—দরকার আছে।'

কুন্তলা দু'পা এগিয়ে এল লোকটি আস্তে আস্তে ওর কানে কি বলতেই কুন্তলা একটা চীৎকার দিয়ে বসে পড়ল। সংগে সংগে পিসীমাও চীৎকার করে উঠল—'বৌ—অ বৌ, কি হল।' কুন্তলা কাপড়ে মুখ গুঁজে স্থাণুর মত বসে রইল। যেন একটা পাথর। স্পন্দনহীন, শব্দহীন, প্রাণহীন। পিসীমা ওকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বলল—'বৌ কি হল।' কোন জবাব না পেয়ে লোকটিকে বলল—'কি হয়েছে বাবা?' লোকটি ধীরে ধীরে মুখটিকে যতদূর সম্ভব করুণ করে বল্ল—'ওঁর স্বামী মটর চাপা পড়ে মারা গেছেন।'

পিসীমা যেন গায়ের শক্তিতে চীৎকার করে উঠলেন 'অসম্ভব—এ হ'তে পারে না—' তারপরেই আবার চীৎকার করে উঠ্‌লেন—'অ বৌ, এ বলে কি!'

লোকটি ব্যাপার দেখে চম্পট। পিসীমার চীৎকারে বাড়ী মাথায় তুলল। সাথে সাথে ক্ষুধার্ত ছেলে দু'টোও মাকে জড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। এবাড়ীর কান্নার শব্দে পাড়ার জানলাগুলো খুলে গেল। কেউ কেউ দৌড়ে এল—'কি হয়েছে?' সবাই জিজ্ঞেস করছে—'কি হয়েছে—'কি হয়েছে?' সবাই চঞ্চল হল। জল এল, পাখা এল, এবাড়ীর শ্যামলী এল,

ওবাড়ী ছোট বৌ, দক্ষিণ-বাড়ীর মাসী। পিসীমা ইনিয়ে বিনিয়ে ব্যাপারটা বললেন। তারাও সহানুভূতি জানাল। কে যেন ছেলে দু'টোকে নিয়ে গেল—কে যেন কুন্তলার শাঁখা ভাঙ্গলো, সিঁদুর মুছে দিল। কুন্তলা কিছুই জানল না। দুপুর গেল, বিকেল গেল, পরদিন সূর্য উঠল। কুন্তলা চোখ মেলল, কি হয়েছে। পিসীমা কাঁদছেন কেন? নিজের দিকে চাইল একি শাঁখা কোথায়? তারপর মনে পড়ল সব। ছবির মত চোখের সামনে ভেসে এল কালকের লোকটি। কি যেন বলল ধীরে ধীরে—কি যেন বলল! কুন্তলা আবার কেঁদে উঠল। এবার আর চীৎকার নয়। নীরবে অশ্রু বর্ষণ। চীৎকারের শক্তি নেই। গলাটা যেন কিরকম করছে। পেটের ভেতর থেকে কি যেন উঠে আসছে গলা দিয়ে। ওর মনে হচ্ছে ও যেন চীৎকার করছে, ও যেন গায়ের জোরে চেঁচিয়ে কাঁদছে। কিন্তু কেউ শুনছে না। কি হল—কি হয়ে গেল চাল আনতে গিয়ে মটরে চাপা। একি মৃত্যু না আত্মহত্যা! আত্মহত্যা, আত্মহত্যা কেন? অভাবে—সংসারের বিতৃষ্ণা! নানা চিন্তা নানা প্রশ্ন এসে ওর মাথায় ভিড় করতে লাগল। আর চোখ দিয়ে সমানে জল পড়তে লাগল।

দুপুরের দিকে পাড়ার মেয়েরা আবার এল, জটলা করল, সহানুভূতিতে গলিয়ে দিলে, উপদেশ দিল। অবশেষে সবাই সমস্বরে রায় দিল 'এখানে আর থাকা উচিত নয়। কোন বস্তিতে চলে যান, খরচ কমবে, অথবা দেশেও যেতে পারেন যদি বাড়ী থাকে।'

বিকেলের দিকে এলো শ্রীবিলাসের সেই বন্ধু। সঙ্গে আনলো কিছু ফল-মূল। বসিয়ে বসিয়ে খাইয়ে গেলো ছেলে দু'টোকে। বলে গেল, কাল আবার আসবে। পরদিন যখন বন্ধুটি এলো—কুন্তলা তখন অনেক কষ্টে রেখে দেওয়া হার ছড়াটি ট্রাঙ্ক থেকে বের করে আনলো।

'ওটা দিয়ে কি হবে?'

'এটা বিক্রি করে এনে দিন আর বস্তিতে একটা ঘর দেখে দিন', কুন্তলা বললো, 'এখানে থাকা আর উচিত নয়, খরচেও কুলোবে না।'

বন্ধুটি অনেকক্ষণ নীচের দিকে চেয়ে চুপ করে হারটি হাতে নিলো, বললো—'জানেন তো বৌদি আমার অবস্থা।'

'তাতো জানিই সমরেশবাবু', কুন্তলা বললো—'আজকালকার দিন যে কি করে চলে তাও জানি।'

সমরেশ চলে গেল। সেই ঠিকঠাক করে ওদের পরের দিন নিয়ে গেল এক বস্তিতে। হাটের মাঝে একটা বেড়ার ঘর, দুর্গন্ধে ভরা চারিদিক, ভাড়া সস্তা, দু'টাকা। কুন্তলা ঠিক করে নিলো নিজেকে। যেখানে যেভাবে চলা উচিত

সেখানে ও ঠিক সে ভাবেই চলতে পারে। আটা ওকে এতদিন বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে। কুন্তলা নিজের জন্যে ভাবে না, ভাবে না পিসীমার জন্যে, কিন্তু রাজ্যের ভাবনা এসে জোটে ছেলেদের জন্য। কুন্তলার কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন ছিল—ছেলেদের ও বড় করবে, মানুষ করবে। কিন্তু কি হ'তে কি হ'লো। এত তাড়াতাড়ি যে ওর স্বপ্ন টুটে যাবে তা কি বিশ্বাস্য। আর এক চিন্তা সম্প্রতি এসেছে, যে হলো ওর গর্ভস্থ সন্তানকে নিয়ে, যে এখনো ওর গর্ভে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, প্রাণ পাচ্ছে। কি অদ্ভুত উপহাস! স্বামী গেল মারা, নিজেরা পায় না খেতে, ভবিষ্যত যেখানে অচ্ছিদ্র অন্ধকার, সেখানেও আবার নতুন সন্তান সম্ভাবনা! কি অনির্ণেয় পরিহাস! এর জন্যে রাগ হয় ওর স্বামীর উপর। দুঃখীর যৌন পিপাসা যে কি অভিশাপ—তা আজ কুন্তলার মতো কে এত বেশী বুঝেছে! এমনি ভাবেই দিন যায়।

জমানো টাকা একদিন ফুরিয়ে আসে। শূন্য দৃষ্টিতে কুন্তলা চায় পিসীমার দিকে। পিসীমার দৃষ্টিও শূন্য। একটু আশাও সেখানে নেই।

এবার তবে কি আকাশবৃত্তি না ভিক্ষাবৃত্তি। বৈষ্ণব যখন সে নয়, শিষ্য শিষ্যাও অল্প দু'চার পাঁচটি নেই তখন আকাশবৃত্তি আকাশেই থাক্—ভিক্ষা-বৃত্তিই প্রশস্ত উপায়। 'গরিবের লজ্জা কি, আর আমি তো বুড়ীই' বলে একদিন পিসীমা বিকাশকে হাতে ধরে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লো।

কুন্তলা দু'হাতে প্রথম দিন মুখ ঢাকলো। তার স্বপ্ন, তার ভবিষ্যতের আশা অবশেষে সত্যিই ভিক্ষাবৃত্তির ব্যবসা নিলো।

সন্ধ্যের দিকে তারা যখন ঘরে ফিরলো, দু'জনেরই মুখ ভরা হাসি। কুন্তলা তো অবাক। ব্যাপার কি? এমন কিছুই নয় দুজনের হাতে দু'টো ঠোঙা।

'এটা নাও বৌমা', পিসীমা হাতের ঠোঙাটা কুন্তলার দিকে এগিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিকাশও খিচুরি এনেছে—লঙ্গরখানা থেকে আর পিসীমা আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বললেন—'আর একটি আনি, একটি ডবল পয়সা, দুটো টিকিটও পেয়েছি', তারপর আঙিনায় বসতে বসতে বসতে—'আজকাল টিকিটে জিনিষ পাওয়া যায়।'

এমনি ভাবে দিন কয়েক বেশ চলে গেল। কুন্তলা এ ক'য়দিন কিছু কাজ খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু পায়নি। এত বড় সহরে কাজ নেই! নতুন মানুষকে কেউ চেনে না। তা ছাড়া যত খারাপ হয়েই থাক না কেন চেহারা—বাড়ীর কাজে মেয়েরা এখন ওকে নিতে ভয় পায়। এক বাড়ীর গিন্নীতো বলেই বসলো—'না বাপু অমন চেহারার মেয়ে চাই না—আমার সোমত্ত বয়সের ছেলেরা রয়েছে।'

হায় অদৃষ্ট—কুন্তলা শুধু এই ভাবলো।

আর এক বাড়ীর একটি বউ এমন এক ইঙ্গিত করলো যে তা শুনে কুন্তলা তো স্তব্ধ হয়েই রইলো কতক্ষণ তারপর লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। এ বয়সের মেয়েদের আর অমন চেহারার মেয়েদের নাকি রোজগারের অভাব হয়নি। বিশেষ করে রাতের বেলায়। যত বড়লোকেরা নাকি মটরে করে বাড়ীতেও নিয়ে যায়! কুন্তলা তো অবাক। একটি ঘরের বউ কি বলছে এসব! এ কয়দিন রাস্তা দিয়ে আনাগোনা করতে করতে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখেছে কুন্তলা। রাস্তার দু'পাশে অগণিত মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ী ছেলেমেয়ের ভিড়। কেউ ছেঁড়া কাপড়ে কোমড় পর্য্যন্ত জড়িয়ে আছে, কেউ একেবারেই উলঙ্গ। নানান ভাষায় কথা বলছে। সব নাকি আশে পাশের গ্রাম থেকে এসেছে এখানে খাবারের সন্ধানে। খাবারের সন্ধানও নাকি পেয়েছে—কেউ লংগরখানায়, কেউ ডাষ্টবিনে আর কেউ নর্দামার ভেতর। এই শীতের রাত্রে রাস্তার প্রশস্ত বুকে তারা ঘুমায়, এই রাস্তায়ই মলমূত্র ত্যাগ করে, এই রাস্তায়ই অসুখে মরে। আর দেখেছে মাঝে মাঝে ফুটপাতে লম্বা এক সারিতে অগণিত লোক দাঁড়িয়ে আছে—একদিক থেকে চাইলে আর একদিক দেখা যায় না—প্রথম লোকটি দাড়িয়ে আছে একটি দোকানের সামনে। এই নাকি কিউ এ রকম লাইনেই এসে দাঁড়াতো শ্রীবিলাস। ভোর রাত্রে এরা আসে জিনিষ কিনতে, কে কখন পাবে তা এদের অদৃষ্টই জানে আবার সবাই রোজ পায়ও না, শুষ্ক মুখে গালি দিতে দিতে বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয়।

এ ভাবেই দিন কয়েক গেল। এরই মধ্যে একদিন পিসীমা একা ভিক্ষা করতে বেড়িয়ে আর ফিরলেন না। সারাদিন অপেক্ষা করে কুন্তলা একটু খুঁজে এলো, তারপর কি ভেবে একটু মনে মনে হাসলো। তারপর নিশ্চিত হয়ে ঘরে দরজা দিলো। পরদিন বিকাশ একাই নিয়ে এলো খিচুরি, তাই দু'ভায়ে খেলো। সন্ধ্যের দিকে ওদের বাসায় রেখে কুন্তলা ঘোমটা টেনে বড় রাস্তার মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে সঙ্কোচ হলো, ভয় হলো, বুক কেঁপে উঠলো, তারপর সাদা শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দিলো এক সুশোভন বাবুর দিকে। বাবুটি থমকে দাঁড়ালো তারপর পকেটে হাত গলিয়ে কুন্তলার হাতে কি যেন দিল। কুন্তলা দেখে একটা আধুলি। ব্যস্ কুন্তলা অমনি চম্পট। একদিনে কয়েক মিনিটে আট আনা রোজগার! তারপর দিনও কিছু রোজগার হলো। কিন্তু অত ভয় লাগেনি। দিন কয়েক পরে কুন্তলা অভ্যস্ত হয়ে গেল। এরই মধ্যে একদিন যেই এক বাবুর দিকে হাত বাড়িয়েছে অমনি বাবুটি ওর হাত ধরে ফেললো, নীচু হয়ে মুখের দিকে চেয়ে বললো, "বাঃ খাসা মালতো, কত চাই গো?"

কুন্তলার বুক কেঁপে উঠলো। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গলিতে ঢুকে পড়লো। বাবুটি বললেন, 'ওগো শোনো শোনো।' কুন্তলা ততক্ষণে গলির অন্ধকারে মিশে গেছে। ঘরে এসে ছেলেদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। পরদিন অন্য পথে চললো।

এর দিন তিনেক পর একদিন কি একটা জিনিষ কিনতে কুন্তলা মোড়ের দোকানে যাচ্ছে। পথে দেখে একটি ওর বয়সীই মেয়ে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। তার পেছনে কয়েকটি ছেলে ডাকতে ডাকতে আসছে।

'এই বেটী—এই বেটী—শুনছিস?'

মেয়েটি আর দাঁড়ায় না যেন শুনতে পায়নি। একটি ছেলে দৌড়িয়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেললো, বললো—'এই বেটী শুনতে পাস্‌নি?'

'কি বলছেন বাবু!'

'বেটী তুই ছেলে ফেলে যাচ্ছিস যে।'

'আমি-আমি তো নই', আশ্চর্যের সুরে মেয়েটি বললো—'আমার তো ছেলে নেই।'

এর মধ্যেই অন্য ছেলেগুলো একটি শিশু নিয়ে এসে উপস্থিত।

'ও—ও আমার ছেলে নয় বাবু, আমার ছেলে নয়।'

'আমার ছেলে নয়!' আরেকটি ছেলে বলল—'নিয়ে যা, আমি দেখিনি তোকে ঐ বারান্দায় ফেলে আসতে! নে নে নিয়ে যা।'

মেয়েটি আর কিছু বলল না, হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিল, তারপর কেঁদে ফেলল, কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কি করব বাবু, খাওয়াতে পারি না, নিজে হাতে মারতেও কষ্ট হয়।' বলেই আবার ছেলেটাকে একটা চাপড় মেরে বলল, 'মরেও না, পথও ছাড়ে না।' তারপর সেখানেই বসে পড়ল।

ব্যাপার দেখে কুন্তলার মুখ শুকিয়ে এল। মায়ের মন যে এত নীচে নেমে গেছে তা যেন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অভাব মাকেও পশু করে যায়। সেদিনটা এক অদ্ভুত উপায়ে কুন্তলার কাটলো। বারে বারে ছেলেদের কোলে নিল, আদর করল, বসে বসে কি চিন্তা করল, এক একবার নিজের শরীরের দিকে চাইল, তলপেটে হাত দিয়ে কি অনুভব করল। বিমর্ষ হয়ে বসে রইল, সারাটা রাত্রে ঘুমালোও না। আরেকদিন নিজের বাসার কাছেই দেখে একটি মেয়ে তার দড়ির মত শুকনো স্তনটি বুকের ছেলের মুখে অনেকখানি ঠেসে দিয়ে বলছে, 'খা, খা যা পারিস খেয়ে নে, দুধ তো নেই, রক্ত খা, তারপর মাংস খাস রাক্ষসটা!'

কুন্তলা তাড়াতাড়ি এসে ঘরের দরজা দিল। দু'হাতে কান দু'টো চেপে স্থির হয়ে বসে রইল।

আর একদিন দেখে নর্দামার মধ্যে একটি শিশু মরে পড়ে রয়েছে। আর তার পাশেই একটি কুকুর আনাগোনা করছে। এ দৃশ্য কিছুতেই ভুলতে পারল না কুন্তলা। ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাবে এদৃশ্য ওর চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে লাগলো, কুন্তলার মনে হল এ অবস্থা যদি ওর ছেলেদেরই হয়! অভাবের তাড়নায় নিজেই যদি গলা চেপে ধরে ছেলেদের! আর খেতে না দিয়ে চোখের সামনে তিলে তিলে মারা এর দায়ক মত যন্ত্রণা আর কি আছে! কুন্তলা অনুভব করল তার পেটের ভেতর একটা মাংসপিণ্ড নড়াচড়া করছে। কুন্তলা উন্মাদের মত এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতে লাগল। যদি তার ছেলের অবস্থাই এরকম হয়।

না, না, তা হতে পারে না। বেঁচে থেকে এ দৃশ্য দেখতে পারব না সে। নর্দামার মধ্যে পচে রয়েছে তার ছেলে! অথবা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এল, ছেলেকে! তা হয় না, তা হবে না। তার চেয়ে তার চেয়ে·····কুন্তলা পাগলের মত ছটফট করতে লাগল।

বিকেলের দিকে ও ঢুকে পড়ল সামনের চামার পাড়ায়। সন্ধ্যায় যখন ফিরল তখন ওর সমস্ত কাপড় রক্তে ভিজে গেছে, কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে ও বারাণ্ডায় এসে শুয়ে পড়ল। অব্যক্ত ব্যথায় কোঁকাতে লাগল। বড়ছেলে বিকাশ রক্ত দেখে চীৎকার করতে লাগল। কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত। ওকে ধরে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিল। দু একটি মেয়ে যারা ছিল তারা কাপড়টা খুলে ফেলল, একটা ভারী ছেঁড়া কাঁথা ওর কোমরের তলে পেতে দিল। কিন্তু সেটাও প্রায় ভিজে উঠল। মাঝে মাঝে কুন্তলা অস্ফুট স্বরে কঁকিয়ে উঠতে লাগল। সারা শরীর ওর নীল হয়ে আসচে। মুখটা বারে বারে কুঞ্চিত হয়ে আসচে। এর মধ্যে খবর পেয়ে সামনের লঙরখানা থেকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ভলান্টিয়ার এসে উপস্থিত। ছেলেটি ঘরে ঢুকতেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল। মেয়েটি কুন্তলার সামনে গিয়ে মুখটা তুলে ধরল, নাকের কাছে হাত রাখল, একটু জল দিল ওর মুখে। তারপর বাইরে এসে একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'কি করে হল এরকম?' মেয়েটি বলল—'বুঝতে পারছেন না, অভাব, খেতে না পেয়ে এরকম করেছে, ছেলে হলেই তো খরচ বাড়ত।

শুনে মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে গেল।

কুন্তলার ছেলে দু'টো চীৎকার করে, মা, মা করে কাঁদছে। মেয়েটি ওদের সরিয়ে নিয়ে এল। বুকের কাছে নিয়ে বোঝাতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

যে ছেলেটি বাইরে চলে গিয়েছিল সে ফিরে এল ডাক্তার নিয়ে। ডাক্তার ভেতরে এল, নেড়েচেড়ে দেখল তারপর বলল, 'অসম্ভব, আর বাঁচানো যাবে না, ইন্‌জেকসন নিতেই পারবে না, একেবারে রক্ত নেই শরীরে তারপর এখনো ব্লিডিং হচ্ছে। "বাইরে যেতে যেতে ডাক্তার বলল 'আর কয়েক মিনিট।'

সত্যি মিনিট কয়েকের মধ্যে কুন্তলা মারা গেল। ছেলেটি মাথা উঠিয়ে দেখল, মেয়েটি দরজায় মাথা রেখে কাঁদছে—দু'গাল বেয়ে ওর জল পড়ছে।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অপসৃয়মাণ রাত্রির পাখায় বাজ্‌ছে একটা একটানা বিষাদের সুর। সব নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে বাঁশ কাটার শব্দে এ স্তব্ধতা ব্যাহত হচ্ছে। ওদিকে আধ আলো অন্ধকারে কুন্তলার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে ও যেন ঘুমুচ্ছে। এদিকে মেয়েটি তখন ভাবছে—"কুন্তলা তুমি কেন মারা গেলে! কেন এ আত্মহত্যা! কাকে দোষ দেব এর জন্যে! তুমি কি দেখলে না আর কোন পথ? বাঁচবার, বাঁচাবার আর কোন সম্ভাবনাই কি তোমার ছিল না? এই তো একটু পরে ভোর হ'বে। আগামী কাল সূর্য উঠবে, নতুন সূর্য, টকটকে লাল আলোয় অপরূপ হয়ে উঠবে আমাদের পৃথিবী। নতুন সূর্য-সম্ভাবনা—সে কি আর বেশী দূরে? কে ঠেকিয়ে রাখবে এ জাগরণকে? এ অন্ধকার তো কেটে যাচ্ছে—দেখ না দিকে দিকে তারই আয়োজন···তার পদধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠছে, একটু পরেই ভোর হবে···নতুন সূর্য-সম্ভাবনা। সুমিতার দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

ভোর হয়ে আসছে—এবার শ্মশানযাত্রা।

অমৃতকুমার দত্ত

নাস্তিক

তনু বলে: "আমি জানি না অতনু, কেমনে মানিব তারে ?
তনুর ওপারে যে-অতনু তারে কেহ কি জানিতে পারে ?"
তবু তনু জানে—মানে যুগে যুগে,
তাই আজো বাঁশি বাজে বুকে বুকে,
তোমারি প্রণয়-জয়-যৌতুকে—
একথা বলিব কারে ?
তোমার অতনু না বহিলে তনু—তনু কে সহিতে পারে ?

মন বলে: "চিনি মানস-মোহিনী চিন্তা চঞ্চলারে ;
মনের ওপারে যে-অচিন তারে কে বলো চিনিতে পারে ?
তবু মন-কূলে মনের অতীতে
তুমি চমকাও চাহনি-চকিতে
মন তারি আলো বিলায় নিভৃতে—
একথা বলিব কারে ?
মনে তুমি ফুল না ফুটালে—মনোমালা কে গাঁথিতে পারে ?

হে চির-শ্যামল, যত সুকোমল সুর প্রাণে ঝংকারে,—
তোমারি বাঁশির আনে রেশ—তাই সুরে সাধি সুরপারে।
জানে না তোমারে তবু ত্রিভুবন,
রূপ রাসে পায় অরূপের ধন,
বিরহে—মিলন, মরণে—জীবন
একথা বলিব কারে ?
"নাই নাই" —বলি, তবু উচ্ছলি অধরার অভিসারে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পুস্তক-পরিচয়

সোভিয়েট কথাসাহিত্য

The Fall of Paris. By Ilya Ehrenburg. Hutchison & Co. (Publishers) Ltd. 10/6d.

The Rainbow—By Wanda Wasilewska.

Soviet Short Stories (2nd series) 1942—43. The Pilot Press Ltd. London. 3/6 d

সোভিয়েট জনসমুদ্রে তিনটি বড় বড় আলোড়ন এল। প্রথমটি পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের আশাতীত সাফল্যের আনন্দ। দ্বিতীয়টি কিরোভ হত্যার পর অপ্রত্যাশিত গৃহশত্রুর আবিষ্কারে কঠিন আত্মজিজ্ঞাসা, ও তৃতীয়টি সশস্ত্র নাৎসি আক্রমণের প্রতিপক্ষে আবাল বৃদ্ধ সমগ্র দেশবাসীর সমুত্থান।

এই আলোড়ন থেকে শিল্পী আর সাহিত্যিকেরা বিচ্ছিন্ন রইল না, তারা অজস্র রচনায় সারা দেশ ছেয়ে ফেলল। অনেক রচনা হল কাঁচা, সংবাদ-সাহিত্যের মত সাময়িক, কিন্তু সেই সঙ্গে বহির্জগতকে বিস্মিত করে আবির্ভূত হল আর এক প্রকৃতির অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন শিল্পবস্তু।

তৃতীয় আলোড়নটির পর বোধ করি আর একটি নূতন আবর্ত্তন আসবে যখন বিজয় উৎসবের উন্মাদনায় রাহুমুক্ত জনসাধারণ নূতন উদ্যমে গঠন কার্য্যে নিযুক্ত হবে। তখন শিল্পীদের তুলিতে আর এক ধরণের ছবি ফুটবে সন্দেহ নাই কিন্তু শিল্পের নিজস্ব উৎকর্ষের কোন হানি হবে না।

সোভিয়েট শিল্পীরা জেনেছে যে তারা সাহিত্যকে, শিল্পকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রেখেছে বলেই সফল হচ্ছে ওদের প্রচেষ্টা। এ ধারণা ওদের মর্ম্মগত। ওদের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ সহজ আর প্রত্যক্ষ ঐ কারণেই। শিল্পীকে অতিরঞ্জন বা অতিভাষণের আশ্রয় নিতে হয় না, যেহেতু সোভিয়েট জীবনদর্শনে প্রেম, প্রীতি, বীর্য্য, বাৎসল্য ইত্যাদি সুস্থ ও সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি একান্ত সমাজসাপেক্ষ। আমাদের বিস্ময় লাগে যখন দেখি ব্যক্তি বিশেষের অন্তর্লোক যৌথজীবনের কল্যাণে কতখানি উন্নত হয়ে উঠতে পারে।

সোভিয়েট যৌথ জীবন ব্যক্তিত্বের পরিপোষক হলেও আত্মকেন্দ্রিক নয়। বহির্জগতের প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে ওদের রয়েছে নাড়ীর টান। শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থাতে যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল তাইতে অনেকের মনে সংশয় জেগেছিল বটে কিন্তু স্পেনের গৃহ-বিপ্লবের সময় থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রকর্ত্তারা অস্পষ্ট রাখেননি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী। ফাশিষ্ট ও ফাশিষ্ট-বিরোধী এই দুই শক্তির সংঘর্ষ যে সমস্ত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখা ছাপিয়ে যাবে সে কথা শুধু কর্ত্তারা জানত না, জানত সারা দেশবাসী জনসাধারণ—তাইত তারা প্রস্তুত থাকতে পেরেছিল। শিল্পী ও সাহিত্যিকরাও সেই সঙ্গে অত্যন্ত সচেতন হয়ে দেখেছিল সংঘর্ষের প্রকৃত রূপ, তার গভীরতা ও বিস্তৃতি।

আলোচ্য গ্রন্থ তিনখানির প্রথমটি হচ্ছে তাদের একজনের দৃষ্টিতে বিধৃত ফরাসী দেশের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। এরেনবুর্গ মাত্র তিন বছর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতের ভেতর দিয়ে দেখিয়েছেন কেমন করে ফরাসী রাষ্ট্রের মত প্রাচীন ও প্রতিভাশালী শক্তি ধ্বংস হয়ে গেল ফাশিষ্ট শক্তির সংঘাতে। সে সংঘাত সম্মুখ সমরের মত সুস্পষ্ট নয়। তার সূচনা হয়েছে যুদ্ধ বাধবার বহু পূর্ব্বে, যখন হিট্‌লারের বিশ্ববিজয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তন হয় সেই সময় হতে।

সোভিয়েট বিশ্বাসঘাতকদের জবানবন্দিতে জানা গিয়েছিল যে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকর্ত্তারা যখন তথাকথিত দুর্ব্বল ও দুঃস্থ জার্ম্মানীর সহানুভূতিতে পুকুর পরিমাণ অশ্রু ত্যাগ করছে তখন হতেই কূটবুদ্ধি নাৎসি গুপ্তচরেরা সেই সকল রাষ্ট্রেরই সন্ধিস্থানে বিষ প্রয়োগ করে এসেছে।

সেই বিষের প্রক্রিয়াই হচ্ছে প্রথম আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। রাজধানী প্যারিসের বৈচিত্র্যময় দরিদ্র পল্লী ও ধনীর প্রাসাদগুলি তখন নির্ব্বাচনের উত্তেজনায় সমানভাবে উদ্বেল, বক্তৃতায়, বিতর্কে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেছে, এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কয়েকটি অর্থপূর্ণ চরিত্র চয়ন করে গ্রন্থকার সুরু করেছেন তাঁর কাহিনী।

ধনীপুত্রের গরম গণ-প্রীতি, নবীন ইঞ্জিনিয়ারের দুর্বার সমাজসেবার আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনা, শান্তিপ্রিয় চিত্রকরের ঔদাসীন্য, অভিজ্ঞ শ্রমিক নেতার সন্দেহপ্রবণতা, সভাভঙ্গকারী ফাশিষ্ট গুণ্ডার দুষ্কর্ম্ম, লক্ষপতি কারখানা-মালিকের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বহু বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রী-

মণ্ডলী গঠিত হল এবং অনতিকালের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল বিবিধ স্বার্থের, আত্মগরিমার ও কুসংস্কারের হীন সংঘর্ষ।

প্রতিবেশী স্পেনের দুর্দ্দিনে ফাশিষ্ট গুপ্তচরের দল ছলে, বলে, কৌশলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এমন এক ভীতিপূর্ণ আশঙ্কা সৃষ্টি করে তুলল যে মালিক ও ধনিক সম্প্রদায় চিরন্তন শত্রু জার্ম্মানীর কথা ভুলে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল শ্রমিক দমনে। ফরাসী শ্রমিকদের দিবাস্বপ্ন চূর্ণ হল। উপর্য্যুপরি কয়েকটি ধর্ম্মঘটের পর বিফল হল সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী। এদিকে ফাশিষ্ট ষড়যন্ত্র ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে গ্রাস করে নিল অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা, চেকোশ্লোভাকিয়া বিপন্ন হল কিন্তু তখনও উদারপন্থী সংবাদ-পত্র সমূহ উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করে চলল চেম্বারলিনী শান্তি অভিযানের সাফল্য আর হিটলারের ঔদার্য্যের কথা।

এর পর চরম লাঞ্ছনার কাহিনী হচ্ছে সর্ব্বজনবিদিত। এরেনবুর্গ তাঁর রচিত চরিত্রবর্গের ঘাত প্রতিঘাতে ইতিহাসের এই বিষাদময় অধ্যায়টিকে শাশ্বত করে তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অজ্ঞান ঔদার্য্য ও অন্ধ জাতীয়তাবাদের যুগ্ম প্রভাব কেমন করে সবল সুস্থ জনতাকে অবলীলাক্রমে বিপথগামী করে দেয়; দেখিয়েছেন শ্রেণীগত স্বার্থ-সংঘাতের অন্তরালে ব্যক্তি বিশেষের আদর্শ আশা ভরসা কেমন করে শোকাবহ নৈরাশ্যে পরিণত হয়। সমসাময়িক ঘটনাবলীর নিষ্করুণ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর চরিত্রগুলি তাদের অন্তঃস্থ পরিণতির দিকে অবারিত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই আশ্চর্য্য কৃতিত্ব এরেনবুর্গকে সাংবাদিক লেখক থেকে প্রথম শ্রেণীর কথকে উন্নীত করেছে।

'রেন-বো' উপন্যাসটি হচ্ছে ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের মত এখানিও সাহিত্যিক উপকর্ষের জন্যে ষ্টালিন প্রাইজ পেয়েছে। রচয়িতা ওয়াণ্ডা ওয়াসিলেউস্কা হচ্ছেন সোভিয়েট-বাসী পোল সম্প্রদায়ের সভানেত্রী এবং উচ্চতম সোভিয়েট মন্ত্রণা-সভার ডেপুটি। তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনে সাহিত্য রচনা করবার অবসর কম এবং সেইজন্যই বোধ করি স্বাভাবিক স্ত্রী সুলভ সূক্ষ্ম ও সবিশেষ বর্ণনার ঝোঁক সংহত হয়ে তীব্র হয়েছে।

মাত্র দুইশত পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসর আধারের মধ্যে বিবৃত হয়েছে নাৎসি জার্ম্মানী-অধিকৃত এক সোভিয়েট গ্রামের মর্ম্মকথা। পল্লীটি অকিঞ্চিৎকর

সহস্র লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত জনপদের মধ্যে মাত্র একটি। সবল ও সুস্থ পল্লীবাসীরা জঙ্গলে পালিয়ে প্রচ্ছন্ন গেরিলা বাহিনীতে যোগদান করেছে। শিশু বৃদ্ধ ও নারীর ওপর পড়েছে পরাধীনতা অস্বীকার করবার দায়িত্ব। অব্যক্ত নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও বশ্যতা স্বীকার করল না তারা। তারপর আকস্মিক দুর্য্যোগের অবসানে চক্রবালের রামধনুর মত দেখা দিল লাল পল্টনের দল। সকলের সমবেত চেষ্টায় বিনষ্ট হল নাৎসি শত্রু বাহিনী।

গ্রন্থখানি প্রথম হতেই পাঠককে অভিভূত করে ফেলে। বিকারশূন্য অদ্ভুত নির্ম্মমতার ভঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে এক বৃদ্ধার কথা যার কুটীরে জার্ম্মান সেনাধ্যক্ষ নিজের রক্ষিতাকে এনে রেখেছে। কুটীরের মালিককে অনাহূত অতিথিদ্বয়ের পরিচর্য্যা করতে হয়। তাকে তুষারমণ্ডিত মাঠ পেরিয়ে নদীতে নামতে হয় জল তুলতে। ফিরতে বিলম্ব কেন হয় সে কথা জানতে পেরে দুশ্চরিত্রা অতিথিটি শাসিয়েছে যে বলে দেবে। বৃদ্ধার অপরাধ হচ্ছে যে সে গোপনে প্রহরীদের অলক্ষ্যে গিয়ে পুত্রের মৃতদেহ হতে কাক তাড়িয়ে বেড়ায়, সযত্নে সরিয়ে দেয় মাথার চুল। যে যুবকেরা শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করে বিজয়ী নাৎসি সেনার বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছে তাদের সৎকারের উপায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে সৎকার ব্যবস্থার চেষ্টা ক'রে গ্রামবাসীরা মৃতদেহের সংখ্যা বাড়িয়ে নিবৃত্ত হয়েছে। দিনের বেলা ওদিকে যাবার উপায় নাই। একমাত্র বৃদ্ধার গতিবিধি উপেক্ষিত হয় যেহেতু সে হচ্ছে সেনাধ্যক্ষের খাস রক্ষিতার পরিচারিকা। বৃদ্ধা অনর্গল কথা বলে প্রাণহীন বিবর্ণ দেহের সঙ্গে। ফিরে এসে নীরব ঘৃণায় অতিষ্ঠ করে তোলে রক্ষিতাটিকে।

বৃদ্ধার গোপন কথা ব্যক্ত হবার পূর্ব্বেই সেনাধ্যক্ষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল এক মেয়ে গেরিলাকে নিয়ে। বিগতযৌবনা প্রৌঢ়া রমণীকে গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছিল প্রসব হতে। ধরা পড়ে গেল। নাৎসি হেড কোয়াটার্স সংবাদ চায় কিন্তু নরম গরম কোন উপায়ে আদায় হল না একটিও কথা। তখন ব্যবস্থা হল অমানুষিক অত্যাচারের। অনাহার ও শীতক্লিষ্ট নগ্ন দেহটি যখন বেয়নেট ফলাকায় রুধিরাক্ত তখন জন্ম হল শিশুর। তারপর নাৎসি বর্ব্বরতা চরমে উঠল যখন মাতৃস্নেহের পরীক্ষা হল সুরু। নবজাত শিশুর নরম খুলি পিস্তলের বারুদে চূর্ণ হল তবু খসল না একটি কথা। সোভিয়েট গেরিলা

দেখিয়ে দিল সে কোন ধাতুতে গড়া। অসহিষ্ণু নাৎসির অস্ত্রাঘাত বক্ষে বহন করে তলিয়ে গেল তুষার ভাঙ্গা নদীর জলে।

এই দুইটি ঘটনাকে অবলম্বন করে গ্রামবাসীর অনেক আত্মোৎসর্গের কথা ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে বালক বীর মিশকার মৃত্যু ও মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে তার মাতার ধৈর্য্য ও সাহস, ছোট ছোট ভ্রাতা, ভগ্নীর ব্যবহার পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। নাৎসি জার্ম্মানীর পাশবিকতার জ্বালাময় বর্ণনা সত্ত্বেও রচনা চিত্তাকর্ষক হয়েছে যেহেতু পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নূতন যুগের প্রবল জীবনীশক্তির প্রতি। সংগ্রামের বৃহত্তর রূপটিই তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যদিচ গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের আত্মোৎসর্গের নিবিড় বর্ণনা।

এক এক স্থানে সে বর্ণনা হয়েছে অসহনীয়ভাবে তীব্র। এই প্রকৃতির রচনা বোধ করি একমাত্র স্ত্রীলোকের দ্বারাই সম্ভব। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগটি অতিরিক্ত দ্রুত ও শিথিল-বন্ধ হয়েছে ঐ একই কারণে। সামরিক অভিযানের ব্যাপকতার চিত্র অঙ্কনে ব্যক্তি বিশেষ উপেক্ষিত হতে বাধ্য এবং রচয়িতা সেইজন্য প্রথম দিকের আবহ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। আমার এ অনুমান অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। হয়ত নিষ্কৃত গ্রামবাসীর আনন্দোচ্ছ্বাসকে জমাটবদ্ধভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হত না অথবা গ্রন্থের ভারসাম্য বজায় রাখবার খাতিরে বিষয়বস্তুর বাস্তবতাকে খর্ব্ব করা সমীচীন বোধ করেননি গ্রন্থকর্ত্রী। কারণ যাই হোক, সাহিত্যরসিক নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রই নিরাশ হবে তাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থ তিনটির শেষটির কথা স্বতঃই ওঠে।

সোভিয়েট গল্প সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে প্রায় অধিকাংশ রচনা হচ্ছে বিজয়ান্ত। নায়ক বা নায়িকা ফাশিষ্ট আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য কোন বিপদ হতে পশ্চাৎপদ হয় না কিন্তু বিপদ যখন আসে তখন সে জীবন ত্যাগ ক'রে বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে যায় না। সে বেঁচে থেকে জয়যুক্ত হয়ে ঘোষণা করে আদর্শের মহত্ত্ব। সংশয় কিম্বা বিষাদের রেশ সৃষ্টি করে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করা তাদের কাজ নয়। এই ভাবটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে 'থার্ড্ এ্যাড্জুটাণ্ট' গল্পটিতে। যে প্রকৃত বীর তার মৃত্যু নাই এই ধারণাটি জনৈক সেনাধ্যক্ষের ছিল আন্তরিক বিশ্বাস। নবীন ইউক্রেনিয়ান

গল্পকার সিমনভ সেই ধারণাটিকে অবলম্বন ক'রে অনুপম সাহিত্য রচনা করেছেন।

সোভিয়েট ছোট গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নায়ক নায়িকার প্রশান্ত-চিত্ততা। শত্রুকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করতে যেমন অনুমাত্র দ্বিধা বা অনুশোচনা বোধ নাই তেমনি আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যুতে দুঃখবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলে না কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে। বস্তুত সমস্ত রচনার ভেতর একটি সবল প্রসন্নতার ধারা দৃষ্ট হয়। এমন কি যেখানে রচনার প্রসঙ্গ হচ্ছে প্রতিহিংসা এবং বৈর নির্যাতন হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য সেখানেও অক্ষুণ্ণ প্রফুল্লতা বিরাজ করে লিখনভঙ্গীর অন্তরে। শিরোলেভ-এর 'দি ব্লু স্কার্ফ' গল্পটিকে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। প্রতিহিংসার এইরূপ শান্ত ও প্রফুল্ল চিত্র পূর্ব্বে কখনও দেখিনি।

অবশ্য গল্পগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। 'ইনসাইড দি হার্ট' ও 'পার্টি কার্ডস্' গল্পে ওয়াণ্ডা ওয়াসিলিউস্কা দেখিয়েছেন ফাশিষ্ট-বিরোধের দুইটি বিভিন্ন দিক। প্রথমটি হচ্ছে জনৈক বৃদ্ধার আত্মোৎসর্গের সংহত বর্ণনা, দ্বিতীয়টি মেশিনগান ঘাঁটিতে নবীন যুবক ও যুবতীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয়—এই গল্পটির নাটকীয় সম্পদ প্রণিধানযোগ্য।

গল্পগুলি আয়তনে ছোট, কতকগুলি অভিনয়ের অথবা আবৃত্তির যোগ্য। বিশেষ করে পনের মিনিট সীমাবদ্ধ জীবনকালের মধ্যে রচিত পত্রখণ্ডখানি। কর্ত্তব্যে উৎসৃষ্ট অন্তরাত্মার এতখানি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ কদাচিৎ দেখা যায়। কতকগুলি গল্প বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। সোভিয়েট সাহিত্যের বহুল প্রচলন বাঞ্ছনীয় এবং সেই জন্যই আমার মনে হয় কেবলমাত্র মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় না করে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে প্রকাশ করা উচিত সে-সাহিত্যের প্রকৃত মর্ম্ম। আমার এ আবেদন পিপল্‌স থিয়েটারের নবীন উৎসাহী কর্ম্মীদের উদ্দেশে নিবেদিত হল।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

কবিতা

জুপিটার—শ্রীমতী বাণী রায়। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস্ কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। ৫৮ পৃষ্ঠা, রয়েল অক্টেভো সাইজের।

পুস্তিকাখানি বিদগ্ধা লেখিকার রচিত ষোলটী কবিতার সঞ্চয়ন। কাব্য সাধনার এই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই লেখিকা যে আধুনিক সাহিত্যিক মানসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে শুধু উপভোগ্য তাহাই নহে, প্রশংসনীয় বটে। পুস্তিকার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই সঞ্চয়িত কবিতাগুলির একটা বিশেষত্ব এই যে তাহাদের বিষয়-বস্তুর উপাদান, রূপক ও ভাব-সঞ্চারী পরিমণ্ডল অনেকাংশে প্রাচীন ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ও পুরাণ হইতে আহৃত। আঙ্গিক হিসাবে এই আহৃতিকে অতুলবাবু সন্দিগ্ধ না হউক সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং এই সতর্কতা সম্বন্ধে আমাদের মতও অতুল বাবুর মত হইতে অভিন্ন! তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাস শ্রীমতী বাণী রায়ের এই কবিতা কয়টীকে "সাহিত্যিকের সাহিত্য" অভিধায় বর্ণনা করিলে একদিকে যেমন ঐ প্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিকে যথার্থ অভিনন্দন করা হয় না, অন্যদিকে তেমনি এই বিদগ্ধা লেখিকার বিদেশী সাহিত্যের ঐতিহ্য-ভারাক্রান্ত রচনায় অন্তর্নিহিত কবি-মানসের সহিত পাঠকের যথার্থ পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয় না।

> বিজাতীয় ভাব রক্তে বহে খরতর
> স্বদেশ ত্যজিয়া বিদেশের পথে পথে
> করি বিচরণ—

এই যে আত্মোক্তি ইহা অনেকাংশেই নাটকীয় এবং যতটা ইহা lyric ততটা ইহা ব্যর্থপ্রাণের অজ্ঞাত বিরুদ্ধ দৃষ্টি-ভঙ্গি। বাণী রায় বিদেশী ঐতিহ্যে মসৃণ হইলেও তাঁহার কবিতার উৎস এই ঐতিহ্য নয়, প্রকৃত পক্ষে উৎস তাঁহার কবিমানসের অসার্থক প্রেমাভীপ্সা!—বাণী রায়ের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে এই অতৃপ্ত মানস কুঁড়ির ভিতর গন্ধ হইয়া কাঁদিতেছে না, সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলের মধ্যে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া মানস-সঙ্কটকে লঘু ও তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই,

তোমার কবিতাগুলি
সহস্র যুগের বিস্মৃতি ঠেলি
আমারে ডাকিয়া যায়
বর্ত্তমানেরে ভুলি।

তাই, অতৃপ্ত প্রেমিকার যদি নরক-ভোগও হয়, তাহাতে শান্তি এই যে

দান্তের নরক-দৃশ্য ভাসে চোখে চোখে
ভার্জিলের মহাগীতিগুলি কানে কানে।

তাই আবার, "শেষ বিচারের দিনে"ও নরকের পথ-হাঁটা জুপিটার, ক্রাইষ্ট, ইন্দ্র ও উর্ব্বশীর সাহিত্যিক কাহিনীর স্মরণে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠে। তাই, প্রেমাস্পদ ইহজন্মে অন্য ব্যক্তির পার্শ্বে জানিয়াও ক্ষতি নাই যতক্ষণ

নীল নদে নীল জ্যোৎস্না
রূপা-গলা নদী
রহস্য-আবাস স্তব্ধ সমাধি ভবন ;
স্তরে স্তরে কবরের নির্ম্মাণ-কৌশল
অলিন্দে, স্তম্ভেতে কীর্ণ ফ্যারাউর নাম ;
আমনের বন্দনায় উদ্ধত দেউল

এর চিত্র কবি মানসকে ভরপুর করিয়া রাখিতে পারে। বাণী রায়ের মন সম্পূর্ণ আধুনিক, রোমীয়-দেবীর প্রশস্তি যতই তাঁহার কবিতায় থাক, তাঁহার কোন পেগান দৃষ্টি নাই, এমন কি পেগান দৃষ্টির ধী-সর্ব্বস্ব উপলব্ধিরও অভাব আছে, যেমন তাঁহার "জুপিটার" কবিতাতে। জুপিটার দেব-পিতা, তাঁহাকে সেমিলির কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমের দেবতা চিত্রিত করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কবিতা-সংগ্রহটীর "জুপিটার" আখ্যাই হইয়াছে আমাদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রমের ব্যাপার।

বিদেশী সাহিত্যের ঐতিহ্যে আত্ম-বিলোপের চেষ্টা যতই থাক, তরুণী-কবি তাঁহার মানস-স্বরূপকে প্রচ্ছায়িত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। "প্রেত-পুরী" কবিতায় তাহার আত্ম প্রকাশের বাণ ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অসার্থক প্রেমিকা হৃদয়, সে'ত যেন প্রেতপুরী ;

প্রেতগ্রস্ত পুরী আমি, চির নিশিদিন
জীবনের বালুতটে জাগি সঙ্গীহীন।

* * *

কত যে এসেছে গেছে
সকাল বিকাল, আজও স্মৃতি-সুরভিত
কত ভাঙা সুর
অন্দরে গুঞ্জরে মম বেদনা বিধুর
কত মধুনিশি
প্রাসাদের শীর্ষচূড়ে জেগেছে নিবিড়
ছায়া করে ভিড়
আজ সেথা, যেখানেও ছিল জনসভা

এই কবিতার রূপক-পরিকল্পনাটী যেমন সুন্দর, ভাবের প্রকাশও তেমনি স্বচ্ছ ও সাবলীল—এক হিসাবে এইটীই পুস্তিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা। "চরম বিচারের দিন" ও "একটী বিয়োগান্ত নাটক" কবিতা দুইটীতে লেখিকার রচনা-আদর্শ উচ্চ হইলেও সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করে নাই। প্রথমোক্তটীর অন্তর্নিহিত রূপক-মর্ম্ম একেবারেই অগ্রাহ্য, দ্বিতীয়টীতে লেখিকার লিরিক ও নাটকীয় mood-এর সংমিশ্রণ ইহার প্রকাশ-ঋজুতাকে অনেকখানি খর্ব্ব করিয়াছে। কিন্তু বাণী দেবীর কবি-মানসের সঙ্কটের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইয়াছেন তাহাদের কৌতুহলের কোথায়ও বিরতি হইবে না।

গণ্ডেতে রুজ আঁকা
শিফনে শরীর ঢাকা

উচ্চ হীলের ভঙ্গিমা যেন লাট্টুর ঘোড় দৌড়—এই যে বিচিত্র প্রসাধনে চিহ্নিত আধুনিক বিদগ্ধা নারী—তাহার অসার্থক প্রেম-জীবনের নিরাশা-বেদনার সাহিত্যিক স্বরূপের সহিত যাঁরা পরিচিত হইতে চান, তাঁহারা এ কয়টী কবিতাতে সেই পরিচয়ের যথেষ্ট উপাদান যে পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণী রায়ের কবিতাতে ব্যর্থতারই রূপ, সার্থকতার সন্ধান নাই। তাহাতে আসিয়া যায় না, কেননা কাব্যের reality প্রকাশের, জ্ঞানের বা বিশ্লেষণের নয়। বাণী রায়ের একটী চমৎকার সাহিত্যিক মন আছে। রচনায় দোষ ত্রুটির অভাব নেই, তাহা হইলেও তাঁহার ভবিষ্যৎ সাধনা ও সার্থকতার যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

পথের পয়গাম—মীজানুর রহমান। কিতাব-মহল, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

পথের পয়গাম প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দিকে রহমান সাহেব দার্শনিক কবি এক্‌বালের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং পরবর্ত্তী অংশে কবির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবগর্ভ কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন।

জীবনী সম্বন্ধে তিনি কবির জন্ম থেকে তাঁর শৈশব, শিক্ষা, অধ্যাপনা, চরিত্র-বৈচিত্র্য ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনাগুলি পাঠকের নিকট অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মনে হলেও, এগুলি সারগর্ভ এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সূচনা করে।

অনূদিত কবিতাগুলির রস সর্ব্বত্রই অব্যাহত। ভাষার দুরন্তপনা ও জটিলতা না থাকায় পাঠকের রসানুভূতিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। 'ভুলনাক মানবতা', 'নাহি ভয়', 'এই দুনিয়া আখেরাতের খেৎ-খামার', 'মোদের হিন্দুস্তান', 'জনমভূমির ধূলি দেবতা আসল', 'নীরব হউক বিশ্ব ব্যথায় বিভোল' কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মূল উর্দ্দু শব্দের সঙ্গে বাঙালী আমাদের ঘনিষ্ঠতা অল্প থাকায়, রহমান সাহেবের বহু ব্যবহৃত উর্দ্দু শব্দগুলির অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে মধ্যে মধ্যে সাধারণ পাঠকের অসুবিধা হবে। রহমান সাহেব যখন বাঙলা ভাষাতেই এই গ্রন্থ রচনা করলেন, তখন এই উর্দ্দু শব্দের বাহুল্য বর্জ্জন করলেই আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আরোও খুশী হতাম।

আশা করি কবি এক্‌বালের জীবনী সম্বন্ধে জানবার পক্ষে এই গ্রন্থখানি বহুজনের নিকট সমাদৃত হবে।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

জীবনী

হেমলতা ঠাকুর—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। মূল্য—এক টাকা।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের কুলবধূ স্বর্গীয় দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরের জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে এই গ্রন্থটি রচিত।

দার্শনিক মনীষী স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একসময় যে লিখেছিলেন, 'জয়ন্তী ভারতের একটি সুপ্রচলিত প্রাচীন উৎসব। জন্মদিনে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গুরুজন ও অনুরাগিগণের শুভ ইচ্ছা, আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম জীবনযাত্রার পথ জয়যুক্ত করিয়া দেয়। সেইজন্য দেশের ও দশের প্রিয়, গণ্যমান্য এবং বীরপুত্রগণের আমরা জয়ন্তী করিয়া থাকি। জয়ন্তী করা শাস্ত্রানুমোদিত লোকাচার ও দেশাচার।' কথাটি অত্যন্ত সত্য; বিশেষ ক'রে এইরূপ মহীয়সী মহিলা বা মহৎ ব্যক্তিগণের সম্পর্কে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজ্য।

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরের জীবন-কাহিনী আবাল্য থেকেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একদিকে তিনি যেমন রাজবংশের, অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় পরিবারের কন্যা, অপর দিকে তেমনি তিনি প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর পরিবারের কুলবধূ। শিক্ষা, জ্ঞান ও কৃষ্টির দিক থেকে উভয় পক্ষই ছিলেন তৎকালীন হিন্দু-সমাজের নাম করা অভিজাত এবং সেদিক থেকে এই রাজযোটক মিলনও তাঁর জীবনকে বহুবিধ মনোহারী বৃত্তিতে সুশোভিত ক'রে তুলতে সাহায্য করেছিল যথেষ্ট। এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব চরিত্র মাধুর্য্যে, শিক্ষায়, সেবায় ও ব্যবহারে তিনি ছিলেন একান্ত অনুপমা। তাঁর মধ্যে যেমন দেখা যায় গার্হস্থ্য জীবনের সুশৃঙ্খল কমনীয়তা, তেমনি অন্যধারে দেখা যায় কর্ম্মজীবনের দৃঢ় একনিষ্ঠতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের নিরন্তর সান্নিধ্যে থাকার ফলে, তাঁদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের বহু জিনিস তাঁর জীবনেও বহুভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং নানা ভাবে জীবনকে দেখবার তাঁর সুযোগ ঘটেছে। সাধারণতঃ খুব স্বল্পসংখ্যক বাঙালী মহিলার মধ্যেই ঠিক এই ধরণের প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের বাহিরে বহুদেশ ভ্রমণ, বহু বিখ্যাত প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যলাভ, বহু গ্রন্থের রচয়িতা, সম্পাদিকা, কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্না, দেশের ও দশের কাজে নারী-সেবায় উৎসর্গপ্রাণ, সুবক্তা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরের জয়ন্তী-উৎসবের এবং সেই সঙ্গে তাঁর কর্ম্মময় জীবনের কিছুই যাঁরা জানতেন না, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ প্রকাশের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। লেখকের পরিশ্রম সেদিক থেকে সার্থক। গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত, বিশেষ ক'রে মহিলাদের। কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বাঁকা মন

বাঁকাস্রোত—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। মিত্রালয়। ৩।০।

বাহিরের বর্ণ, গন্ধ, গান যেমন নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়ের অঙ্গণে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে এবং আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদাই আমাদের চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ করিয়া রাখিতেছে তেমনি আমাদের অন্তরের ভাবের স্রোতও নিরন্তর বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছে। এই ভাবের স্রোত একদিকে যেমন তরুগুল্মলতামণ্ডিত প্রকৃতির শোভা সম্পদের দিকে প্রবাহিত হয় অপর দিকে তেমনি মানুষেব অন্তরের সহিত মিলিবার জন্য ও অপর মানুষের নিকট আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনটা একান্তভাবে কেবল আমাদেরই মন নয়। বাহিরের লোক-সমাজের নানাপ্রকার চিন্তা ও সংস্কার আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের মনের তটভূমির প্রান্তে এমন পলি জমাইয়া রাখে যে আমাদের অন্তর্মনের স্বচ্ছন্দ স্রোত বাহিরে প্রকাশ লাভ করিতে গেলে অনেক সময় হয়ত এই পলির মধ্যে একেবারে আটকাইয়া যায়, নচেৎ বাধা পাইয়া বক্র গতিতে বাহিরে ছুটিয়া আসে। আমরা জানি আলোকের সরল স্রোত বায়ুমার্গে বিচরণ করিতে করিতে যদি জলের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সেই সরল স্রোত বাঁকিয়া যায়, লাঠিখানা জলে ডুবাইলে বাঁকা দেখায়। তেমনি আমাদের মনের স্বচ্ছন্দ স্রোত যখন সমাজলোকের মনের মধ্য দিয়া বাহিরে প্রকাশ লাভ করিতে চায় তখন হয় তা যায় স্তব্ধ হইয়া না-হয় যায় বাঁকিয়া। আজকালকার ইউরোপীয় রহশ্চিত্তজ্ঞেরা (psycho-analysts) এ সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা ও ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে আমাদের গোপন মনের স্রোত যখন তাহার গোপন প্রবৃত্তির উদ্দামতায় ও আনন্দে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ লাভ করিতে না পারিয়া অন্তরের মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া যায় তখন নানান ব্যাধির সৃষ্টি করে। তাঁহারা বলেন যে মনের বেগ ধারণ করার ফলে অধিকাংশ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এদেশে বিষয়টা অন্যরূপই জানিতাম। সেইজন্যই আমাদের শাস্ত্র চিত্তনিগ্রহকে এত উচ্চ স্থান দিয়াছেন।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে আলোচনা বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় নয়। "বাঁকাস্রোত' বইখানি এই বাঁকামনের লীলা লইয়া লিখিত। ছেলেবেলায় মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া মাতৃস্নেহের ক্ষুধায় একটি বালক জর্জ্জরিত হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে সেই ছেলেটি একটি কিশোরীকে ভালবাসিত এবং সেই কিশোরীও তাহাকে ভালবাসিত অথচ সেই কিশোরীর বিবাহ হইয়া গেল একটি ধনী মদ্যপের সহিত। জীবনের প্রারম্ভে এই প্রতিকূল আঘাত উভয়ের মনকে কিরূপ বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল এবং উভয়ের মনে কিরূপ অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্য উৎপন্ন করিয়াছিল তাহারই অনেকগুলি ছবি এই গ্রন্থে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। স্বাভাবিক মনের ব্যাপার হইলে এই অসংলগ্নতা লইয়া নানা বাদ প্রতিবাদ করা চলিত কিন্তু বাঁকামনের গতি লইয়া বেশী কিছু বলা চলে না। কারণ বাঁকামনের গতির নিয়ম এখনও আবিষ্কৃত হইতে দেরি আছে। বইখানির ভাষা সুন্দর এবং বর্ণনাপ্রণালী অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

বইখানির প্রথম দিকে লেখা এত সুন্দর হইয়াছে যে শরৎবাবুর রচনাভঙ্গিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু মনের গতি যখন হইতে বাঁকা পথে ছুটিতে লাগিল তখন সকল স্থানে তাঁহার সহিত তাল রাখা যায় না। বোমার splinter এর মতন কোনখান হইতে কোথায় যে নায়কের মন ছুটিয়া চলে তাহার ন্যায়সঙ্গত হদিস করা শক্ত কিন্তু বাঁকা মনের গতি বলিয়াই হয়ত এই অনির্বচনীয়তা দূষণ না হইয়া ভূষণ হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

দুর্দিনের কবিতা

"অন্নদাতা", "নিমন্ত্রণ", "১৩৫০", "দূরের ভাই", "অন্নদাও"—অমিয় চক্রবর্ত্তী।

প্রচ্ছদপট ও ছাপা সুন্দর, রচনার বিষয়বস্তু যেরূপ হৃদয়স্পর্শী ও সময়োপযোগী রচনাপদ্ধতিও তদনুরূপ। সাময়িক ও স্থানীয় অবস্থা ভিত্তি করিয়া লিখিত হইলেও ইহাদিগকে ephemeral বা ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যের পর্য্যায়ে

ফেলা যায় না। অসহায় দুর্গতদিগের জন্য করুণ সাহিত্যসৃষ্টির মূলে আছে মানব হৃদয়ের চিরন্তন সহানুভূতির স্পন্দন। এই গভীর সহানুভূতির প্রস্রবণ হইতেই ব্যক্তিগত অবস্থা উপলক্ষ করিয়া সভ্যজগতে অনেক অমর কবিতা লিখিত হইয়াছে—তাহাদের স্থান নিত্যকালের সার্ব্বজনীন সাহিত্যের মধ্যে।

বাংলার ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ধ্বংসোন্মুখ দুর্গতদের প্রাণরক্ষার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু তাহাদের দুঃখবেদনাকে করুণ রসে সিঞ্চিত কাব্য-জগতে স্থান দিবার প্রচেষ্টায় অন্যতম অগ্রণী হইয়াছেন অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় —এখানেই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ও মৌলিকত্ব।

সকল কবিতাগুলিরই ভাষা ও ভাব মর্ম্মস্পর্শী, রচনাপদ্ধতি সহজ ও সরল এবং এই জন্যই সুন্দর। "অন্নদাতা" ও "অন্নদাও" এই দুইটী এক পর্য্যায়ে ফেলা যায়, দুইটীই তেজালো লেখা এবং অনেকের নিকট ভাল লাগিবে। অতি আধুনিক ইংরাজী কবিতার মত "দূরের ভাই" দুই এক স্থানে অবোধগম্য মনে হইল।

প্রফুল্লকুমার দাস

আমাদের একজন পাঠক জানিয়েছেন যে গত মাঘ সংখ্যায় "প্রাচীন গাথার রূপ ও রস" নামে শ্রীমৈনাক যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তা' ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। পত্রখানি স্থানাভাবে প্রকাশ করতে পারলাম না। 'পরিচয়ে' এরকম প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত। পত্রখানি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। পঃ সঃ

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শান্তিনিকেতন ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

১৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৫১

পরিচয়

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

উপসংহার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে প্রশ্ন, ভারতের অনার্য্যভাষীদের সহিত তথাকথিত আর্য্যভাষীদের সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলেই 'দ্রাবিড়' নামে একটি জাতির কথা উঠে। অধুনা দ্রাবিড়জাতির সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতির কথা উঠিয়াছে এবং ইহা লইয়া উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে মনোমালিন্যও সৃষ্টি হইয়াছে (১)। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'দ্রাবিড়' বলিলে একটি ভাষাকেই বুঝাইয়া থাকে। বিশপ Caldwell দ্রাবিড় ভাষার অনুসন্ধান করিয়া একখানা ভাষাতাত্ত্বিক পুস্তক লিখেন এবং সেই ভিত্তিতে একটি Dravidian Race সৃষ্টি করেন। কিন্তু আজ নরতাত্ত্বিকেরা সেই জাতির বিলোপ সাধন করিয়া ইহার পরিবর্ত্তে দ্রাবিড়ভাষীদের Mediterranean Race নামকরণ করিয়াছেন। বহুপূর্ব্বে Huxley, Fowler প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তাহাই বলিয়াছেন এবং Haddon ও তাহাই সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "Apart from the dark colour of the skin, there are many points of resemblance between the Dravidians and the Mediterranean peoples

১। একদল Patriot এর কাছে 'আর্য্য' শব্দটিই অপ্রীতিকর। দ্রাবিড় ও ভারতীয় নরতত্ত্ব বিষয়ে লেখকের আলোচনা "Races of India" in Journal of the Dept. of Letters, Vol. XXVI. Cal. Univ. 1935.

which point to an ancient connection between the two, perhaps due to a common origin (২)। মলিন গাত্রবর্ণ ব্যতীত দ্রাবিড় ও ভূমধ্য-সাগরীয় জাতিসমূহের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে যাহা উভয়ের প্রাচীন সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করে, হয়ত ইহা তাহাদের এক মূল-উৎপত্তি প্রসূত। জার্ম্মান নরতাত্ত্বিক Emile Schmidt (৩) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়দের শারীরিক মাপযোপ লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে Dravidian নামে একটা পৃথক জাতি নাই, উত্তর-ভারতীয় লোক ও দক্ষিণের আদিম অধিবাসীদের সংমিশ্রণে যেসব লোক উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদেরই "দ্রাবিড়জাতি" বলা হয়।

দ্রাবিড় একটি ভাষার নাম। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ইহার প্রচলন। মধ্য-ভারতের কতিপয় পার্ব্বত্য জাতিও এই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। এই ভাষার উৎপত্তির মূল এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। Stenkonow ইহাকে class by itself বলিয়াছেন অর্থাৎ প্রচলিত কোন জাতীয় ভাষার সহিত ইহার সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয় নাই (৪)।

অতঃপর আসে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব (Pre-Dravidian) জাতি সমূহের কথা। ইহাদিগকেই আজকাল ভারতের আদিম অধিবাসী বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সান্তালদের ভাষা Mon-khemar ভাষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্ধারিত করিতে চাহেন, কিন্তু Von Hevesy বহু তথ্য ও প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে ইহা Finno-uigric ভাষার সহিত সম্পর্কযুক্ত (৫)।

২। Haddon—'Races of Man', Pp. 107—111

৩। Emil Schmidt—'Globus' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

৪। Grierson—Linguistic Survey of India.

৫। ভাষাতত্ত্বের কোন কোন ছাত্র দ্রাবিড় ভাষাকে তাতার ভাষার সহিত সম্পর্কিত বলিতে চাহেন। জাতিতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক Lecoq লেখককে বলিয়াছিলেন যে সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক Lueders ইহাকে Tartar ভাষা সম্পর্কীয় বলেন। কিন্তু উক্ত মতটি তিনি কোথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কোন তামিলভাষী ভারতীয় তুর্কিতে তুর্কী ভাষা অধ্যয়ন কালে লেখককে বলিয়াছিলেন যে তামিল ও তুর্কি ভাষার বিশেষ মিল আছে। জনৈক জর্জ্জিয়াবাসী ভাষাতত্ত্বের ছাত্র বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার মিল আছে। কিন্তু নিশ্চিতরূপে কোন তথ্যই লিপিবদ্ধ হয় নাই। এজন্য এ-বিষয়ে ষ্টেনকানোর অভিমতই উপস্থিত শেষ কথা, যে ইহা 'নিজেই একটি শ্রেণী'।

হয়ত দ্রাবিড় ভাষা আদিম-অধিবাসীদেরই ভাষা এবং উত্তরাগত ভারতীয়েরা দক্ষিণে বসবাস করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে, এই তথ্যই একদিন অনুমিত হইবে। কিন্তু দক্ষিণে আর্য্যধর্ম্ম ও রীতির প্রচলন তাহাদের দ্বারা হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাগত লোকদের সংখ্যাধিক্য হয় নাই বলিয়া দ্রাবিড়-ভাষা দক্ষিণে আজ বলবৎ যদিচ এই ভাষার নানা উপভাষা মধ্যে সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

এখন আবার প্রশ্ন "দ্রাবিড়-কৃষ্টি" বলিয়া কোন্ একটা পৃথক কৃষ্টি আছে কিনা? যাহারা উত্তর ও দক্ষিণে ভারতের লোকদের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারাই উক্ত মতটি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আজ নর-তাত্ত্বিকেরা বলিতেছেন যে উত্তরের লোকেরা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত, আর দক্ষিণের দ্রাবিড় জাতিও তাহাই এবং বেদের কৃষ্টি-প্রসূত সভ্যতা-যুক্ত। উভয় স্থানের হিন্দুরা সৌত্রসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র নিঃসৃত ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার পালন করেন। ইহা ছাড়া, বিশেষ কথা এই যে মৌর্য্যযুগের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যেসব রাজবংশের তথায় আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের সকলেই হয় উত্তরের মহাকাব্য ও পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বীরদের সন্ততি বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এতদ্বারা এই তথ্য নির্দ্ধারিত হয় যে আর্য্য-কৃষ্টিই সেখানে রাজশক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইজন্যই বিষ্ণুপুরাণে দক্ষিণের শেষ নদী ভারতের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং বেদের 'নদীস্তুতি' সময়োপযোগী পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দুর পূজার মন্ত্রের (৬) অন্তর্গত নূতন নদীস্তুতির মধ্যে 'কাবেরী' সন্নিবেশিত হইয়া ভারতের সীমাকে সমূর্ত্ত করা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য ও খোদিত লিপি সমূহ পাঠে তথায় উত্তরের কৃষ্টিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের আচরণ মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁটিনাটির পার্থক্য আছে, কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দুর মধ্যে সেই প্রকারের প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণের 'মাতুল-কন্যা বিবাহ' উত্তরবাসীদের নিকট বীভৎস ও বিদ্‌ঘুটে ঠেকে; এবং বৈদিক-পর যুগে বৌধায়ন ও বৃহস্পতি ইহার উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

৬। 'ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা' ও 'তান্ত্রিক সন্ধ্যা'—হিন্দু সৎকর্ম্মমালা, ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

নরতাত্ত্বিকেরা ইহাকে cross-cousisin marriage প্রথারই অন্তর্গত বলিয়া নিরূপণ করেন ; ইহা অষ্ট্রেলীয় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া কথিত আছে। এইজন্য উক্ত প্রথাকে আদিম জাতীয় প্রথা বলা হয়। কিন্তু লেখক যতদূর জানেন, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল জাতির মধ্যে মাতুল কন্যা বিবাহের প্রচলন আছে বটে, কিন্তু তাদ্বপরীত পক্ষে মাতুল পুত্র যে পিতৃস্বসা কন্যা বিবাহ করিবে এমন কোন কথা নাই। লেখকের অন্ধ্রদেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ বন্ধু নিজে মাতুল-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং আপন কন্যার সহিত স্বীয় ভাগিনেয়-এর বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিপরীত বিবাহ দেন নাই। ইহা যদি দ্রাবিড় বা আদিম জাতির কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উত্তরেও উক্ত প্রথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগে প্রচলিত ছিল ; তাহার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে (মহাভারত ও ভাসের নাটক দ্রষ্টব্য) আছে। এমন কি, উত্তরের পশ্চিম বাঙ্গলা (৭) উহার যে-অংশ বিহার প্রদেশের সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেখানে ক্ষত্রিয় ও উড়িষ্যার 'খন্দ' জাতির মধ্যে মাতুল কন্যা বিবাহ হয়। এইজন্য উক্ত প্রথা অষ্ট্রেলীয় অথবা আদিম বা দ্রাবিড়জাতীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা ঠিক কিনা তাহা অনুসন্ধানকারীগণের বিচার্য্য।

এহেন ভারতের ইতিহাস পাঠে এই সত্যই উপলব্ধি হয় যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত একই কৃষ্টির অধীন : একই ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সামাজিক পদ্ধতির নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হইত। দক্ষিণের ব্রাহ্মণ উত্তরের সম-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করে এবং একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মোপাসনা করিয়া থাকে। দক্ষিণের রাজবংশগুলি উত্তরের বংশজাত বলিয়া দাবী করিয়াছেন, উত্তরের ন্যায় দক্ষিণেও নগর ও গ্রাম্য সভা এবং ব্যবসায়গত শ্রেণীসমূহ (guilds) সংগঠিত হইয়াছিল ও তৎপরে সেগুলি বংশগত হইয়া উত্তরের ন্যায় casteএ (জাতি) পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্রকর্ম্মও প্রাচীনকালে একই প্রথার অধীন ছিল। এইজন্য ভারতীয় হিন্দু-কৃষ্টি এক ও অবিভাজ্য।

৭। Golap Sastri—Treatise on Hindu Law.

হিন্দুর এই সভ্যতার সকল বিষয়েই আর্য্য-কৃষ্টির প্রভাব বিম্বিত রহিয়াছে। আর্য্যভাষীদের কৃষ্টিই ভারতের মানবকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে ; এইজন্য বর্ত্তমানের "হিন্দু"-কৃষ্টি "আর্য্য"-কৃষ্টি প্রসূত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। হিন্দুর প্রাত্যহিক ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি কর্ম্মই প্রাচীনকালের নীতি (polity) প্রসূত বিধানে শাসিত। বর্ত্তমানের হিন্দুকৃষ্টি প্রাচীন আর্য্যকৃষ্টিরই বংশসম্ভূত, ইহাতে অন্য মূলজাতীয় প্রভাব নাই।

পূর্ব্বে আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্মকে animalism বলা হইত, এক্ষণে উহাকে 'tribal religion' বলা হয়। ইহার অর্থ, প্রত্যেক কৌম তাহার কৌমগত একটা ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আচার-ব্যবহার উদ্ভূত করে। এই ধর্ম্ম অনেকস্থলে 'টটেমবাদ'-এর সহিত জড়িত থাকে। অনুসন্ধানকারীগণ বলেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ এই সকল কৌমসমূকে অভিভূত করিতেছে। এই সকল জাতির মধ্যে গো-হত্যা প্রচলিত আছে। কিন্তু যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে তাহারা গো-হত্যা বন্ধ করিয়া অনেকে হিন্দু অচার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রকারে তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ হিন্দু সমাজে মিশিয়া যাইতেছে। যে জাতি যত বর্ণাশ্রমীয় আচারাদি গ্রহণ করিতেছে, সেই জাতি তত শীঘ্র 'হিন্দু' হইতেছে। প্রথমে অন্ত্যজ, অতঃপর 'অসৎ শূদ্র' তৎপর 'সৎশূদ্র' এবং তদনন্তর 'দ্বিজ', ইহাই হইতেছে 'হিন্দু' জাতির সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারা। এই ধারা আজও চলিতেছে। এই উপায়েই বরাবর অনার্য্যভাষীগণ 'আর্য্যত্ব' লাভ করিতেছে।

ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে 'আর্য্য' হয় নাই ; 'আর্য্যভাষী' ও 'ভারতবাসী,' এই দুই শব্দের কখনও এক অর্থ ছিল না এবং 'হিন্দু' ও 'ভারতবাসী'র অর্থও এক নয়। ব্রিটিশ আদালতে গ্রাহ্য আইনানুসারে হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা হইতেছে : The Hindus are these who profess any form of the religion of the Vedas, or as explained in the Puranas called Brahmanims (৮), অর্থাৎ বেদ-বর্ণিত যে-কোন একটি ধর্ম্ম বা পুরাণে ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসীমাত্রকেই হিন্দু বলা হয়। ইহার অর্থ হইবে, আর্য্যধর্ম্ম প্রসূত ধর্ম্ম ও তৎনীতি সঞ্জাত সামাজিক পদ্ধতি যে গ্রহণ করিয়াছে সে-ই

৮। Golap Sastri—Op. cit. P. 45.

হিন্দু। এতদ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যে সকল ভারতবাসীই কখন 'হিন্দু' ছিল না বা এখনও নহে।

এই সূত্র অনুসরণ করিয়া দেখা যায়, দ্রাবিড়-পূর্ব্ব, অর্থাৎ যাহাদিগকে আদিম অধিবাসী বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহারা হিন্দু নহে, তাহারা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত নহে। স্মৃতিসমূহে তাহাদিগকে 'অন্ত্যজ' বলা হইয়াছে (কোল, ভীল, শবর, পুলিন্দ ইত্যাদি)।

এই সকল লোক সমষ্টি লইয়াই আজকাল নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে টানাটানি চলিতেছে। উচ্চজাতির হিন্দুরা তাঁহাদিগকে 'হিন্দু' বলিতে চাহেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করেন না এবং তাহারাও নিজেদের হিন্দু বলিতে চাহেন না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টান অথবা মুসলমান হন নাই তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন বংশে হিন্দু-অনুষ্ঠানগুলি গৃহীত হইতেছে। সিংহভূমের জনৈক শিক্ষিত 'হো' (কোল) জাতীয় জমিদারপুত্র লেখককে বলেন যে তাঁহার শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিবাহ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ দ্বারা অনুষ্ঠানিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করান হয়। অনেকে আবার 'কালীপূজা' করেন। কিন্তু তাহাদিগকে সেন্সাস গণনাকালে 'হিন্দু' হিসাবে ধরিতে রাজনীতিক প্রতিবন্ধকতা আছে!

এইস্থলে বক্তব্য, যাঁহারা বলেন যে হিন্দু-সভ্যতা দ্রাবিড়জাতির নিকট বিশেষভাবে ঋণী, তাঁহাদের এই মত সমিচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ দ্রাবিড়জাতির অস্তিত্ব নরতাত্ত্বিকেরা অস্বীকার করিতেছেন, আর দ্রাবিড়-পূর্ব্ব আদিম অধিবাসীগণ নিজেরাই হিন্দু-সভতা গ্রহণ করিতেছে। বরং ইহাই স্বীকার্য্য যে হিন্দু-সভ্যতা ভারতের নিকটই ঋণী, ভারতের ভূমিতে উৎপন্ন এই সভ্যতা; সুতরাং তজ্জন্য ইহার বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে ভারতীয় দ্রব্যেরই ছাপ প্রতিফলিত ও অঙ্কিত আছে। এই সভ্যতা খৃঃ পূঃ ৪০০০—৫০০০ (?) বৎসর পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের বাতাবরণের মধ্যে অভিব্যক্ত হইতেছে, কিন্তু তজ্জন্য আর্য্য, দ্রাবিড়, আদিমজাতীয় জাতির প্রভাব বা সংমিশ্রণ প্রভৃতির কথা উঠিতে পারে না। হিন্দুর কতটা বৈদিক, আর কতটা অবৈদিক আজ তাহা কিরূপে নিরূপিত ও নির্দ্ধারিত হইবে? আজকাল অনুসন্ধানকারীগণ বলিতেছেন যে আর্য্যদের ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতির

সমুদয় সংবাদ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ড-সম্বলিত ধর্ম্ম কেবল উচ্চশ্রেণীয় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; তদ্ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মবিশ্বাস ও লোকমধ্যে প্রচলিত ছিল লিঙ্গোপাসনা, অহিংসবাদীয় ধর্ম্ম ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা (৯) শিলালেখ-এর নাম সমূহ হইতে অনুমান করিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের পূর্ব্বেও বৈষ্ণব, শৈব ও নাগ পূজার ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। লোকে নামের শেষাংশে স্বীয় ধর্ম্মানুযায়ী পদবী যোগ করিত; যেমন—সংঘমিত, ধর্মরক্ষিত (বৌদ্ধ), অগিশিমা (অগ্নিশর্ম্মা), বহদত্ত (ব্রহ্মদত্ত) প্রভৃতি (বৈদিক), নাগ, নাগদত্ত (নাগপূজার ধর্ম্ম), ভীনহুকা (ভীষ্মদত্ত বা ভীষ্ম রক্ষিত) উপিদদত (উপেন্দ্র দত্ত) বলমিত্র প্রভৃতি (বৈষ্ণব ধর্ম্ম), নদিগুত (নন্দিগুপ্ত), শিব নদি (শিব নন্দি) প্রভৃতি (শৈব ধর্ম্ম)।

ইহা ছাড়া, পুরাণাদিতে অনেক ব্রতাদি পূজা ও আচারাদির উল্লেখ আছে যাহা বৈদিক সাহিত্যে নাই। বুদ্ধের সময়েই ব্রাহ্মণদের দাবীর প্রতিকূল অনেক সংবাদ পাওয়া যায়! পুরাণে উক্ত আছে, 'বেণ' রাজা নিজেকে Man-God (রাজা-রূপ মানবই ভগবান) বলিয়া জাহির করিয়া ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি ভাঙ্গিবার প্রয়াস পান; আবার সম্রাট অশোক অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান অশ্লীলতার জন্য আপত্তিজনক বলিয়া অনুশাসন দ্বারা বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুশাসনে উক্ত হইয়াছে "রাজা বলিতেছেন ব্যারাম, পুত্র বা কন্যা জন্মিলে বা বিবাহে অথবা কোথাও যাত্রাকালে লোকে অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান পালন করে, কিন্তু উপরোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পাদন উপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা অনেক অনাবশ্যক এবং অশ্লীল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। কিন্তু এই সকল ক্রিয়া সামান্যই ফলপ্রদ হয় (১০)।" অন্যান্য শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় যে তিনি এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েকটি লিপিতে এই অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে "সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে না। কারণ দেবতাদের প্রিয় ও প্রিয়দর্শিন সামাজিক উৎসবে অনেক মন্দ ব্যাপার নিরীক্ষণ করেন"

৯। Buehler in "Votire Inscriptions from Sanchi Stupas," Epigraphica Indica, Vol. II; No. 7.

১০। C. I. I.—Vol. I. Ninth Rock-Edict, Girnar.

(১১)। এই অনুজ্ঞা অন্য এক লিপিতে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে :—"ন চ সমাজে কর্তব্যো" এগুলির পরিবর্ত্তে তিনি অন্যান্য উৎসব প্রচলন করেন। গির্নারের চতুর্থ প্রস্তর অনুশাসনে দেখা যায়, তিনি বলিতেছেন "এক্ষণে ভেরী ঘোষ, ধর্ম্মঘোষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, লোকদিগকে বিমান দর্শন, হস্তি, অগ্নি ও অন্যান্য স্বর্গীয় মূর্ত্তির খেলা দেখান হয়।" ইহাতে বোঝা যায়, পুরাতন নানা প্রকারের উৎসবের পরিবর্ত্তে তিনি জাতক হইতে বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধীয় নানাপ্রকারের যাত্রা পালা প্রভৃতি লোকের দর্শনের জন্য অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রকারে খৃষ্টান ও সিয়া মুসলমানদের মত ধর্ম্মনেতার জীবনী হইতে Passion Plays প্রচলন করা হয়।

রাষ্ট্রশক্তি সর্ব্বদেশেই নানাবিধ ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করে এবং তৎস্থলে নূতনের প্রবর্ত্তন করে। ভারতেই প্রাচীনকাল হইতে তাহা হইয়াছে। তুর্কি আক্রমণের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় রাজা লক্ষণসেন ব্রাহ্মণ ও তান্ত্রিক-দের সংস্কারের জন্য 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' এবং 'মৎস-সূক্ত' রচিত করিয়া প্রচলন করেন। এইজন্য হিন্দুর নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান মধ্যে সনাতন প্রথা, অর্থাৎ বেদের সময় হইতে প্রথার অপরিবর্ত্তনীয় ও চিরন্তন ধারা না দেখিলেই তাহা 'অনার্য্য' বলিবার কোন হেতু নাই। সমাজ গতিশীল, হিন্দু সমাজও যুগে যুগে তাহার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

বেদে ভারতীয় আর্য্যভাষীদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে দৃষ্ট হয় যে তখন তাহারা তাম্রযুগে অবস্থিত ছিল। পরে লৌহযুগে প্রবেশ করে। বেদের এই সর্ব্ব প্রাচীনযুগের চিহ্ন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম আজও বহন করিতেছে; কারণ সকল দেশেই পুরোহিততন্ত্র ভীষণ গোড়াও রক্ষণশীল হয়, তাঁহারাই প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া থাকে। এইজন্যই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।২৫) ব্রাহ্মণ-দের তাম্র ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, আর আজ পর্য্যন্ত পূজার সমুদয় তৈজসপত্রই (কোষাকুশি প্রভৃতি) তাম্রনির্ম্মিত হয় এবং পুরো-হিতের সেলাই করা বস্ত্র পরিহিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন করা স্মৃতিতে নিষিদ্ধ আছে। যাঁহারা বৈদিক কৌমগুলিকে নর্ডিক বা উত্তরাগত বলিয়া দাবী করেন তাহারা এইসব অনুষ্ঠানগুলি অনুধাবন করেন না। ভারতের বিভিন্ন

১১। Ibid, Twelfth Rock-Edict, Girnar.

স্থানে আবিষ্কৃত সূর্য্যমূর্ত্তি ও তাহার মগ ব্রাহ্মণের আকৃতি ও পোষাকে মধ্য-এসিয়ার লক্ষণ অঙ্কিত আছে। দেবতা ও পুরোহিতের কসা (আঁটা) ইজার ও মাথায় উচ্চ কুলাটুপি এবং পায়ে উচ্চ বুট ইহাদিগকে বিদেশজাত বলিয়া স্পষ্টই পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু বেদ হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর কোন দেবতা ও তাহার পুরোহিতের কোট, পায়জামা ও বুটজুতা পরিধানের কোন উল্লেখই নাই! যে বস্ত্র পরিধানের বর্ণনা আছে এবং পুরোহিতের জন্য পূজার সময়ে যেসব বিধিব্যবস্থা আছে তদ্বারা বৈদিক আর্য্যেরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি বৈদিক ব্যবস্থার অনুশাসন আজও বহন করিতেছে।

আজকাল যাঁহারা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন মূলজাতির প্রভাবের বিশ্লেষণ করিতে চাহেন তাঁহারা শারীরিক নরতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করেন। মহেনজো-দাড়ো ও হরপ্পায় যে-সকল বিভিন্ন মূলজাতীয় নরকরোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আর্য্য বলিয়া একটা বিশিষ্ট মূলজাতি কখন ছিল না। তাহা বেদপাঠেই বুঝিতে পারা যায়। তাহারা অতি বর্ব্বরাবস্থা হইতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকায় টটেমপূজা, জন্তুপূজা, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অনেক চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি আবার বেদেও পাওয়া যায়। বেদে টটেমবাদের চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন; তৎপর নানাবিধ বীভৎস অনুষ্ঠানও বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য ভারতীয় আর্য্যের কতটা বিদেশজাত Indo-European বা Indo-German এবং কতটা খাস ভারতীয় এই সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তাহার নির্দ্ধারণ করা একটা গোলকধাঁধাঁর মধ্যে চিরকাল ঘোরার মতই দাঁড়ায়। বরং ইহাই অনুমিত হয় যে এই সমস্যা একেবারেই সাম্রাজবাদীর কল্পনামাত্র। ভারতের সমাজ-পদ্ধতির বিবর্ত্তনের অনুসন্ধানকল্পে ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন পুস্তক বেদকে বাদ দেওয়া যায় না, কারণ আজও হিন্দুর সমস্ত রীতিনীতি, ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহের উৎস বৈদিক সাহিত্যে নিহিত আছে। এইসব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান মধ্যে বিভিন্ন মূলজাতির কৃষ্টির ধারা আবিষ্কৃত হয় না।

এইজন্য সাম্রাজ্যবাদীয় Race theory'র চাবিকাঠি দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার দ্বার উদ্ঘাটন করা ভ্রমাত্মক।

হিন্দুদের মধ্যে প্রাচীনকালে যে সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ছিল তাহার অনেকগুলি যে অন্যান্যদেশীয় প্রাচীন ইণ্ডো-ইওরোপীয় বা আর্য্যভাষী জাতিদের মধ্যে ছিল তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা হইয়াছে। এমন কি, বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞে যে সব বীভৎসতা অনুষ্ঠিত হইত প্রাচীন উত্তর ইউরোপের নর্স (Norse) জাতির মধ্যে সেই প্রকারের অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু ঋগ্বেদের শুনঃসেপের গল্প (১—২৪ হইতে ৩০ সূক্ত) ও যজুর্ব্বেদের নানা জলচর, খেচর (২৪—২৮) ও নরবলি (৩০—৫ হইতে ২২) ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হইতে যদি প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে নরবলি প্রথা ছিল বলিয়া অনুমান করা হয় তাহা হইলে ইহাও উল্লেখ থাকে যে কেবল সেমিটিক জাতিদের বাদ দিয়া প্রাচীন ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষী গ্রীক ও জার্ম্মানদের মধ্যেও তাহাদের আদিমাবস্থায় সেই প্রথা ছিল প্রচলিত ছিল। বেদের এই ব্যবস্থা কি Race theory দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়? কারণ, ঋগ্বেদে নরমেধ যজ্ঞের উল্লেখ নাই; শুনঃসেপের সূক্তে আছে। তাহাকে যজ্ঞে বলি দিবার জন্য যূপকাষ্ঠে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই সূক্তের আবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয় (৩০)। এই সূক্ত দ্বারা নানা প্রকারের বলির মধ্যে নরবলির এক দীর্ঘ তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে।

এইরূপে প্রাচীনকালের 'বহু স্বামীত্ব' কি Race-theory দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হইবে? কেহ কেহ দ্রৌপদীর গল্পটি এই প্রকারেই ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু উপরোক্ত উভয় ইউরোপীয় জাতির মধ্যেও এই প্রথা ছিল। ঐতিহাসিক যুগে স্পার্টার মধ্যে এই প্রথা ছিল। এই প্রকারে সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহের প্রথাও প্রাচীন বিদেশীয় জাতিগুলির মধ্যে ছিল। পুনঃ ঋগ্বেদে 'শব' সমাহিত করা (burial) এবং দগ্ধ করা (cremation) উভয় প্রথাই ঋগ্বেদীয় সূক্তে পাওয়া যায়। এতব্যতীত 'শব' দূরে নিক্ষেপ করা, উচ্চ স্থানে রক্ষা করার প্রথাও ছিল। এই শেষোক্ত প্রথাটি আজও পারসীক জারতুষ্ট্রীয়দের মধ্যে আছে। ইহাও কি Race-theory দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়?

তুলনামূলক জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা এই তথ্য পাওয়া যায় যে হিন্দুদের বা প্রাচীন আর্য্যভাষী ভারতীয়দের যেসব রীতি-নীতি ছিল প্রাচীনযুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তদ্রূপ রীতিনীতি ও প্রথা বর্ত্তমান ছিল। সত্যই Rhys Davids বলিয়াছেন, "বুদ্ধের সময়ে হিন্দুদের যেসব আচার ও রীতিনীতি ছিল সেই সময়ের ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহের মধ্যেও ঐ প্রকারের পদ্ধতির প্রচলন ছিল" (১২)। বৈজ্ঞানিক Elliot Smith, Race-theory জগতের সভ্যতার মূল ধরিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভারতের সভ্যতার গতির যদি একটি Graph টানা যায় তাহা হইলে তাহাতে দুইটি Peak (চূড়া) দৃষ্ট হইবে: (১) 'আর্য্য' আক্রমণ দ্বারা ভারতে একটা সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে; তৎপর উহার অধঃপতন হইলে (২) 'তুর্কি' আক্রমণ দ্বারা মোগলযুগে সভ্যতার দ্বিতীয় উর্দ্ধগতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ভারতকে 'আর্য্য' ও আর্য্য-পরযুগ এবং মোগল যুগে বিভক্ত করা ঠিক নহে। মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে ভারতে নানা মূলজাতীয় লোকের আমদানী হয়, এবং মোগল নামধারী মুসলমানরাও নানা মূলজাতীয় লোক ছিল। তৈমুর বংশীয়দের শাসনকালে "মোগল" একটা 'technical term' হইয়াছিল। কাঁফী খাঁ 'মোগল' অর্থে ইরাণী ও তুরাণী বুঝিয়াছিলেন। আর মোগলযুগের স্থপতিকার্য্য দেখিয়া তিনি যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা হইলে বলা যায় যে অনুসন্ধানকারীগণ বলেন, ভারতীয় মুসলমান স্থপতিকার্য্যে পুরাতন ভারতীয় প্রভাব স্পষ্ট রহিয়াছে এবং হ্যাভেলের মতে তাজমহল পুরাতন হিন্দু-বৌদ্ধ স্থপতি কার্য্যেরই ক্রমবর্ত্তিতা মাত্র, কেবল ইসলামীয় ধর্ম্মানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে (Islamic adoptation of Hindu-Buddhist art).

ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে Race-theoryর কোন মূল্য থাকে না। ম্যাসিডোনীয় আক্রমণের পর মৌর্য্যসাম্রাজ্যের উত্থান, পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান, ইহার পরে গৌড়েন্দ্র বঙ্গাধিপতি পালদের উত্থান এবং ভিনমলের গুর্জ্জর প্রতিহারদের উত্থান এবং শেষতঃ মারাঠাগণের উত্থানকে

১২। R. Davids—Buddhist India.

Race-theory দ্বারা ব্যাখ্যা করিলে আপাতঃ শ্রুতিমধুর ও চমকপ্রদ অভিমত হয় বটে এবং তদ্দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীয় ও বুর্জ্জোয়া ন্যাশনলিষ্ট অহমিকার তৃপ্তি সাধন হয়, কিন্তু তাহা বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক তথ্য নহে। এই সাম্রাজ্যবাদীয় চাবিকাঠির পরিবর্তে আজকালকার ঐতিহাসিকগণ সমাজদেহের অভ্যন্তরস্থ যে দ্বন্দ্বভাব (dialectics) আছে তাহার ফলেই একটা নেশনের উত্থান ও পতনের গতি নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এইজন্য উপরোক্ত ভারতের ঐতিহাসিক যুগ-সকলের কার্য্যকলাপের মধ্যে সমাজ মধ্যস্থিত শক্তি সমূহের বিকাশ ও দ্বন্দ্বভাব নিরীক্ষিত হয়।

আজকাল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারীগণ বলিতেছেন যে ভারতের জাতি-সমূহ (castes) মূলজাতীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। পাশ্চাত্য-ইণ্ডোলো-জিষ্টদের মধ্যেও এই মত স্থান প্রাপ্ত হইতেছে যে ভারতীয় জাতিসমূহের (castes) ভিত্তি হইতেছে 'অর্থনীতি' (Economics), অর্থনীতির প্রেরণায় এই জাতিগুলি গঠিত হইয়াছে (১৩)। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক্ (Fick) বলিয়াছেন, হিন্দুর "বর্ণ" শব্দ দ্বারা caste অর্থ বুঝায় না; ইহাকে class, genus, species অথবা অন্য কোন কিছু বলা যাইতে পারে। ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন—"বর্ণ" অর্থ caste নহে, ইহার অর্থ 'class'। এতদিনে হিন্দুর সমাজতত্ত্বের একটি প্রতিষ্ঠানের যথার্থ তথ্য আবিষ্কৃত হইল—হিন্দুর 'বর্ণভেদ' অর্থে 'class-division' (বর্ণ বা শ্রেণীভেদ)।

এই আলোচনায় এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে যে আদিতে হিন্দুর 'বর্ণ', শ্রেণী (বর্গ) বিভাগ ছিল। প্রাচীন চীন হইতে উত্তর ইউরোপের টিউটন-দের দেশ পর্য্যন্ত সমুদয় ক্লাসিকাল দেশেই চারি প্রকারের সামাজিক ভেদ ছিল। যখন পুরাণকারেরা বলিলেন, জম্বুদ্বীপের বাহিরে শকদ্বীপ, কুশদ্বীপ প্রভৃতি যায়গায় চাতুর্ব্বর্ণ্য বিরাজ করিতেছে, তখন তাঁহারা নিতান্ত ভুল করেন নাই। হয়ত প্রাচীন ভারতীয় পর্য্যটকগণ যখন বিদেশে ভ্রমণে গিয়াছেন তখন

১৩। ভিয়েনার Anthropos পত্রিকার সম্পাদক লেখককে পত্রদ্বারা এই তথ্য জানান এবং তিনি নিজে এই বিষয়ের উপর একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়াও জানান।

তথায় এই ব্যবস্থা বিদ্যমান দেখিয়াই উপরোক্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

আর্থিক বৃত্তি অনুযায়ী প্রাচীন মানবসমাজে সামাজিক ভেদ উদ্ভূত হইয়াছিল এবং ভারতেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানের হিন্দুর জাতিপদ্ধতির উদ্ভবের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত ব্যাখ্যা নয়। হিন্দুর আচার বলিয়া একটা ব্যাপার তাহার দৈনন্দিন জীবনের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। কি স্পর্শ করিব, কাহার সহিত আহার করিব, কোন দ্রব্য পবিত্র, কাহার দৃষ্টি শুভ এবং কাহার দৃষ্টি অশুভ বা খারাপ ইত্যাদি নানা খুটিনাটির বিচার হিন্দুকে দিনরাত সন্ত্রস্ত করিয়া রাখে। এইগুলিই বর্ণাশ্রমীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তি, এবং এই বিধি নিষেধগুলিকে আচার আখ্যা দেওয়া হয়। অথর্ব্ববেদের ভাষায় (৫।১৩।১০) ইহাকে "তাবু" বলা হয় (১৪)। এবং সমাজতত্ত্বে ইহাকে "Taboo" (তাবু) নামে অভিহিত করা হয়।

সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, আদিম মানব কল্পনা করিয়া ধরিয়া নিয়াছিল যে কোন কোন বৃক্ষ, জন্তু, পর্ব্বত বা জল, তাহার আদি পুরুষ, অর্থাৎ আদি পুরুষের সহিত এই সব দ্রব্যকে সনাক্ত করে অথবা আদিপুরুষ মনে না করিয়া ভাবে যে একটা অব্যক্ত শক্তি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করে। এইগুলিকে তাহাদের 'টটেম' বলা হয়। সেইজন্য সে তাহার বৃক্ষ বা জন্তু আদি পুরুষকে বা তাহাদের টটেমকে সম্মান করে; সুতরাং সেই জন্তুকে সে মারে না, তাহার মাংস খায় না এবং অন্য যে মানব সেই বৃক্ষ বা জন্তু প্রভৃতিকে তাহার আদিপুরুষ বা টটেম বলিয়া স্বীকার করে তাহার সহিত বিবাহ করে না। এই আদিপুরুষ অথবা টটেমকে কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকারের বিধিনিষেধ উদ্ভূত হয় এবং পরে এই আদি পুরুষের বা টটেমের পূজা আরাধনাদির (Ritualism) সৃষ্টি হয় এবং শেষে এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিজড়িত হইয়া একটা

১৪। অথর্ব্ববেদের অনুবাদক Whitney সাপতাড়ান মন্ত্রের 'তাবু' শব্দের অর্থ ঠিক-ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, ইহার অর্থ বুঝা যায় না। ইতিমধ্যে 'পলেনেসীয়' ভাষা হইতে গৃহীত 'Tapu' শব্দটি সমাজতত্ত্বে 'Taboo'তে রূপান্তরিত হইয়া শিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়। সিলভিয়া মহোদয় খৃষ্টীয় ১৯২৪ সালে অথর্ব্ববেদের এই শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরিয়া দেন (তাঁহার Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India দ্রষ্টব্য)।

ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়। এই ধর্ম্মই তাহার Tribal Religion (কৌমগত ধর্ম্ম) বলিয়া চিহ্নিত হয় ; আর প্রত্যেক কৌমই তাহার টটেম-চিহ্ন দ্বারা অন্যদের সহিত পৃথকীকৃত হইয়া থাকে। আমেরিকার আদিম জাতিগুলি এই বৃক্ষ বা জন্তু আদিপুরুষ বা আরাধ্যকে 'টটেম' বলিয়া অভিহিত করে এবং টটেমবাদ প্রসূত নানা প্রকারের বিধিনিষেধকে 'তাবু' বলে। সমাজতাত্ত্বিকেরা এই জাতির ভাষা হইতে এই দুইটি শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যায় যে অথর্ব্ববেদে 'তাবু' শব্দ রহিয়াছে, এবং অন্ধ্র (তেলেগু) ভাষায়ও 'তাবু' শব্দটি প্রচলিত আছে (লেখকের জনৈক অন্ধ্রদেশীয় বন্ধু তাহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন)। এক্ষণে ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন, কোথা হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইল।

'তাবু'র তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, কতকগুলি অনুষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে নিষিদ্ধ থাকে—যেমন, কে কাহার সহিত আহার করিবে, কাহার স্পর্শ বা দৃষ্টি কাহার পক্ষে শুভ বা অশুভ। এইসব ব্যপারই 'তাবু'র বিধানের অন্তর্গত। মনস্তত্ত্ববিদ Freud ও জাতিতত্ত্ববিৎ Max Schmidt (১৫) বলেন, এই ব্যাপারের সহিত শ্রেণী-লক্ষণ (class-character) বিজড়িত আছে। পলিনেসীয় অভিজাতদের কাছে "ভূমি" তাবু, সেইজন্য আহার স্থলে তাহারা গোলামের স্কন্ধে চড়িয়া আসেন এবং আহারান্তর তাহারা চলিয়া গেলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তথায় আহার করে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের কাছে 'তাবু'। আফ্রিকার অনুন্নত জাতিদের মধ্যে এই প্রকারে আহার, স্পর্শ ও বিবাহাদির 'তাবু'গত বিধিনিষেধ আছে (১ম) (১৬)।

এই তাবু বিধানের সহিত আর একটি বিশ্বাস জড়িত আছে, তাহা হইতেছে 'Mana' বিশ্বাস। প্রাচীন মানব শারীরিক শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটা শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সে মনে করে অব্যক্ত ও অজ্ঞেয়ভাবে এই শক্তি (mystic potency) সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে ; এই শক্তি সর্ব্ব বিষয়েই

১৫। S. Freud—'Totem and Taboo' ; Max Schmidt—"Ethnologie".

১৬। Crawly—Mystic Rose.

ভালমন্দ করিতে পারে, এইজন্য ইহাকে আয়ত্ত করা মানবের পক্ষে সুবিধা-জনক। এই শব্দটিও পলিনেসীয় ভাষাজাত (১৭)।

যখন প্রত্যেক জীবের মধ্যে এক অব্যক্ত শক্তি নিহিত আছে এবং উহা ভালমন্দ ফল প্রসব করিতে পারে, তখন তাহার সহিত আহার ও বিবাহ, তাহার স্পর্শ ও দৃষ্টির উপর অন্য লোকের ভাল-মন্দ নির্ভর করে, এই তথ্য আদিমমানব বিচার করিয়া নির্দ্ধারিত করে। পুনঃ এই 'মানা' বিশ্বাসেও শ্রেণী-লক্ষণ প্রকাশ পায় ; উচ্চশ্রেণীর লোকের মানা উচ্চ, নিম্নশ্রেণীর মানা হীন, তদ্দ্বারা উচ্চশ্রেণীর ক্ষতি হইতে পারে,—সুতরাং তাহার পারিপার্শ্বিক বর্জ্জনীয়। এই কারণ বশতঃ পলিনেশীয় অভিজাতেরা নিম্নশ্রেণীর সংস্পর্শ বর্জ্জন করে। এই প্রকারের বিধি-নিষেধ অতি প্রাচীনকাল হইতে সভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য ও অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত আছে (১৮)। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ ইহা হইতে বাদ যায় নাই। এখনও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের, আমেরিকা ও আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও টটেম ও তৎপ্রসূত 'তাবু' বিধান প্রচলিত আছে।

এক্ষণে ভারতবর্ষের সমাজে ইহার অনুসন্ধান করা যাউক। আজ প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রাচীন ইণ্ডো-ইউরোপীয় অর্থাৎ আর্য্যভাষীদের মধ্যে টটেম প্রথা ছিল এবং তাহাদের সমাজে 'তাবু'রূপ বিধি-নিষেধও ছিল। এমন কি, হিন্দুদের জ্ঞাতি পারসীকদের মধ্যে পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। জারতুষ্ট্রীয়দের শরীর ও মনের পবিত্রতার জন্য আহার, পান ও পরিচ্ছদের বিষয়ে নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান আছে। ভিন্নধর্ম্মীয়দের বিষয়ে বর্ত্তমানের পার্শীদের মধ্যে আজকালকার হিন্দুদের অপেক্ষাও অনেক কড়া ব্যবস্থা আছে (১৯)। পার্শীদের নিকট আহার ও পান ধর্ম্মের অঙ্গ (২০)। ভারতবর্ষ সম্পর্কে

১৭। Craighill Handy—The Problems of Polynesian Origins. (Bernice P. Bishop Museum "Occasional Papers", IV. 8.)

১৮। B. N. Datta—"Notions on Purification and Taboos in Society" in Cal. Review.

১৯। Hastings—"Encyclopaedia," Vol. 6, Pp. 153—154.

২০। J. J. Modi—Anthropological Papers, Pt. II. Pp. 63—64.

দেখা যায়, বেদে টটেমবাদের চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন (২১); কিন্তু সুস্পষ্টভাবে তাহা পাওয়া যায় না। আবার সিমায় বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে আর্য্য-কৌমদের যৌবনকালেরই সংবাদ পাওয়া যায়, তজ্জন্যই প্রথমাবস্থার কথা কিছুই জানা যায় না। এইজন্য 'টটেম' সম্পর্কে বিশেষ সংবাদ না পাইলেও 'তাবু' অনেক সংবাদে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে 'তাবু' ও 'মানা' প্রসূত অনেক অনুষ্ঠানের কথা পাওয়া যায়। এই গুলিই পরে হিন্দুর আচারের ভিত্তি হয়। আদিম জাতিসমূহের টটেমবাদ এখনও অনেক স্থলে বিভিন্নরূপে আছে এবং অনেকস্থলে হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা টটেমকে ভুলিয়াছে বা তাহাকে হিন্দুধর্ম্মের একটা অনুষ্ঠানরূপে রূপান্তরিত করিয়াছে। কিন্তু এই টটেম-বিশ্বাস প্রসূত তাবু আজও তাহাদের মধ্যে বিরাজমান। আসামের কাছাড়ীরা নিজেদের হিন্দু বলে না কিন্তু সাজাগাছ পূজা করে; কেন করে তাহা তাহারা জানে না, তাহাদের সমাজব্যবস্থা মধ্যে পশুগত অনেক কুলের নামও আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাউড়ি জাতির কাছে ও কুক্কুর অবধ্য। ছোটনাগপুরের খেড়িয়া জাতি মেষের লোম বা মেষ সম্পর্কীয় কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবে না, তাহারা মেষ মাংস খায় না। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে হিন্দুর 'তাবু' সমূহ, অর্থাৎ বিধি-নিষেধ প্রসূত আচারগুলি আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে গৃহীত নয়। অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা বেদেও আছে এবং তথাকথিত সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায়ও পাওয়া গিয়াছে। আমলকী (পদ্মপুরাণ ১, ৬০।২) ও তুলসীগাছের মাহাত্ম্য বর্ণনা পুরাণে পাওয়া যায়। কাজেই ধরিয়া নিতে হইবে যে বেদে উল্লিখিত না থাকিলেও টটেম বিশ্বাস প্রসূত নানাবিধ তাবু বা বিধি-নিষেধ আর্য্যভাষী ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবহারিক জীবনে বরাবর ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বৈদিকসাহিত্যে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র, এবং পরবর্ত্তীকালের পুরাণ ও স্মৃতিসমূহে তাহা বিধি-নিষেধ রূপে লিপিবদ্ধ হয়।

সংস্কৃত ধর্ম্মসাহিত্য সমূহ পাঠ করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে বৈদিকযুগের পর পুরোহিততন্ত্র যতই বলশালী হইতে লাগিল 'তাবু' বা বিধি-নিষেধের

২১। Macdonell—Vedic Mythology

তালিকাও ততই বাড়িতে লাগিল, এবং শ্রেণী-প্রাধান্যের অহমিকার (class arrogance) মাত্রাও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। পুরাণ ও স্মৃতিসমূহে এইগুলিকে ধর্ম্মের অনুশাসন বলিয়া পুরোহিততন্ত্র ঘোষণা করিলেন এবং তদ্দ্বারা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাও হয়। এই সকল বিধানের মধ্যে শ্রেণীলক্ষণ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। পুরোহিততন্ত্র প্রাচীন কৌমগত রীতি ও তাবুগুলিকে ব্যবহার (Law) ও আচার (Notions or rules about purifications and prohibitions) রূপে হিন্দুসমাজের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান বলিয়া জাহির করে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সমাজ যত সামন্ততান্ত্রিক যুগে অগ্রসর হইতে লাগিল পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্যও সেই সঙ্গে বাড়িতে লাগিল; এবং এইসব আচারের বাড়াবাড়িও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে আচারগুলিকে "জন্যদোষ, স্পর্শদোষ ও দৃষ্টিদোষ"প্রভৃতি রূপে বিভাগ করা হয়। হিন্দুর আচারজনিত সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ও নিষেধ উক্ত তিন প্রকারের দোষ প্রসূত। এই দোষগুলিকে আবার ধর্ম্মজনিত, সামাজিক ও লিঙ্গগত (sexual) বলিয়া বিভক্ত করা হয় এবং শেষ বিশ্লেষণ দ্বারা এই গুলিকে খাদ্য (food) ও স্পর্শ (contact) জনিত 'তাবু' রূপে বিভাগ করা যায় *।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এইগুলির মধ্যে শ্রেণী-লক্ষণ আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা দেখান যাইতে পারে যে স্মৃতিসমূহে ব্রাহ্মণের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অনেক দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু শূদ্রের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ সম্পর্কে কোন নিষেধ নাই; মনুতে ব্রাহ্মণের পক্ষে পলাণ্ডু, রসুন, বেঙ্গের ছাতা ভক্ষণ নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু শূদ্রের পক্ষে তাহা নহে। টীকাকার কুল্লুকভট্ট (মনুর ৫।৫ শ্লোকের টীকায়) বলিয়াছেন, এইগুলি কদর্য্য যায়গায় জন্মায় বলিয়া দ্বিজগণের ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কিন্তু শূদ্র তাহা খাইতে পারে। এই স্থলে দ্বিজগণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য তথাকথিত পবিত্রতার আবরণে তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; কিন্তু অধিকার-বিহীন শূদ্র উহা ভক্ষণ করিয়া জাহান্নামে যাইতে পারে!! মৎস্যাদি আহার বিষয়েও সেইমত। পুনঃ শূদ্র ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খাইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা পাপ—তজ্জন্য

* B. N. Datta—"Notions on Purifications and Taboos in Society". Oct. 1940, Cal. Review.

প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। মনু চণ্ডাল-সংস্পর্শে স্নানের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন (৫।১৮৫) ; কিন্তু বহু পরের পদ্মপুরাণে (১।৩২।৪৭-৫০) "কশ্যপ বলিতেছেন, তুমি চণ্ডাল সংসর্গে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও পতিত হইয়াছ, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই নরকে বাস করিতেছে!" অর্ব্বাচীন পদ্মপুরাণে পুরোহিততন্ত্রের এই শ্রেণীর অহমিকা আরও বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। এই প্রকারের food ও contact জনিত নানা বিধি-নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পুরোহিততন্ত্রের পুস্তক সমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজশক্তি পুরোহিত শক্তির সহিত মিলিত হইয়া অতীতে সমাজকে তাহা গ্রহণ করাইয়াছে। এইজন্যই রাজাদের "সর্ব্ব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপণ প্রবৃত্ত" বলা হইত (২২)। আজও স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্রে তাহাই চলিতেছে।

অতঃপর বৌদ্ধদের বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে পবিত্র ও অপবিত্র জিনিষ সম্পর্কে তাঁহাদেরও বিশিষ্ট বিশ্বাস ছিল। গুপ্তপর যুগে চৈনিক পরিব্রাজক (২৩) ই-সিং ভারতে আসিয়া বৌদ্ধদের রীতিনীতি বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তাহাদেরও খাদ্য এবং স্পর্শ বিষয়ে কতকগুলি বিশিষ্ট বিধান ছিল। এইগুলির মধ্যে কতকগুলির ব্রাহ্মণ্য বিধান সমূহের সহিত মিল আছে। বিনয় সূত্তে স্পর্শ ও খাদ্য বিষয়ে যেসব আচারের বিধান আছে তাহা হইতে অনুমিত হয় যে এই সকল আচার ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের সৃষ্ট নয় বা ব্রহ্মা-প্রদত্ত বিধানরূপে তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এইগুলি ভারতীয় জাতির রীতির (modes) অন্তর্গত ছিল।

এই অনুসন্ধানের ফলে এই তথ্য পাওয়া যায় যে আচার-রূপ বিধানগুলি প্রাচীন ভারতীয় কৌমগত সংস্কার মাত্র। টটেম বা অন্য উপায়-প্রসূত এই 'তাবু'গুলি বরাবর সমাজে চলিয়া আসিতেছে, সমাজে শ্রেণী-বিভাগের জন্য তাহার মধ্যে শ্রেণী লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায় ; পরে সামন্ততন্ত্রের যুগে এই শ্রেণী লক্ষণ আরও বিকাশ পায়। ইহার ফলে কে উচ্চ জাতি (caste), কে নীচ জাতি কি কর্ম্ম করিলে লোকের ব্যক্তিগত পবিত্রতা রক্ষিত হইবে, কি পেশা অবলম্বন করিলে একটা জাতি বা লোকসমষ্টির পদমর্য্যাদা সমাজে নির্দ্দিষ্ট

২২। C. I. I.—Vol. III, No. 52.

হইবে তাহা food and contact taboos-এর সহিত শ্রেণী-লক্ষণ বিজড়িত হইয়া একটা জাতির সামাজিক পদ নিরূপিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে বেদে তক্ষন, রথকার প্রভৃতি উচ্চজাতীয় বলিয়া উল্লিখিত হইলেও পরে স্মৃতি সমূহে তাহাদিগকে নীচ শ্রেণীর শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইল। এইজন্যই 'রজক' আজ পতিত অসৎ শূদ্র, এই প্রকারেই সূত্রধার আজ পতিত—ইহারা আজ অসৎ শূদ্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

—সেই চোখ নয়—

আজ মনে হয়ঃ
আমাদের এই চোখ সেই চোখ নয়।
এই পৃথিবীর বুকে অনেক ঋতুর খেলা—
দেখেছি মেলা—
সেই চোখ দিয়ে।
সেই চোখ গিয়েছে হারিয়ে।
চির বসন্ত নয়—
গ্রীষ্ম রয়
সারাটি বছর—
আর জীবনের সাথী ম্যালেরিয়া জ্বর।
পুরাতন অভিশাপে
পরিশ্রান্ত রক্তের উত্তাপে
কপালের ঘাম ফেলে রুটীর জোগাড়।
বার মাস সেই ঘাম আর
চির গ্রীষ্ম রয়।
আমাদের এই চোখে সেই চোখ নয়।

পূর্ণেন্দু-প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

লক্ষ্মীছাড়ী

১৪

গাড়ী এসে থামল নন্দর আড়তের সামনে। নন্দ তখন পারিষদবর্গ নিয়ে আড়তের গদিতে বসে তামাক আর গল্প চালাচ্চে। অবসন্ন মুখে চন্দর ছাতা মুড়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল। নন্দ যেন ভুত দেখলে। আমতা আমতা করে বললে শুধু, আরে মুকুজ্জে মশাই যে! কিন্তু তারপর সবাই চুপচাপ মাটির পুতুলের মতন। চন্দর মুকুজ্জের ব্যবসা লাটে তুলতে চাইলেও তার ভারিক্কি-পনার কাছে নন্দ যেন কেঁচটি।

চন্দর কপালের ঘাম পুঁছে নিরস গলায় বললে, মা এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

নন্দর বিহ্বল মুখের ওপর যেন একটা চড় মারা হল। খানিকটা আঁট সাঁট করে উঠল—বলো কি, মুখুজ্জে-গিন্নি! নিজে এসেচেন, কৈ?

চন্দর আঙুল বাড়িয়ে বাইরের গাড়ীটা দেখালে। নন্দ কালচে-প্যাটার্নের তেলা ভুঁড়ির ওপর সাতহাতি কাপড় কোন ক্রমে আঁকড়ে নিয়ে এক রকম লাফ মেরে উঠল। তারপর খামারে ঢোকা গরুর পালের মতন সবাইকে হোস্, হুস্ করে বাইরে তাড়িয়ে দিল।

চন্দর গাড়ির কাছে আসতেই চাঁপা বেরিয়ে এল। চন্দর অবাক। একি! ঘোমটায় চাঁপা এমন মুখ ঢেকেচে যে গলা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এতক্ষণে চন্দরের মনটা একটু প্রসন্ন হল। ভাবলে, ছোটগিন্নির ঐ কেমন একটা আশ্চর্য্য গুণ আছে, ঠিক একেবারে মানানসই। চন্দর কখন মনেই করতে পারে না চাঁপা আবার ঘোমটা দেবে। নন্দ আর চন্দরের পেছন পেছন চাঁপা এগোলো। অবাক হয়ে সেই যে নন্দর পান-খাওয়া কাল দাঁতের মুখ আধেক হাঁ হয়ে গেছে, সে আর বুজল কৈ। শুধু চন্দরের কথার উত্তরে মাঝে মাঝে ধরা ধরা গলায় অস্ফুট হ্যাঁ, হ্যাঁ করতে লাগল।

আড়তের ভেতরে এসে চাঁপা ঘোমটাটা কপালের ওপর টেনে দিলে। নন্দ চাঁপার মুখের দিকে চেয়ে রৈল। অবিচলিত হয়ে আছে চাঁপার এতদিন-কার সংযম। তাতে গ্রামের কমনীয়তা মাখান। আর আছে অ-মেয়েলি

পৌরুষ। চাঁপা আঠারোয় পড়েচে। এই সব নিয়ে নন্দর অবাক না হবার কোন কারণ নেই। নন্দ বোকার মতন হামাগুড়ি দিয়ে চাঁপার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। চাঁপা একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে শুধু বললে, থাক্ থাক্। নন্দ চুপ করে উঠে দাঁড়াল। বলির পাঁঠার মতন। চাঁপা ওর চোখের দিকে সোজা চেয়ে বললে, তুমিই নন্দ মুদী? থতমত খেয়ে নন্দ বললে, হ্যাঁ মা, হ্যাঁ।

নন্দ শশব্যস্তে কোথা থেকে ধুলোপড়া একখানা চৌকি বার করে আনলে। কোঁচার কাপড়ে তাড়াতাড়ি পুঁছে সেখানা চাঁপার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে বস মা, বস।

চাঁপা বললে, থাক্, আমি বসব না। অল্প কথা, এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে।

নন্দ যেন অথৈ জলে পড়েচে এমনি ভাবে চন্দরের দিকে একবার চাইলে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় চন্দরের মনটা যেমন অনিশ্চিত ছিল, সে ভাবটা এখন অনেকটা কেটেচে। কিন্তু ওর অবাক ঘোচে না। সেই যে চাঁপা বলেছিল, নন্দ মুদীকে শাসন করবে, সত্যি সত্যি এসে উপস্থিত তো হল। এখন কি বলে চাঁপা, সেইটের কোন দিশে চন্দর মনের ভেতর খুঁজে পাচ্চে না।

চাঁপা হঠাৎ বললে, আচ্ছা নন্দ, তোমার মূলধন কত?

নন্দ রীতিমত ভড়কে গেল। তাড়াতাড়ি বললে, তা আপনার বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে চারিদিক্ কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাজার দু চার হবে।

ব্যস! চাঁপা চন্দরের মুখের দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। চন্দরের চোখ দুটোর ভেতর দিয়ে সাঁৎ করে বিদ্যুতের একটা চমক খেলে গেল। আর নন্দ, আহা বেচারি!

অকারণ একবার মাথা চুলকে, ভুঁড়ির ওপর হাত বুলিয়ে নিলে। তারপর ফ্যালকা মুখে বললে, তা কি করা মা, বড্ড কম।

চাঁপা একটু হেসে চন্দরের দিকে চেয়ে বললে, চল এইবার যাই, নন্দ শাসন হয়ে গেচে।

চন্দর অবাক, নন্দ ততোধিক। চাঁপা মাথার কাপড়টা একটুখানি টেনে দিয়ে এগোলো। কিন্তু নন্দ কাণ্ড বাধালে। লাট্টুর মতন হঠাৎ কেৎরে গিয়ে চাঁপার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াল। বললে, না মা, বলে যেতে হবে।

চাঁপা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, বাহারে কি বলব, বল না।

নন্দর মুখে বিনয় আর দৃঢ়তা ফুটে উঠেচে। বললে, এই শালার নন্দ মুদীর মুখের ওপর এমন করে হেসে উঠতে আর কেউ কখন পারে নি। আর আমি শাসন শাসন হলুম কেন?

চাঁপা আড়তের আড়ার দিকে চেয়ে, পাতলা ঠোঁট দুখানা ধনুকের মতন করে বেঁকিয়ে বললে, ওঃ, এই। নাঃ শুনলুম, তুমি আমাদের ব্যবসা লাটে তুলবে। তাই একবার ভাবলুম দেখে আসি কত বড় সে মদ্দ। জান, আমাদের মূলধন কত?

নন্দর চোখে ভয়ের ছায়া নেবে এসেচে। বোকার মতন চাঁপার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রৈল। ঠোঁট দুখানা ফাঁক হয়ে গেছে।

চাঁপা বললে, তাই জেনে গেলুম, তোমার সাধ্যি কি আমাদের ব্যবসা লাটে তুলবে।

নন্দ এরকম ব্যাপার জীবনে শোনেনি; একটা মেয়ে ওর আড়তে এসে যে সত্যি সত্যি ওকেই হেসে উড়িয়ে দিয়ে যাচ্চে, একথা ভাবতেও মুদীর রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু কি তেজ চাঁপার! নন্দ রুখে উঠল। বলল, কি পারব না? আচ্ছা, দেখে নিও মুকুজ্জে মশাই, এই শালা মুদীর পো কত বড় শয়তান।

চাঁপার যেন আমোদ হয়েচে, এমনতর খিলখিল করে হেসে উঠল। পলকে নন্দর তেজ বিবর্ণ হয়ে গেল। চাঁপা বললে, বেশ, তোমার যত খুসী, জিনিসপত্তরের দর নাবিয়ে দাও। গরীবরা তো তাহলে বাঁচে। তারা কিন্তু সস্তাদরে কিনে অন্য বাজারে চড়া দরেই বেচবে। লাভ তাদেরই, তোমার কি? জিনিসের দর নাবিয়ে কতদিন চালাবে। কত লোকসান খেতে পারবে, পুঁজি তো মোটে চার হাজার! আমাদের পুঁজি বিশ হাজার, জান?

নন্দ যেন মরা। এমনি করে চেয়ে রৈল। চাঁপা বললে, তুমি ভেবেচ তুমি দর নাবিয়ে দিচ্চ, আমরাও পাল্লা দিয়ে দর কমাতে থাকব? সে কথা স্বপ্ন। বয়ে গেছে আমাদের লোকসান খেতে। আমরা কি করব জান? আড়ত বন্ধ করে দেব। নগদ টাকা আমাদের যথেষ্ট মজুত আছে। আমরা আম, কাঁঠাল, নারকেল, সবজী, গুড় এইসব কাঁচা মালের ব্যবসা করব। আর যেই

দেখব তুমি কম দরে বেচে বেচে হায়রাণ হয়ে একটু দর চড়িয়েচ অমনি আমরা তোমার চেয়ে এক পয়সা সস্তায় জিনিষ বিকোব। কি করবে তুমি? জেদে পড়ে, আবার দাম নাবাবে তো? আমরাও অম্‌নি আড়ত বন্ধ করে দেব। আর কখন মাথা তুলতে পারবে না।

উঃ কী ঝাঁজ চাঁপার চোখে। নন্দ যেন পুড়তে লাগল। কিন্তু নন্দর অবস্থা দেখে চাঁপার হাসি এল। বললে, জিগ্যেস করে দেখ তোমার মুকুজ্জেমশাইকে, বলেচে কিনা, পাঁচশ লেঠেল ওর হাতে? লুঠতরাজ করে আগুন লাগিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে কিনা? নন্দ মুদীর ভিটে মাটি জংলা করে দেবে কিনা। আমার হুকুম চেয়েছিল, জান নন্দ? আমি, ভাবলুম আহা মুদীর ছেলে, টাকার লোভ পড়েচে। সেই লোভেই তো সে একদিন মরবে, আর তাকে মারা কেন!

অতবড় তেজী ভুঁড়ি-অলা নন্দ মুদী এ কি করলে! একেবারে হাঁউমাঁউ করে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ল! বললে, মুকুজ্জে গিন্নি, তুমি আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। আমি শুনিছিলুম, তুমি শশীকে কোলে করে নিয়ে একা একা আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াও। এখন দেখচি, তুমি মা সামান্য মেয়ে নও। তুমি বামুনের মেয়ে, আমায় পায়ের ধূলো দাও। বলে সত্যি সত্যি, উপুড় হয়ে পড়ল মাটির ওপর। চাঁপা ব্যস্তভাবে বললে, ওমা একি! বলে একটু পিছিয়ে গেল। কিন্তু নন্দর গোঁ পাঁয়ের ধূলো নেবেই। অবশেষে চাঁপা নিজের সত্যিকার চালে পাশ কাটিয়ে তড়াক করে এক লাফে বাইরে এসে পড়ল।

পাথরের মানুষ হেঁটে এলে যেমন দেখায়, চন্দরকে তেমনি লাগল।

(১৫)

চাঁপা গাড়িতে উঠতে যাবে। কিন্তু পারলে না। ওর দিকে একটা লোক কিরকম করে চেয়ে রয়েচে যে। চাঁপা মাথার কাপড় সরিয়ে তার দিকে দেখতে লাগল। লোকটাও কেমন করে যেন চাঁপার দিকে এগিয়ে এল। চেয়ে চেয়ে চাঁপা চমকে উঠ্‌ল। বললে, ওমা তারিণী দাদা যে!

তারিণী বললে, তাই ভাবছিলুম চাঁপা, তুই কোথা থেকে এলি! একথা চাঁপার কানে গেল না। বললে, তুমি এমন হ'য়ে গেলে কেন তারিণী দা?

তারিণী নিজের শরীরের দিকে একবার চেয়ে কিরকম করে একটু ম্লানভাবে হাসলে। চাঁপার মন একেবারে টনটন্ করে উঠল। বললে, তুমি ভাই, চল আমার সঙ্গে, যাবে না?

তারিণীর কাজ আছে। আড়তে মালপত্তরের খরিদ করতে এসেচে। কিন্তু সে কথায় চাঁপার কান নেই। চাঁপা বললে, সে হবে এখন। আমাদেরও তো আড়ত রয়েচে। তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। মাগো কি হয়ে গেছ! একেবারে কাঁটাসার!

চাঁপা গাড়িতে উঠে বসল। ছইয়ের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে চন্দরের দিকে চেয়ে বললে, তুমি চেন না ওকে, ওমা, ও যে তারিণী দা। আচ্ছা ভাই, তোমাকে কতদিন দেখিনি বলত?

গাড়ির পেছনের বাঁশ ধরে ধরে তারিণী চলেচে। চাঁপাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে গিয়ে তারিণীর ভাল লেগেচে। কিন্তু তাই বলে চাঁপা ওকে অমন করে ডাকবে! তারিণীর জীবনের ইতিহাস আছে। হয়ত সামান্য এবং সাধারণ। সেটা অবহেলা। তা তো পৃথিবীর লক্ষ লোকে পায়। কিন্তু কোন মানুষে সেটা কেমনতর ফুটে ওঠে, সেইটেই কথা। তারিণীতেও তেমনিতর একটা কষ্ট ফুটে উঠেচে। যা দেখলে দয়া হয় না, মায়া পড়ে। মনে হয় ওকে নিজের হাতে তুলে নিই।

চাঁপা জিগ্যেস করতে লাগল, হাঁ তারিণী দা বল না, তোমার কি অসুখ করেছিল? এত রোগা হয়ে গেচ। মাগো, তোমার দিকে চাওয়া যায় না!

তারিণী মুখ তুলে একটুখানি হাসল। রুগীর মুখের ক্লান্ত, নিষ্প্রভ হাসি।

চাঁপা ব্যস্ত হয়ে উঠেচে। বললে, তুমি ভাই হাঁটতে পারচ না, গাড়ীর ভেতরে এস। রোদ উঠেচে, কষ্ট হবে তোমার।

তারিণী ভাবচে নিজের জীবনের কথা। এসব কথা ও শুনতে পাবে কখনো এমনটা ভাবেনি। বুঝতে পারলে, ভাল লাগচে। চাঁপার কথা ও মনে করতে লাগল। সেই চাঁপা—ধিঙ্গি দজ্জাল মেয়ে, বোকা মতন ছিল বোধ হয়, কি হয়েচে এখন! একেবারে চেনা যায় না। এতটা বদলালো কি করে, সেই কথা তারিণীর মনে আসতে লাগল।

তারিণীর চুপ করে থাকা চাঁপার সহ্য হচ্চে না। ও এমন জেদাজেদি করতে লাগল যে চন্দরই শেষে তারিণীকে গাড়ীতে উঠতে বললে।

তারিণী বললে, পথ হাঁটতে কষ্ট কি? এতটা পথ এসেছিলুম তো, যেতুমও। তাতে কি? না, গাড়িতে উঠতে হবে না।

চাঁপার মনের একটা তেজ আছে। সে কথা ও নিজে জানে না। তেজটা যেমনি সরল তেমনি স্বচ্ছ। তার কাছেই অনেকে মাথা নুইয়ে এসেচে। আজ যে ওর সেই তেজ তারিণীর কাছে পরাজিত হল, এত কথা তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতা চাঁপার নেই। তারিণীর এই যে প্রত্যাখ্যান অথবা ঔদাসীন্য। এতে তো চাঁপার মত মেয়ের গর্জ্জে ওঠবার কথা। জোর করবার কথা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তারিণীর হাত ধরে টানাটানি করার কথা।

তারিণীর এই তেজের ইসারাটা চাঁপার ভাল লেগেচে। যেন দুটো মনের তেজ পরস্পরের দেখা পেলে! তাই দুজনেই চুপ করে রৈল।

চন্দর বললে, ছোটগিন্নি, আমি এখান থেকে আড়তেই ঘুরে যাই। ওখানেই খাওয়া দাওয়া করব। তুমি বাবাজীকে নিয়ে যাও। তোমার গাঁয়ের লোক। আমাদের কুটুম্ব। দেখ যেন চন্দর মুকুজ্জের নিন্দে না হয়। আর বাবাজীকে আজকে ছেড় না। আমি ফিরে গিয়ে ভাল করে আলাপ করব।

চাঁপার মুখে কোন কথা নেই। হয়ত ভাবচে তারিণীর কথা। কিম্বা ওর গ্রামের কথা। তারিণীর মুখে কথা নেই। ওর গায়ে পুরণো একটা ছিটের কোট। ক'জায়গায় ইঁদুরে কেটেচে। একটাও বোতাম নেই। পেটের কাছে একটা সেফ্‌টিপিন গেঁথেছে। তবুও জামাটা ফাঁক হয়ে আছে। বুকের কাছটায় খোলা। পাঁজরার কাঠিগুলো উঁচু হয়ে রয়েচে।

গ্রামে ম্যালেরিয়া-ভোগা হাড় জিরজিরে লোক নেই যে এমন নয়। তবু চাঁপার মনে হতে লাগল, এমনতর মানুষ যেন আর দেখেনি। ওর মনের ভেতরটা কষ্টে কেমনতর হয়ে উঠল। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে তারিণীর দিকে চেয়ে বার বার নিজের কাছে অনুযোগের সুরে কৈফিয়ৎ চাইতে লাগল। কেন ও এমন হল! তারিণীর সঙ্গে ওর বেশী ভাব ছিল না। ও চাঁপার মায়ের সুদের টাকা আদায় করত। তখন দেখেচে, মোটাসোটা, কালমতন

মিষ্টিমতন একটা ছেলে। ভাল করে কথা বলতে জানত না। মা বলত, সুদের টাকা তুই চুরি করিস, রাম মিত্তির কখনই অমন লোক নয় যে আজ নয় কাল বলে ফেরাফিরি করবে। আমি যে তাঁর সামনে বেরোই না, তা হলে দেখতিস তোর চুরি করা বার করে দিতুম। সেই তো ছেলেটা, চাঁপা দেখেচে, শুধু চুপ করে থাকত, আর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ত। চাঁপা তখন কতটুকুই বা। তার ওপর মাকে যমের মতন ভয় করত। কিন্তু বাইরে এসে তারিণীকে কতবার বলেনি কি, তুমি ভাই, এ কাজ ছেড়ে দাও, মা যেন রাক্কুসী, কবে মরবে তাই ভাবি। সকলকে কেবল খাই খাই করচেন। ঠিক মনে আছে চাঁপার, তারিণী চুপ করেই থাকত। তারপর মা গেল মারা। তারিণীকে আর দেখেনি। তারপর কতদিন কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেল তার মধ্যে তারিণীর কথা একদিনও মনে পড়েনি। আজ চাঁপার হঠাৎ মনে হল, তারিণী তার খুব নিজের লোক। ওর অমন কষ্ট ও চোখ চেয়ে দেখতে পারবে না তো। হোক না তারিণী রোগা। কিন্তু তাই বলে মুখখানা অমন কষ্টের কেন, কি হয়েচে ওর?

চাঁপা ডাকলে তারিণী দা, কষ্ট হচ্চে তো, যে রোদ্দুর!

তারিণী শুধু একবার ওর দিকে চাইলে।

চাঁপা যেন রেগে উঠেচে। বললে, বাহারে, কথার জবাব দিতে পার না বুঝি?

তারিণী ভয় পাওয়ার মতন চোখ বড় বড় করে ওর দিকে চুপ করেই চেয়ে দেখলে শুধু। কিন্তু তারিণী বোধ হয় চাঁপার চোখে তেজের একটা জ্বলন দেখেচে। কি জানি, মনে ভয় পেলে কিনা। তাড়াতাড়ি বললে, দাঁড়া ভাই একটু। এই পুকুরের জলটা ভাল মনে হচ্চে, বড় পিপাসা লেগেচে।

চাঁপা গাড়ি থামিয়ে মুখ বাড়িয়ে রৈল। তারিণী হন হন করে পুকুরের পাড় বেয়ে নেবে দাঁড়াল এক হাঁটু জলে তারপর ইঁদুরে খাওয়া কোটের হাতা গুটিয়ে আঁজলা ভরে জল খেতে লাগল। চাঁপা ওর জল খাওয়া দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেচে। ভাবতে লাগল, জল কি আবার একটা খাবার জিনিস, যে তাই বলে অমন করে খেতে হবে! মানুষের জল খাওয়ার জন্য অত আগ্রহ ও আর কখনও দেখেনি। মনে পড়ল দিনগুলো, ও যখন একাদশীর দিনে নির্জ্জলা

উপোষ করে থাকত। তারিণী এক গাল হাসি নিয়ে ফিরে এল। বললে, জলটা বেশ মিষ্টি রে। তুই খাবি নাকি ?

চাঁপা বললে, তারিণী দা, এইবার তোমাকে গাড়ীর ভেতর আসতে হবে, পথ এখনো ঢের বাকি। তোমার কোন কথা শুনব না।

তারিণী কি একটু ভেবে নিলে। বললে, আচ্ছা।

চাঁপার খুসী লাগলে রূপ বদলে যায়। মুখে যেন কতখানি আলো পড়ে। ঝলমল করে তার চমক। হঠাৎ চোখে লাগলে, থেমে পড়তে হয়। নিজের নিজের মনে মনে বলতে ইচ্ছে করে, দেখ দেখ।

চাঁপা বললে, তোমার খিধে পেয়েছে, তারিণী দা ? গাড়োয়ানের পেছনে বসেচে তারিণী। কি রকম যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল। মাথা চুলকে বললে, পেয়েছিল, এখন আর নেই।

চাঁপা বললে, তোমার কি অসুখ করেছিল বল তাই।

তারিণী বললে, অসুখ, কৈ—

চাঁপা ছাড়বে না। বললে, তবে ?

তারিণী নীরব। চাঁপার জেদাজেদি বেড়ে উঠল। তারিণী খানিকটা চুপ করে থেকে বার কয়েক ওর মুখের দিকে চাইল। বুঝলে, পরের কথা জানবার জোর চাঁপার আছে। ওর কাছে নিস্তার নেই। প্রাণের টান দিয়ে মনের কথা বার করবেই। বললে, খেতেই পাই না, তার কি হবে

চাঁপার ডাকে আর তারিণীর সাড়া নেই। খানিক পরে বললে, সে অনেক কথা।

চাঁপার জোর। বললে, হোক অনেক কথা। বল তুমি সব।

তারিণী নিজের মনের ভেতর তলিয়ে গেল। ওর কষ্টের কথা কেউ জানতে চায়নি। আজ ওর মনে জাগল একটা আহ্লাদ। মনে হল, নিজের কথাগুলো অনেকদিন থেকে জমে ভারি হয়ে উঠেচে। বলতে গেলে হয়ত ভালই লাগবে। শুনেচে, দুঃখের সময়ে লোকে কেঁদে মন হাল্কা করে।

চাঁপা ওর কোটের কোণে টান দিয়ে বললে, চুপ করে রৈলে যে !

থতমত খেয়ে তারিণী বললে, বলচি। সমস্ত মন দিয়ে চাঁপা যেন ওকে গ্রাস করেচে। বেচারির এড়াবার উপায় নেই। আবিষ্টের মতন চাঁপার দিকে ফিরে বসে আনতমুখে বলতে লাগল।

কিন্তু আজেবাজে কথায় চাঁপার দরকার কি। ও জানতে চায় সেই মূলটা, যেখান থেকে তারিণী শুকিয়ে উঠেচে। তাই বাজে কথা বাদ পড়ল।

তারিণী বললে, কি শুনবি চাঁপা ? কিবা তোর লাভ। আমার কোন উপকার হবে না। তোর জেদের সঙ্গে পেরে উঠব না। শোন্। মনে আছে, যুগল কাওরাকে ? সেবারে ওলাওঠায় মরল যখন, কি আর করি, দলে পড়ে তাকে পুড়িয়ে এলুম। এই দোষ। কাকা বললে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, বামুনের ছেলে হয়ে কাওরার মড়া—সবাই ছি ছি করতে লেগেচে। বল ত, মড়ার আবার জাত থাকে নাকি। আমি রাজি হলুম না। কিন্তু কাকীর জন্যেও তাও করতে হল। গোবর খেলুম। সবই হল। কিন্তু নতুন বিপদ বাধল। যুগলের একটা বিধবা মেয়ে আছে না ? তাকে দুদিন দেখতে গেছিলুম, একলাটি মেয়েটা কি করচে। আর কি, আমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেল। সমাজের কাছে হাতজোড় করে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাইতে হবে। তা নৈলে নিস্তার নেই। মোড়লদের আসর বসল তোদের বার-উঠোনে। গোড়ায় আমি রাজি হয়েছিলুম। ভাবলুম, কিই বা লোকসান তাতে। কিন্তু ওরা মেয়েটার কথা তুলে এমন সব বিশ্রী গালাগাল দিতে লাগল। কি করে মাথা ঠিক রাখি।

চাঁপা ওর হাতে একটা টান দিয়ে বললে, কি বলচ তারিণী দা, কিছু বুঝতে পাচ্চি না। কাকে গালাগালি করলে ?

তারিণীর মাথায় পুরণো রাগের ঝাঁঝ জেগে উঠেচে। বললে, কাকে আবার, আমাকে আর রূপোকে, দুজনকেই।

নতুন রাজ্যের দরজার কাছে চাঁপা এসে থেমেচে। বোঝবার আন্তরিক আগ্রহ আছে। অথচ কিছু বোঝা যাচ্চে না যে। বললে, বাহারে, একজনকে বিপদের সময় দেখতে গেচ, তাতে দোষ কি ?

তারিণী সহায় পেয়ে একেবারে গর্জ্জে উঠেচে। আর বিশেষ করে ওর মতন নিরীহ ভাল মানুষের তেজ দেখলে আশ্চর্য্য লাগে। বললে, কি জানি। বলে কিনা, অতবড় ধাড়ি মেয়ের কাছে যাতায়াত ভাল নয়।

চাঁপা একেবারে অবাক। বললে, ওমা, সে কি ! কেন তারিণী দা কি দোষ ?

তারিণী ওর মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল। চাঁপার মুখের দিকে চেয়ে ওর আশ্চর্য্য লাগল। মনে পড়ল, সেই পুরণো চাঁপাকে। দস্যি মেয়ে, টো টো করে বেড়াত, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে, কোথায় মাছ, কোথায় ফল, কোথায় কি—এই করে। মেয়েলি মনের ভাব যার ছিল না। মনের চেয়ে যার চোখ দুটো বড়। শুধু দেখতে রাজী আছে যে। কারুর কথায় তো ওর কান ছিল না। আজকের এত বড় চাঁপা, এতো সেই মেয়েই তেমনি রয়েচে। এত বয়সে তার কোথায় কেমনতর অদল বদল হল কে জানে।

চাঁপা ওর জামার হাতায় আবার এক টান দিয়ে বললে, তারিণী দা, চুপ করে রৈলে যে! তারিণী বললে, তারপর গোঁসাই দাদা—। চাঁপা একেবারে ঝমঝম করে বেজে উঠল। বললে, ওসব কথা রাখ। যা জিগ্যেস করলুম, তাই বলো আগে, বড় মেয়ের কাছে গেলে তো, কি হল?

তারিণী বলবে কি, বরঞ্চ ভয় পেয়ে গেল। যে জীবনের কথা জানে না, তাকে জানাতে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু ভয়ও আছে। না-জানা চাঁপা এইরকম আছে। জানলে পরে এই চাঁপা কিরকম হবে, সেইটেই কথা। এই অজ্ঞাতের ভয় হল কি তারিণীর মনে? কে জানে!

চাঁপা তারিণীর হাড়-বারকরা হাতখানা চেপে ধরলে, হাতে রীতিমত চাপ দিয়ে বললে, না ভাই, তুমি কিরকম করছ। আমার দিকে ফিরে বস আর বল সব কথা।

তারিণী যেন লজ্জায় মরে গেল। সেই কিশোর কালের মুখচোরা। সঙ্কোচপানা ভাব। আড়চোখে সে একবার গাড়োয়ানের দিকে চাইলে। তারপর কচি ছেলের মতন জ্বরজ্বরভাবে চাঁপার দিকে মুখ করে বসে রৈল।

চাঁপার মনে লেগেচে আহ্লাদের একটা দোলা। অতবড় ছেলেটা, অমন কচি মতন মুখ করে যে বসে রৈল। এমনটা চাঁপা আর কখন দেখেনি। তারিণীর ওপর দিয়ে ও একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে।

তারিণী একেবারে হারিয়ে গেল। ওর দোষ নেই, যদি ও মরেও যায়। ও মেয়ে নিজের তেজের জোরে বেঁচে আসচে। আঁড়ালকে সে এড়িয়ে এসে খোলা পথে নিজের জীবনকে তুলে ধরেচে। এযে সেই বনস্পতির সতেজ শ্যামলতা। আর তার সামনে ঐ শীর্ণ রস বঞ্চিত প্রাণ। ঘটল কি যোগাযোগ।

নিলে কি চাঁপা গ্রাস করে? প্রতিরোধ করবার সাধ্য কোথায় তারিণীর। দুর্ব্বল সে বঞ্চিত বলেই তো। আজ পেয়েচে, চারিদিক থেকে প্রাণের সাড়া। মনে হল বুঝি, আবার জাগবে ও যেমন করে জাগে মানুষে প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে। সবদিক থেকে ঘিরেই চাঁপা ওর মনকে ছুঁয়েচে। তৃপ্তিতে আশ্বাসে তারিণীর ভেতর থেকে নিশ্বেস বেরিয়ে এল।

গাড়ি থামল। গাড়োয়ান বললে, মা ঠাকরুণ, নাবতে হবে গো।

চাঁপা চমকে উঠল। ওর চোখের ওপর তারিণীও। বুঝতে পারলে, অনেকক্ষণ ওদের মধ্যে কোন কথা হয়নি। কেমন করে কে জানে, চাঁপা লজ্জা পেলে। তারিণী তখন নেবে দাঁড়িয়েচে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বাঙালীর শিক্ষা ও বাঙলার সাহিত্য

শিরোনামার দু'টী বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যাভাবের সমস্যা নিয়ে এ প্রবন্ধে সাধ্যমতো কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো।

আসলে আধুনিক কালে ওর একটি বাদ দিলে আর একটি অর্থহীন। সকল ভাষাভাষীদের বেলাতেই জাতীয় শিক্ষা ও সাহিত্য একে অন্যের অবলম্বনে পুষ্ট হয়, পরিস্ফুট হয়, স্বদেশীয় সমাজে ব্যাপ্তও হয়। হাল আমলে অশিক্ষিত সাহিত্যিক কল্পনাতীত। যে কোন কারণে বা কারণের সমষ্টিতেই হোক, জীবনের রূপ বদলে গেছে; সেই রূপ বদলের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত না হ'য়ে, তার সম্যক জ্ঞান অর্জন না করে বড় সাহিত্য রচনা করা চলে না; জীবন ছাড়া সাহিত্যের কোন ভিত্তি নেই। আর শিক্ষিত সাহিত্যিকের রচনার রসোপলব্ধি যে পাঠক করবে তাকে শুধু রসিক হলেই চলবে না, শিক্ষিতও হ'তে হবে। যেহেতু, যদিও "সচেতনানুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্," তবু অনুশীলনের অভ্যাসও ঐ সঙ্গে চাই; সে অনুশীলন শিক্ষিত অনুরাগীর। সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা থাকলে চলবে না। এই এক দিক। ওদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্যের স্থান নিয়ে কোন মতভেদ নেই। এমন কি বিজ্ঞান শিক্ষায়ও সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। ভাব, ভাবনা বা চিন্তার যথাযথ প্রকাশ, বক্তব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা, বেশী বা কম না বলে ঠিক যা, তাই বলা—সুসাহিত্যের এসব গুণ বৈজ্ঞানিক বিষয় লিপিবদ্ধ করতে আরো বেশী দরকারী; আর রচনায় এই গুণাবলী অর্জন করার অর্থই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা। এ সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাঁর ছাত্রদের এই উপদেশ দিচ্ছেন: "One result of the comparative neglect of the literary side of education by many men of science is conspicuously seen in their literary style.…The literature of science is burdened with a vast mass of slipshod, ungrammatical and clumsy writing, wherein sometimes even the meaning of the authors are left in doubt. Let me press upon you the obvious duty of not increasing this unwieldly burden.

Study the best masters of style, and when once you have made up your minds what you want to say, try to express it in the simplest, clearest and most graceful language you can find." বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর প্রতি এই উপদেশ অতি মূল্যবান। তা হলে দেখা গেলো, শিক্ষা ও সাহিত্য পরস্পর নির্ভরশীল। বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সাহিত্য যদি এই রীতিতে একে অন্যের পরিপোষক না থেকে থাকে, বুঝতে হবে দু'য়েরই মূল আশ্রয়-মাটি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সব দেশেই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন গাথাকাব্য, কাহিনীকাব্য, সঙ্গীত ও নাটক। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের আগে সাহিত্য সমাজে প্রচারিত হ'য়েছে আবৃত্তি, কথকতা, গান ও অভিনয়ের মারফৎ। পৃষ্ঠপোষক ধনী ও পরম ধৈর্য্যশীল গুণীর গৃহে হয়তো দু'চারখানা হস্তলিখিত পুঁথি থাকতো, পণ্ডিত অধ্যাপকের কুলুঙ্গীতেও ধর্ম দর্শন সাহিত্য ব্যাকরণাদি বিষয়ক, বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত পুঁথি রক্ষিত থাকা সম্ভব। পুঁথি প্রায়-অপ্রাপ্য ছিল বলেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সূত্র ছিল—"আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাম্"। সহজেই অনুমিত হতে পারে, সব ভাষাতেই সাহিত্যের শৈশবে সাহিত্যিকের শিক্ষা ছিল দেশেকালে একান্ত সীমাবদ্ধ। বাইরের তো দূরের কথা, স্বদেশের ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সহিত পরিচিত থাকাও সব সময়ে তাঁদের সম্ভব হতো না। সাহিত্য-রসিক পাঠক সর্বদাই ছিল না বলে প্রাকৃত জনের সহজ ভাষাজ্ঞান, হৃদয়ের সহজাত রসচেতনা ও সাড়া দেবার প্রবৃত্তিই ছিল উপলব্ধির সহায়ক। বঙ্গদেশের প্রাগাধুনিক সাহিত্য, বলা চলে, জনসাধারণের সাহিত্য। বৌদ্ধ দোঁহা হতে সুরু করে আধুনিক যুগের প্রান্তশায়ী ভারতচন্দ্রের রচনাও আবৃত্তি, কথকতা, কীর্তন, লীলাকীর্তন প্রভৃতির বাহকতায় সাধারণ্যে প্রচার লাভ করেছে। সাহিত্যিকের যতোই শিক্ষা থাক না কেন, যেমন প্রায়শই বাঙলা ভাষার লেখক সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন, জনসাধারণের পক্ষে সে শিক্ষা খুব প্রয়োজনীয় ছিল না। অধিকাংশ শ্রোতাই নিরক্ষর—কিন্তু কবিরা এই ইতর (কদর্থে নয়) জনগণের মুখ চেয়েই কাব্য রচনা করতেন। হাটের আনন্দোল্লাসে স্রষ্টা কবির শ্রম সার্থক হতো, কাব্য ছিল হাটেরই জিনিষ। কিন্তু এই দুই প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ শিক্ষা-

সূত্রে স্থাপিত হয়নি, হয়েছে অশিক্ষা সত্ত্বেও। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশেষ শিক্ষায় পুষ্ট কাব্যানুশীলনতীক্ষ্ণ অনুভূতিবান পাঠক ও রসবেত্তা সমাজে হয়তো ছিল, কিন্তু কবির সম্মুখে থাকতো বৃহত্তর সমাজ—যাদের হৃদয়ে কাব্য পৌঁছুতো ভিন্ন পথে। পাঠের সুর, ছন্দের দোলা, কণ্ঠের মাধুর্য্য, আবৃত্তির হাবভাব ভঙ্গী ও ব্যঞ্জনা—সব মিলে প্রাকৃত জনের রসোপলব্ধিকে সাহায্য করতো। কবি তখন সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন অদ্ভুত জীববিশেষ বলে বিবেচিত হতো না, দু'য়ের সম্বন্ধ ছিল প্রগাঢ়। জীবন যাপনে আদর্শ প্রচার ও আনন্দ পরিবেশনের দায়িত্ব ছিল কবির, কবিরা সে কাজ ভাল ভাবেই করেছে।

তারপর এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গেই পশ্চিমী, বিশেষ করে, ইংরেজী সাহিত্যের ধাক্কায় কেমন করে সব ওলটপালট হলো, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সেই ইতিহাসের সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। প্রসঙ্গত যতোটুকু দরকার সে ইতিহাসের ততোটুকু আলোচনাই আমি করবো।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রথম বড় কবি মধুসূদন, এও জানা কথা। 'প্রভাকর' সম্পাদক অবশ্য ইংরেজী-জানা লোক, কিন্তু তাঁর ইংরেজী শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়েছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। কবি হিসেবে তিনি প্রাচীন বাঙলা কাব্য-ঐতিহ্যের জের টেনেছেন, তাঁর কবিতায় যুগসূচনার আভাষ নেই। সাহিত্যে releasing force হবার প্রতিভা তাঁর নয়। কাব্যের স্রোতোমুখ খুলে একে সেই মুক্তি দিয়েছেন মধুসূদন। সমুদ্র আর দূরে নয়, বাঙলার কাব্য-সুরধনীর তীরে বসে সেদিনের বাঙালী অনভ্যস্ত কানে শুনলো সমুদ্রের গভীর জলকল্লোল। মধুসূদনে এসে বাঙলা কাব্যের পথ চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে গেলো। কাব্যে তো এই।

বাঙলা গদ্যরীতির গোড়া পত্তন আদৌ হয়ে গেছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ও শ্রীরামপুরে। দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে হয় গদ্যের সৃষ্টি, গদ্য মুখের ভাষা। ইংরেজ সিভিলিয়ানগণের বাঙলা শিক্ষা, মিসনারিগণের খৃষ্টধর্ম প্রচার, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারকগণের সামাজিক মত প্রচার এবং সাংবাদিকতা—এসবের প্রয়োজনেই বাঙলা গদ্য সৃষ্ট হয়েছে। তবু বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাঙলা গদ্যেও দু'টি ধারা চলে এসেছে। একটিকে বলা

চলে লৌকিক—কথোপকথন, আলাল, হুতোম প্রভৃতি এই ধারার ; দ্বিতীয়টি সংস্কৃতপন্থী, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র এসে বাঙলা গদ্য তৃতীয় রূপ নিয়েছে। সংস্কৃত ও অপর দু'য়ের যোগে সাবলীল সহজ অথচ অলংকৃত গদ্যরীতি আবির্ভূত হয়েছে—যে গদ্যে বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহ রচিত হলো। বাঙলা সাহিত্যের দ্বিতীয় বড় কবি বঙ্কিম। কাব্যের এই বিশিষ্ট রীতিও বাঙলা সাহিত্যে নতুন। অল্পদিনের ব্যবধানে মধুসূদনের পর বঙ্কিম আবার নতুন পথ কেটে দিলেন, বাঙলা উপন্যাস চলতে সুরু করল। ওদিকে সাহিত্য পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে বঙ্কিম বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ-সাহিত্যেরও বাহন সৃষ্টি করলেন।

বস্তুত ইংরেজী শিক্ষা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে, বলা চলে, বাঙলা দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবও সুরু হয়েছে। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের যে প্রচেষ্টা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরে আমরা দেখি, তাও যেমন সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ফলে, সাহিত্যের নতুন গতিপথ আবিষ্কারও তেমনি। উল্লিখিত সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের প্রত্যক্ষ ফল। ওর বিষয়বস্তু স্বদেশী হলেও ভাব আর অঙ্গ দু'ই বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবান্বিত। সুতরাং এ সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করবার প্রয়োজনীয় cultureও (সংকীর্ণ অর্থে) বিদেশী, বিশেষভাবে ইংরেজী সাহিত্যানুশীলনের culture। সেদিন এবং এদিনেও, বেশী লোক এই culture-এর অধিকারী বলে দাবী করতে পারেনি। কলকাতা আর তার চার পাশে অবশ্যই একটা মণ্ডল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মিসনারিগণের শিক্ষা প্রচার চেষ্টা হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত যে রেটে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা ধ্বংস হয়েছিল, ততো দ্রুত ইংরেজী শিক্ষা বিস্তৃত হয়নি, হতে পারেও না। ধরে নেওয়া যায় এই নবীন সাহিত্য সীমাবদ্ধ হয়েছিল সেই স্বল্প সংখ্যক সুশিক্ষিতের মধ্যে। জনগণের সঙ্গে সংযোগবিচ্ছিন্ন সাহিত্যের লোকসাহিত্য হ'বার দাবী নেই ; আর মুদ্রাযন্ত্রই যে সাহিত্যে প্রচারের একমাত্র মাধ্যম, অশিক্ষিত, এমন কি অল্পশিক্ষিতেরও সে সাহিত্য অনধিকার। বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনায় বঙ্কিম পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রচার প্রসঙ্গে বলেছিলেন বাঙ্গালীরা "সুশিক্ষিত বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া

সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর। বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।...আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা করিব।" উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বঙ্গদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল। কিন্তু "আপামর সাধারণের পাঠোপযোগীতা" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণের মধ্যে বঙ্গদর্শন কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। বস্তুত ঐ বিরাট পুরুষের আদর্শই ছিল ভিন্ন: "যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে বুঝিতে না পারে সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল।" রচনার মান নামিয়ে সাধারণপাঠ্য সাহিত্যসৃষ্টির ছেলে-মানুষী তাঁর ধাতে ছিল না। "নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সংবর্দ্ধন" তাঁর মতে লোকশিক্ষা প্রচারের একটি উপায়। উক্ত নিবন্ধেই শিক্ষার filtration theoryর তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের অনিষ্টকারিতা আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতের অতি কুফলপ্রসূ বর্ণ বৈষম্যের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—"এখানে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্য প্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।" এই প্রসঙ্গে 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কালে বৃহত্তর সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে যোগাযোগের একটি সূত্র ইংরেজী শিক্ষারম্ভের প্রথম যুগে সেকালের বাঙ্গালীর চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সে সম্ভাবনা ফলপ্রসূ হয়নি। আমি বাঙলা রঙ্গমঞ্চের কথা বলছি। ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বাঙলা দেশেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার কথা ছেড়ে দিলেও বাঙলার প্রত্যেক জিলা ও মহকুমা সহরে এমন কি ছোট ছোট গ্রামেও এমেচর থিয়েটর ক্লাব গঠিত হয়েছে; এই সিনেমা-অধ্যুষিত যুগেও সে সব বহু ক্লাব জীবিত আছে। ঊনবিংশ শতকের জাতীয় ভাবধারা প্রচারে রঙ্গমঞ্চ ক্ষুদ্র হলেও একটি সঙ্গত অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেও বলতে গেলে একটা উচ্ছ্বাসের মুখে। আসলে আমাদের সংকীর্ণ, পাঁজি-নিয়ন্ত্রিত নির্বিরোধ জীবন-যাপনে নাটকীয় ঘটনাবৈচিত্র্য, গভীরতা ও গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব। আবার আমাদের

ভাব-কল্পনা জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের তীব্র জৈব আনন্দ বা বেদনার বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত নয়; বাঙালী প্রতিভায় নাটকীয় বস্তুনিষ্ঠা বা objectivity নেই বললেই চলে। বাঙালী নাট্যকারের রচিত নাটকে তাই জীবন-সত্য নেই, ভাণ আছে, এদের tragedy তাই melodrama; সূক্ষ্ম রসিকতার বদলে বাচাল ভাঁড়ামী আছে, comedy তাই farce. মোটের উপর বাঙলা মঞ্চ সাহিত্য প্রচারের বাহন হিসেবে ব্যর্থ; কারণ বাঙলা নাটক সুসাহিত্য নয়। নিয়মের ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে আছে, কিন্তু আমাদের রুচিবোধই এমন বিকৃত যে মঞ্চের আসরে তারা কল্কে পায় না।

এ পর্যন্ত পাঠে এমন ধারণা সম্ভবত কেউ করবে না যে, লোকসাহিত্য নয় বলেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে এখানে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। আমার তো ধারণা, একালে কোন সাহিত্যই আর প্রকৃত প্রস্তাবে লোকসাহিত্য হতে পারে না, যতদিন না সমাজ ব্যবস্থায় অদলবদল ঘটে। মানুষের জীবনযাত্রার জটীলতার ছাপ সাহিত্যে পড়ে ব'লেই জটীল রূপ নেয় সাহিত্য, তাই সাহিত্য আর এখন আপামর সাধারণের নয়। তবু একটা কথা: যে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা নব্বই, সেখানে সাহিত্য যে অর্থে শিক্ষিতের, শতকরা দশজন যে দেশে শিক্ষিত, সেখানেও ঠিক সেই অর্থেই সাহিত্যকে শিক্ষিতের বলা চলে না। যাই হোক এতদূর আমি যা বলতে চেয়েছি তা এক কথায় এই:—য়ুরোপীয় এক অতিপ্রাণবাণ জাতির শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য যেদিন হতে নতুন পথের পথিক হল, ঠিক সেদিনই উক্ত অসামঞ্জস্যও একই সঙ্গে আমাদের জীবনে ঢুকেছে। গত এক শতাব্দীতে সাহিত্যের যে বিচিত্র ফসল বাঙালীর ঘরে উঠেছে তাতে বিস্মিত হয়েও তাই এ প্রশ্ন আজ করা চলে—বাঙালীর সাহিত্যিক রুচি কতদূর এগুলো? অবশ্য বলা উচিত "শিক্ষিত বাঙালীর সাহিত্যিক রুচি"—যেহেতু আমরা স্বীকার ক'রে নিচ্ছি যে এ সাহিত্য শিক্ষিতের। যদি এমন দেখা যায় যে শিক্ষিত বাঙালীর সাহিত্যিক রুচি সত্যি বিকৃত হয়েছে তার কারণ আমাদের শিক্ষার মধ্যেই খুঁজতে হবে।

বাঙালী সাহিত্যিক মহলে একটা নালিশ অহরহ শুনতে পাই—এক উপন্যাস ছাড়া অন্য শ্রেণীর সাহিত্যের বিক্রি নেই, এমন কি উপন্যাসের বিক্রিও সীমা-

বদ্ধ। উপন্যাস লিখে বাংলাদেশে (রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে) দু'চার পয়সা করেছেন এক শরৎচন্দ্র। কিন্তু সাহিত্যপুঁথির বিক্রি নেই অর্থ পাঠক নেই, এমন যুক্তি অচল। এও হতে পারে, বাঙলা ভাষায় রচিত সাহিত্য যারা পড়ে তাদের অধিকাংশের পুঁথি কিনবার টাকা নেই। বাঙালী মধ্যবিত্তের দুর্দশার কাহিনী অবিদিত কার? অন্য পথে এর বিচার করতে চেষ্টা করি, অতএব। মফঃস্বল সহরের club বা লাইব্রেরীর কথা ধরা যাক। সেখানে যদি মোট পাঁচশো বই থাকে তার চারশো পঞ্চাশ খানা নিঃসন্দেহে হবে গল্প নভেল, বাকী পঞ্চাশ খানা হয়তো কাব্য, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান সব মিলিয়ে। উপন্যাস ৪৫০ খানার ৩০০ খানা না হলেও ২৫০ খানা তো বাঙলা ইংরেজী ডিটেকটিভ নভেল, ক্রাইম নভেল, থ্রিলার প্রভৃতি হবেই। বাকী দু'শো খানার মধ্যেও ১০০ খানা এমন সব বই আছে যেগুলিকে কেউ সাহিত্য বলবে না। রইলো ১০০। এই ১০০ খানা হয়তো সত্যি ভাল বই। পুঁথি ইস্যুর খাতা খুলে দেখুন যদি বৎসরে ১০০০ খানা বই ইস্যু হয়ে থাকে, তার ৯৫০ খানা নভেল এবং তারো তিন-চতুর্থাংশের বেশী ডিটেকটিভ প্রভৃতি পুঁথি। এর থেকে আমাদের সাহিত্যিক রুচি সম্বন্ধে কোন ধারণা করা চলে কি? আরো একটি উদাহরণ দিই। বাঙলা দেশে সবচেয়ে অধিক প্রচারিত সাহিত্য-পত্রিকাগুলির কথা ধরি—প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী। এর মধ্যে বসুমতীকে নির্বিচারে বাদ দেওয়া চলে। প্রবাসী আর ভারতবর্ষও বঙ্গদর্শন বা সবুজপত্রের অর্থে সাহিত্যিক পত্রিকা নয় নিশ্চয়ই। আসলে ইদানীং সাহিত্য অংশে এদের মূল্য ক্রমশঃ কমে আসছে। প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখাও থাকে, জানি না সেটা পত্রিকা চালাবার কৌশল কিনা। চার পাঁচটা প্রায়ই অপাঠ্য গল্প, দুটি নভেল, নকল ও প্রাণহীণ ভ্রমণ কাহিনী, অদার্শনিক ধর্মচর্চা, নিষ্ফল সাহিত্যালোচনা এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু—এ সবই থাকবে ওতে সর্বদা। তবু প্রবাসী ভারতবর্ষে অনেক কিছু পাঠ্যবস্তু থাকে, মাঝে মাঝে সফল সাহিত্যের নিদর্শন ওতে বেরোয়; কিন্তু ওই বসুমতীরই শুনি প্রচার সর্বাধিক। আবার খাঁটি সাহিত্যিক অর্থেই সাহিত্যিক যে দু'চার খানা পত্রিকা আছে সেগুলির প্রচার তো শুনি উল্লেখযোগ্য নয়। শোনা কথা অপ্রামাণিক, তবু আমার এই ধারণা। আর সাময়িক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অবশ্যই তার পাঠকবর্গের রুচিনির্দেশক।

অতএব অর্থাভাব বাঙলা বই কম কাটতির কারণ এ যুক্তি কিছুদূর পর্যন্ত সত্য হলেও শেষ পর্যন্ত ঐ রুচির কথাটা আসবেই। মধ্যবিত্ত বাঙালী ছেলেদের সিনেমাপ্রিয়তার উদাহরণও একেবারে খেলো নয়। বলা চলে, পয়সা উদ্বৃত্ত হলে আমরা বই না কিনে সিনেমা দেখি, আর বই হাতের কাছে পেলে পড়ি বা না পড়ি, গাপ মেরে দিই। বইএর সম্বন্ধে ঐ দুর্বলতাটুকু এখনো সাহিত্য-প্রীতির শেষ নিদর্শন হিসেবে আমাদের অবশিষ্ট আছে।

ব্যাপার তাহলে এই দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমের কালে তিনি দুঃখ করেছেন সুশিক্ষিত বাঙালীরা বাঙলা পড়তো না, ইংরেজী পড়তো। অবশ্য তখন সুপাঠ্য বাঙলা বইয়ের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ ছিল। আর অগ্রসর কালের সুশিক্ষিত বাঙালী আমরা, বাঙলা বইয়ের সংখ্যাও কিছু কমেনি, আমরা ইংরেজী বাঙলা কিছুই পড়ি না। পেঙ্গুইন ও এভরিম্যানের বই হাতে ক'রে বন্ধুর মেস বেড়ানো এক কথা আর সত্যিকারের পড়াশুনা আর এক কথা। তবে একেবারে কিছু পড়ি না বলা ভুল, পাশের পড়া পড়ি। তবে সে যেন পাশে পড়া, পাশে সিনেমা দেখার মতো, প্রবেশ দ্বারে উপযুক্ত মাশুল দিয়ে নয়।

এজন্য দায়ী আমাদের শিক্ষাবিধান। এই শিক্ষাবিধান আগাগোড়া সব বড়ো বড়ো ফাঁক, পাশ করে সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে গলে বেরুই, ফাঁকে পড়ি নিজেরা (নিজেরা সেটা বুঝি না, কিম্বা অনেক বিলম্বে বুঝি)। ভেবে দেখলে অবাক লাগে—কী সব আয়োজন, কতো সব পথ। অর্থপুস্তক, made-easy, short-cut, cream প্রভৃতি কতো অলিগলি, অন্ধি সন্ধি! হায়রে! ওদিকে শিক্ষার cream যে কোথা দিয়ে দূরে পড়ে তার খোঁজ কে করে? গলদ একেবারে গোড়ায়। আমাদের প্রাইমারী শিক্ষাটাও এমন নিরানন্দ ও ভীতিপ্রদ যে এই শিক্ষার ভিত্তিতে সত্যিকারের শিক্ষার ইমারত গড়ে উঠতে পারে না। বর্তমানে বাঙলা দেশে Free Primary Education নিয়ে যে পরীক্ষা চলছে তার বিধানেও উন্নততর শিক্ষা প্রণালী ব্যাপকভাবে প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা হয়নি। অনভিজ্ঞ, অনেকস্থলেই প্রায় মূর্খ শিক্ষকের উপর শিক্ষার ভার। আবার বেতন এমন নৈরাশ্যজনক, যে তারা যদি একযোগে সব ফাঁকি দিতে থাকে, তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু Primary, Secondary বা University কোনো শিক্ষা বিধান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার

স্থান এটা নয়। গোড়ার গলদ হিসেবে শুধু প্রাইমারীর একটু উল্লেখ করছি। পাশের তাড়া থাকে শিশুকাল হ'তেই আর মাঠে মারা যায় খাঁটী বিদ্যা। সর্বোপরি প্রাইমারী বা সেকেণ্ডারীর শিক্ষকের সাহিত্যিক রুচি ও রসবোধের প্রশ্নটা তোলাই বাহুল্য। দৈবক্রমে কোন ছেলের যদি সাহিত্যিক রুচি পূর্ব হতেই থাকে, এই কঠিন শিক্ষার দাপে সে কেবলি পীড়িত হতে থাকে। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করতে করতে সে রুচির দফা রফা। তারপরে আর বেশী সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। সাহিত্যে এর ফল ফলে।

একটি ফল তো আগেই দেখেছি, বাংলা দেশের শিক্ষিত জনগণ বাঙলা সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক নয়, কোনো সাহিত্যেরই নয়। সব সমাজেই সাহিত্যরসিকের সংখ্যা অল্প, এটা স্বীকার্য্য কথা। কিন্তু সাহিত্যিক রুচিকেও প্রকৃষ্ট অনুশীলনের সাহায্যে গড়ে তুলতে হয়; সহজাত রসপ্রবৃত্তিও যেমন সত্য, সকল বৃত্তির মতোই এ বৃত্তির পুষ্টিও তেমনি চর্চা সাপেক্ষ। আমাদের কালে সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বৃহত্তর পাঠক সমাজে সাহিত্যরসিকের সংখ্যা যে আশাপ্রদ নয় সেটা সাহিত্যচর্চার অভাবে, আর এ অভাব শিক্ষাপ্রণালীরই একটি বিশেষ অভাব। সাহিত্যের রসসঞ্চার অনুভূতিতেই ঘটে থাকে বলে এবং যেহেতু হাতে কলমে দেখিয়ে শুনিয়ে বিজ্ঞান কি অপরাপর শিক্ষার মতো সাহিত্যকেও মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না, সাহিত্যশিক্ষার (বস্তুত শিক্ষা কথাটা এক্ষেত্রে অর্থহীন) সমস্যা সর্ব্বত্রই জটিল। আর সাহিত্যিক রুচি যদি বিকৃত হয় সে নিশ্চয়ই সাহিত্যশিক্ষার দোষ। এ সম্বন্ধে বেশী বলতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন।

আসলে নিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলাটা খুব বড়ো কথা। সাহিত্যানুশীলনে পাঠকের আত্মিক উন্নতির দিকটা তো আছেই, পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তুলতে সাহিত্যের চেয়ে বড়ো কোনো শক্তি নেই। কিন্তু একদিক দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, নিরপেক্ষ, সহৃদয় পাঠক-সমাজ সাহিত্যকেও উন্নত করে তুলতে পারে। এ সম্বন্ধে Virginia Wolf-এর একটি ভারী সুন্দর মন্তব্য আছে, আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্যে একটু দীর্ঘ হলেও সেটি তুলে দিচ্ছি :—

But still we have our responsibilities as readers and even our importance. The standards we raise and the judgements we pass steal into the air and become part of the atmosphere which writers breathe as they work. And that influence if it were well-instructed, vigorous and individual and sincere might be of great value now when criticism is necessarily in abeyance ; when books pass in review like the procession of animals in a shooting gallery and the critic has only one second in which to load and aim and shoot and may well be pardoned if he mistakes rabbits for tigers, eagles for barndoor fowls or misses altogether and wastes his shot upon some peaceful cow grazing in a further field. If behind the erratic gunfire of the press the author felt that there was another kind of criticism, the opinion of the people reading for the love of reading, slowly and unprofessionally judging with great sympathy and yet with great severity, might this not improve the quality of his work ? And if by our means books were to become stronger, richer and more varried, that would be an end worth reaching.

অপর পক্ষে পাঠক নেই, কিম্বা যারা আছে তারাও শ্লথরুচি—এ চিন্তাটা সাহিত্যিকের পক্ষে প্রীতিপ্রদ তো নয়ই, সাহিত্যের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর নয়। আধুনিক বাঙালী কবিরা যে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে তার মূল কারণ হয়তো এমনি মনোভাবে : যা লিখবো তা যখন কেউ পড়বে না, অতএব পাঠকের দরকার নেই, যা লিখবো তা কেউ বুঝবেও না। আধুনিক কবিতার দুর্বোধাতা শুধুই এ যুগের মানসিক জটিলতার ছাপে, এ যুক্তি চরম নয়, যেহেতু মানসিক জটিলতার অর্থ আভিধানিক জটিলতা নয়। আসলে এ কালের কবিসমাজ পাঠকসমাজকে একেবারে অগ্রাহ্য করেছে। ইংরেজী সাহিত্যের উদাহরণ দেওয়া অর্থহীন ; সেখানেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে। যাই হোক, এ আধুনিকতার নিন্দা করাটা কিছু নয়। একে লাঠি দেখানো সহজ কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় এরও শক্তি আছে। কবিসমাজের এই স্বয়ং-সম্পূর্ণ মণ্ডল ভাঙ্গতে হলে আগে প্রয়োজন হবে পাঠকসমাজ তৈরি করা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনোই প্রতিভাসৃষ্টি নয়, প্রতিভার সৃষ্টি-ক্ষমতাকে কার্য্যকরী করে তোলা, যেন খনিজ লোহাকে temper করে ইস্পাতে পরিণত করা এবং তাতে শান দেওয়া, তাকে ধারালো করা। প্রতিভার সব রকম সংজ্ঞা স্মরণ রেখেও একথা বলা চলে—প্রতিভা অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু শিক্ষা সত্ত্বেও বুদ্ধিবৃত্তি যদি ভোঁতা হতে থাকে বুঝতে হবে প্রক্রিয়ায় ভুল আছে। তরবারির মুখ খাড়া করে পাথরে ঘসলে যেমন ধার উঠে না তেমনি হচ্ছে যেন। মানসিক বৃত্তিগুলির গোড়া সর্বদাই উসকিয়ে, খুঁচিয়ে, জল ঢেলে তাদের সতেজ রাখতে হয়, তবেই তাতে ফল ধরে, অন্যথায় সেগুলি শুকিয়ে যায়। সেদিক দিয়ে ফলের আশা আমরা করি না। যান্ত্রিক নিয়মে কর্কশ ধাতব কণ্ঠে আমরা পরের বুলি আবৃত্তি করি এক একটি সজীব গ্রামোফোনের মতো। আমাদের শিক্ষা নিজেদের চিন্তা করতে ও প্রকাশ করতে শেখায় না, শেখায় শুধুই authority quote করতে। আমরা আদৌ চিন্তাশীল হই না, যদি কিছু হই তো ভাবুক।

বস্তুত বাঙালীর ছেলেরা ভাবালুতার জন্য কুখ্যাত। সব বাঙালীর ছেলেই নাকি যৌবনে কবিতা লেখে এবং প্রেমের কবিতা। এও একটা সমস্যা, তবে সেটা মনস্তাত্ত্বিকের। কিন্তু বাঙলার শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্য, বাঙালী সাহিত্য রসিকের এই মহৎ উত্তরাধিকার, কবির ভাবালুতায় আবিল নয়, তার ভাব কল্পনার দিব্য জ্যোতিতে স্বচ্ছ। বলাই বাহুল্য, এ বিচার অতি ব্যাপক। কাব্যের পংক্তিতে সঙ্গত ভাবেই এখানে আমি কবিতা নাটক উপন্যাস গল্প প্রভৃতি রসসাহিত্যকে ফেলছি। বিচ্ছিন্নভাবে এই সাহিত্যের রসবিচার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যের এই দিকটা সম্বন্ধে অন্য দশজনের মতো আমিও খুব সচেতন। কিন্তু এই দিকটার তুলনায় সাহিত্য-দর্শনের নানাদিকে এ সাহিত্য এতো খাটো যে বাঙালীর ভাবালুতার মধ্যেই তার কারণ নিহিত বলে সন্দেহ করা হয়তো অমূলক নয়। বিবিধ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা পরিচালিত হবার মতো পুঁথি বাংলা ভাষায় এখনো রচিত হয়নি, ভাষাগত অনুপযুক্ততাই তার একমাত্র কারণ নয়। বরং ভাষার দিক দিয়ে বাধা আজ অল্প বলে মনে হয়। এ ভাষাকে যেদিকে ইচ্ছা বাঁকিয়ে, ঘুরিয়ে, নানা ভঙ্গীতে, গতিতে, লয়ে চিন্তার অতি সূক্ষ্ম চড়াই উৎরাইগুলিকেও সব সুপরিস্ফুট করা চলে।

অতি নিশ্চিত প্রকাশক্ষম ভাষা আজ বাঙলা। পরিভাষার প্রশ্ন ও মীমাংসা যোগ্য বলে প্রমাণিত। শিক্ষিত পণ্ডিত লোকেরও অভাব নেই। অভাব তা হলে কিসের?

এ সেই যাকে বলে vicious circle, তাই। এই গোলক ধাঁধা হতে নিষ্ক্রমণের পথ নির্দ্দেশ করবো এমন সাধ্য আমার নেই। আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে বলেই আমার ধারণা। এই সামঞ্জস্যাভাবের কাহিনী যদি সত্য হয় তবে এ অসামঞ্জস্য দূর করবার সংকল্প ও চেষ্টাই হবে আমাদের সাহিত্যিক সংস্কৃতি অটুট রাখবার সংকল্প এবং চেষ্টা। এ চেষ্টার প্রথম লক্ষ্য হবে নিঃসন্দেহে শিক্ষা সংস্কার। বাঙালীর ছেলের এই অতিনিষ্ক্রিয় মানসিক জড়তা ঘুচিয়ে যদি তাকে ভাবে চিন্তায় কর্মে বলিষ্ঠ ও প্রাণবান করে তুলতে হয় তবে গোড়া থেকেই তার মনকে সক্রিয় করে তুলবার সর্বপ্রকার প্রয়াস পেতে হবে। চিত্তশক্তিকে নানা চিন্তায় দিকে দিকে বিচিত্র পথে খেলাবার সুযোগ দিতে হবে; এই স্বাধীন চিত্তশক্তি গড়ে তোলাই এ কালের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। আধুনিক বাঙালীর প্রকৃষ্ট শিক্ষার উপরই যেহেতু আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, সাহিত্যশিক্ষার যে রীতি প্রকৃষ্ট সেটা বেছে নিতে আমাদের দেরী করলে চলবে না।

রবীন্দ্রনাথ সরকার

"উপ্‌রি"

কয়েকটা লাথি খেয়েও লোকটা যখন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পড়ে রইল, একটু নড়লো না চড়লো না পর্য্যন্ত, তখন টিকিট কালেকটার কালীকিঙ্কর "মড়া" শব্দটা নিরুৎসাহের বিকৃত কণ্ঠে একবার উচ্চারণ করে অন্য দিকে এগিয়ে গেল।

নিরুৎসাহ বৈকি। দৈনন্দিন এমন মরা কালীকিঙ্কর অহর্নিশি দেখছে, দূর দূরান্তের যাত্রীরা খাদ্য অন্বেষণে বের হয়ে অনশনে আর ব্যাধিতে গাড়ীর কামরাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিচ্ছে, গাড়ীর কর্ত্তারা প্ল্যাটফর্ম্মে মড়া নামিয়ে দিয়ে মুক্তি লাভ করছে, ওরা ষ্টেশন ষ্টাফরা ডোমের হাতে তুলে দিয়ে নিষ্কৃতি পাচ্ছে—নিত্য নৈমিত্তিকের এ ঘটনা, মৃত্যুর বীভৎস লীলা, মরণের উৎসব, সুতরাং মড়া নিয়ে হৈ চৈ—, পুলিশ, ডাক্তার, সমবেদনা প্রকাশ ইত্যাদিগুলো কালীকিঙ্করের কাছে বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বরং লোকটার যদি আরও কিছুক্ষণের জন্যে আয়ু না ফুরিয়ে যেত, ওর কাছে যে কিছু রোজগার করতে পারতো,—গাড়ীর মাশুল সংগ্রহের শক্তি ওদের নেই—সত্যি, তবে গাড়ী চড়বার কৌশল ওরা জানে, ভিক্ষা করেও ওরা টিকিট বাবুকে সন্তুষ্ট করে এ দৃশ্যও কালীকিঙ্কর কতদিন দেখেছে।

শিকারী মার্জারের মত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে নিরুৎসাহের ক্লান্ত ভঙ্গিমায় ও আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল। এ হপ্তায় ওর রাত ডিউটি পড়েছে, দুটো আড়াইটে বুঝি বেজেছে তখন, নিষ্প্রদীপের রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধকারের বিকট এক দৃশ্যের মধ্যে মফঃস্বলের এই ছোট ষ্টেশনটা যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। দূরে দূরে সিগন্যালের নীল লাল বর্ণের বাতিগুলো, যেন প্রেতাত্মার চোখের মত দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছিল। কিছুক্ষণ হ'ল একখানা গাড়ী বেরিয়ে গিয়েছে, প্ল্যাটফর্ম প্রায় জনহীন নিস্তব্ধ, একটা ঘুমন্ত কুকুরের গায়ে টর্চ বাতি ফেলে সে মানুষ কিনা দেখে নিয়ে কালীকিঙ্কর নিজের মনেই বল্‌ল—, 'যুদ্ধ যুদ্ধ আর যুদ্ধ, প্যাসেঞ্জার গাড়ীগুলো তো প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেল, সৈনিক গাড়ী মালগাড়ী আর কামান গাড়ীর চলাচলের যেন আর অন্ত নেই—এবারকার রাত ডিউটিটা একেবারে মাঠে মারা গেল—।'

সত্যই এবারকার রাত্রি ডিউটি বুঝি কালীকিঙ্করের একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। নিষ্ফল, পরিপূর্ণ নিষ্ফল, এখনও পর্য্যন্ত একটিও উপরি পয়সা রোজগার করতে পারেনি।

অথচ এই উপরি আয়টাই যেন মিছিরির সরবত, ধরা বাঁধা মাইনেটাতো নিরস জল ছাড়া আর কিছুই নয়, যেন কতকটা আফিঙের নেশা, কিছু চাই—, অন্ততঃ কিছু চাই। উপরন্তু, দ্বিতীয় পক্ষের নূতন বউ বলেছে, "তার স্নো প্রায় ফুরিয়ে এল, পাউডার নেই, গন্ধ সাবানও কাবার। ললিতারও স্নো মাখাটা যেন কতকটা নেশা, অন্নের চেয়েও ওর এই জিনিষটারই প্রয়োজন বেশী। শুধু তাই নয়, প্রথম পক্ষের ওর গোটা তিন চার কাচ্চা বাচ্চা রয়েছে, র্যাশান কার্ডের হিসাবে ওদের অর্দ্ধেক খাদ্য বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু খায় তারা ওই ভাতই, বার চারেকে পুরো ভাতই খেয়ে থাকে। সেদিকেও তার কিছু খস্‌ছে বই কি।

ঘুরতে ঘুরতে কালীকিঙ্কর আবার মড়াটার নিকটে এসে পড়েছে, "ইস্‌ পচেছে, যা দুর্গন্ধ, কে জানে কবেকার মড়া"। নাকে রুমাল চেপে কালীকিঙ্কর একটা কুলিকে, বল্‌লো, "ডোমকে খবরটা আর একবার দিয়ে আয় না বাবা, ভোর হতেই যেন চলে আসে।" তখন আসাম মেলের ঘণ্টা হয়ে গেছলো, কালীকিঙ্কর জানে আজ বদরগঞ্জের হাট, বেচা কেনার মহা ধূম, টিকিট কেটে কোনও ব্যাপারী আনাগোনা করে না। শীর্ণ গালে একটু প্রভুত্বের হাসি হেসে সে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। আরও খানিকটে সময় কেটে গিয়েছে। প্রভুত্বে আর দাবীতে, শাসনের চোখ রাঙ্গানীতে কালীকিঙ্কর কিছু উপরি আয় করেছে বৈকি। কতকগুলো লোকে বড় চতুর, টিকিট কেটে গাড়ী চড়ে না, অনেকটা সময় বাদ দিয়ে গেটে প্রবেশ করে। তাদেরই জন্যে তখনও কালীকিঙ্কর বাজ পাখির দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ইত্যবসরে ওর মনে হোল গেটের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে টিকিটবাবুকে ফাঁকি দিতে কে যেন আত্মগোপন করে রয়েছে। যেন নারীকণ্ঠ—, তবু সে টিকিট বাবুর প্রভাব নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এ কী, এ যে মুমূর্ষ এক নারী, ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে, একটি বছর তিনেকের সরু লিক্‌লিকে উলঙ্গ মেয়েকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে তখনও যেন কিসের অপেক্ষায় বসে রয়েছে—মনুষ্যমূর্ত্তি দেখে প্রথমে বুঝি একটু আঁৎকে উঠেছিল,

পরে চিঁ চিঁ করে যেন প্রেতিনীর কণ্ঠে বল্‌লো—, "বাবু, টিকিটবাবু বেরিয়ে গিয়েছে ?" একটু থেমে একটু হাঁফ নিয়ে আবার সে বল্‌লো—, "মৈমনসিং থেকে আসছিনু বাবু, আসাম যাবার লাগি বের হয়েছিনু, ভাতের দুঃখু মেটাতে বাবু ঘর বাড়ী, গাই বাছুর, থাল বাসুন বেচে দিয়ে বিদেশেই চল্‌ছিনু, ইচ্ছরের বিচের দেখ, স্বামীটে রাস্তায় মারা পড়লো", স্ত্রীলোকটি এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লো—"মিত্যুর দোছ কি বাবু, জল আর পাতা সিদ্ধ খেতে খেতে দাস্ত আর বন্ধ হয় না—, তার উপর বাবু হি হি করে কাঁপায়ে কাঁপায়ে জ্বর আসে—।" আর বোধ হয় কান্নার শক্তি ওর ছিল না, বাকশক্তিও বুঝি অবলুপ্ত হয়ে এসেছিল, তাই ব্যাকুল কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করলো, "বাবু, টিকিট বাবু চলে গিয়েছে তো বাবু—, মড়াটা একা রয়েছে, শিয়াল কুকুর খেলো হয়তো।"

গম্ভীর গলায় ওর কথার উত্তর দিয়ে কালিকিঙ্কর বল্‌লো,—"টিকিটবাবু নেই—তুমি যেতে পারো, তোমার স্বামী এখনও পড়ে আছে, ডোম আসবে এখুনি।" অন্ধকারে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকটি কালীকিঙ্করকে টিকিটবাবু বলে বুঝ্‌তে পারেনি, নচেৎ আতঙ্কে ওর এতক্ষণে অবধারিত মৃত্যু ঘটতো।

আতঙ্ক বই কি! এবার কালীকিঙ্কর একটু না হেসে পারলো না, প্রভুত্ব করবার ওদের অদ্ভুত ক্ষমতা, প্রভূত শক্তি, ওরা মানুষের হৃদপিণ্ড কাঁপিয়ে দিতে পারে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাতে পারে। স্বামীর মড়া ফেলেও স্ত্রীলোক টিকিট বাবুর ভয়ে আত্মগোপন করে। একি ক্ষমতার অদ্ভুত প্রভাব নয় ?

এই বুঝি প্রথম কালীকিঙ্কর নিজের অমানুষিকতা অন্তরে উপলব্ধি করলো, সঙ্গোপন দুর্বলতা অহেতুক যুক্তি বিবেকের কাছে পরাজয় স্বীকার করলো। এই ধরণের আরও চিন্তায় ওর মস্তিষ্ক ও মন পূর্ণ হয়ে উঠলো। আরও কতক্ষণ কালীকিঙ্কর চিন্তামগ্ন হয়ে থাক্‌তো কে জানে, এক সময় কতকগুলি যেন নরনারীর কঙ্কাল গেটে এসে ভীড় করতে ওর চমক ভাঙ্গলো, ওরাও বুঝি অন্ন-হারা, গৃহছাড়া—অন্নেরই সন্ধানে বের হয়েছে। সঙ্গে এখনও কিছু তৈজসপত্র, কিছু কাঁথা মাদুর আর কিছু উলঙ্গ মানব সন্তানও রয়েছে। অভ্যেস মত অস্ফুট কণ্ঠে কালীকিঙ্কর ওদের কাছে টিকিট দাবী করলো। এবার আর অনুনয় অনুরোধ নয়, ওই কঙ্কালগুলোর মধ্যে থেকে এক নারীমূর্ত্তি প্রেতিনীর

নাকি সুরে বলে উঠলো—"ভাত পাই না, টিকেট ; পাবো কোথায় বাবু ? তুমি সিপাহীকে খবর দাও, যাকে খুশি দাও, আগে শুধু বলে দাও ভাত মেলে যেথায়—লঙ্গরখানা কোন্ দিকে ? ফিরে এসে আমরা পুলিশের হাতে নিজেরাই ধরা দেব।" এই বোধ হয় প্রথম কালীকিঙ্কর অশিক্ষিত সমাজে প্রতিহত হয়েছে, তার জন্যে ও যেন খুশি। লঙ্গরখানার নির্দেশ ওদের জানিয়ে দিয়ে কালীকিঙ্কর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেল।

এবার ওর একবার মৃতদেহটার সন্ধান করতে হয় বৈকি! স্ত্রীটা তার কাছে পৌঁছেচে কিনা কে জানে ? সেই স্ত্রীলোক যে টিকিট বাবুর আতঙ্কে স্বামীর মড়া ফেলে আত্মগোপন করেছিল। ডোম বোধ হয় এতক্ষণ এসে গিয়েছে।

ভোরের আলো তখন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে, ও আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলো, মৃতদেহটা যথাস্থানে পড়ে রয়েছে, মৃত্যুর সে এক বীভৎস দৃশ্য, রোগের ক্লিষ্টতায় আর অনাহারের জীর্ণতায় ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করেছে, পচা গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। সরু লিক্‌লিকে উলঙ্গ মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটী ওই স্থানেই নিশ্চল স্থাণুর মত উবু হয়ে বসেছিল। ডোম কয়েকটি এইমাত্র বুঝি উপস্থিত হয়েছে—, মৃত বহনের অগ্রিম পারিশ্রমিক যে কয়েকটি মুদ্রা অর্জ্জন করেছে—তারই বখেরা নিয়ে হৈ চৈ বাঁধিয়েছে। স্ত্রীলোকটি বুঝি ওই মুদ্রা কয়েকটির পানেই তখন লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল, দিনের আলোয় কালীকিঙ্করকে দেখে ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা গোপন করতে ব্যর্থ একবার চেষ্টা করে বললো—, "বেঁচে থাক্‌তে বাবু—রোগের জ্বালায় ছটফট করেছে, চারটে পয়সা পাইনি, একটু পথ্য দিতে পারিনি, আর দেখ ঈশ্বরের বিচের, তার মড়াটা ফেলতে ডোমে চার চার টাকা—", এইবার বোধ হয় ও টিকিটবাবুর পোষাক লক্ষ্য করে একটু ভীত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

একটি ডোম টিকিটবাবুকে দেখে হৈ চৈ থামিয়ে বল্‌লো—"মড়া নিয়ে যেতে দেয় না বাবু, শুধু কাঁদে, বলে রবে কোথা, খাবে কী, বলে শুধু কাঁদে, ওদিকে গোপালগঞ্জে দুটো মরেছে, একটার হাত শিয়ালে খেয়ে নিয়েছে, এখুনি যাইতে হোবে—"

সত্যি কথা, স্বামীর ওই মৃতদেহ স্ত্রীকে আশ্রয় দেবে না, অন্ন দেবে না, তবু সে তাকে ছেড়ে দিতে পারছিল না। অন্নহারা, গৃহহারা, স্বামীহারা একটু অবলম্বনের কাঙালিনী এই নারীর দিকে তাকিয়ে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে পথের যাত্রীর বেদনা এই বোধ হয় প্রথম কালীকিঙ্কর উপলব্ধি করলো, বল্‌লো, "পুলিশ এসে গোলমাল করবে, ওকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এস।"

"বাবু কোথায় যাবো—টিকিট আমার নেই বাবু।"

"টিকিট না, ওরে টিকিট না, চলো আমি তোমাকে লঙ্গরখানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।" কিন্তু এ আশ্রয় সংবাদ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছিল কিনা কে জানে, তখন সে স্বামীর বুকের উপর ঢলে পড়ে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বল্‌ছে, "বাবু ঈশ্বরের বিচের দেখ, মরলো মরলো স্বামীটে—তিন মাসের গর্ভ থুয়ে মরলে—, কোথায় যাই, কী করি—", বলতে বল্‌তে বল্‌তে অদ্ভুতভাবে স্ত্রীলোকটি থেমে গেল।

একটা ডোম বলে উঠলো, "মরিয়ে গিয়েছে বাবু, খুন মুখসে পড়তেছে।" তার মৃত্যুর জন্যে কালীকিঙ্কর একটুও বিস্মিত হয়নি, বরং এতক্ষণ যে সে জীবিত ছিল, এইটেই আশ্চর্য্যর বিষয়। সে সেদিনের উপরি উপার্জ্জনের আটটি টাকা ডোমের হাতে দিয়ে বল্‌লো "নে বাপু, একটু তাড়াতাড়ি মড়াগুলোর একটা গতি করে ফেল্—দেরী করিস্‌নে, নইলে আবার রিপোর্ট কর, পুলিশ ডাকো, ডাক্তার দেখাও, যত সব ঝঞ্ঝাট—।"সে এগিয়ে গিয়ে ওই রোগা লিকলিকে মেয়েটার হাত ধরলো, সে তখন কী বুঝেছিল কে জানে, শীতে আর জ্বরে ঠক্‌ঠক্ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

বিস্ময়ের কণ্ঠে একটা ডোম জিজ্ঞেস করলো, "একটা মড়া ফেলবো চার টাকা রেট, আট টাকা দিলে কেন?"

"ঠিক দিয়েছি রে, ওর পেটের মধ্যে যে একটা রয়েছে।" মেয়েটাকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতে যেতে কতকটা নিজের মনেই এবার ও বল্‌লো, ওই সামান্য উপরি আয় ওর কী বা হবে, আজ যে ও সত্যিকার উপরি আয় করেছে—মেয়েটার সরু হাতটা ও আরও শক্ত করে চেপে ধরলো।

কালীকিঙ্কর বাড়ী ফিরতে, প্রত্যহের মতই ললিতা হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললো, "কি গো, উপরি আজ কত পেলে দাও দিকিন, স্নো কাল একেবারে শিশি মুছে মেখে ফেলেছি।"

মেয়েটাকে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসিমুখে কালিকিঙ্কর উত্তর দিল, "আজ সত্যিকার উপরি আয় করেছি ললিতা—তুমি একে অনাদর কোর না, বাপ, মা, অন্ন, আশ্রয় হারা মেয়ে ও। তোমার সতীনের কতকগুলো অপগণ্ডো শিশু তো পেয়েছ, ধরে নাও এটিও তাদের দলের আর একটি।"

ললিতা নির্ব্বাক—একটি কথারও উত্তর দিতে পারলো না, অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওই উলঙ্গ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। সতীনের তিন চারটি সন্তান নিয়েই সে অস্থির হয়ে উঠেছে—আবার একটি—ঘৃণা ও আতঙ্ক যেন ওর স্নায়ুতে স্নায়ুতে পোকার মত কিলবিল করে ঘুরতে লাগলো।

কালীকিঙ্কর আবার বললো, "কী গো রাজী হ'তে পারলে না বুঝি প্রস্তাবে?"

"রাজী না হয়ে উপায় কী?" কর্কশ গলায় ললিতা উত্তর দিল, "নিকে করবারও যখন রাস্তা নেই খোলা, তালাক দেবারও পথ নেই; দয়া করে অতিথি যখন জোটালে, অন্ন জুটিও, তাহ'লেও—"

ওর বাকী কথাগুলো কালীকিঙ্কর আর শুন্‌তে পাইনি। ও ভাবছিল, "নারীর কী এই সত্যকার রূপ? দয়া মায়া স্নেহ ভালোবাসার ওরা প্রতীক, এ কী শুধু কবি কল্পনা? ললিতা তখন ঘর থেকে চলে গেছ্‌লো তবু ওর মুখের স্নোর গন্ধ বিস্তৃত হয়ে ঘরের হাওয়াকে যেন বিষাক্ত করে তুলেছিল। কালীকিঙ্কর কিন্তু তার মধ্যে মরার সেই পচা গন্ধটাই অনুভব করলো।

ডোমগুলো তখন গেলাসের পর গেলাস মদ সাবাড় করেই চলেছে, এমন সুদিন যে ওরা অনেকদিন পর পেয়েছে, পারিশ্রমিক বাদ দিয়ে উপরি আয় আবার নগদ চার চারটে টাকা—সত্যিই উৎফুল্লতার সীমা নেই।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

পুস্তক-পরিচয়

পথ-নির্দেশ

Victory and After—by Earl Browder ; National Book Agency Ltd ; Pp. 167.

আর্ল ব্রাউডার আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা। জাতীয় ঐক্যের খাতিরে জেল থেকে তাঁকে মুক্ত করা হয় ১৯৪২ সালের ১৬ই মে তারিখে। এক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক তাঁকে ধরলেন একটা বই লিখে দেওয়ার জন্যে। কি ধরণের বই? ধরুন না যেমন "Prison Memories of a Noted Criminal"। আমেরিকার জনসাধারণ আদর্শ ব্রাউডারের মতামত জানতে একটুও ব্যস্ত নয়, এই ছিল প্রকাশক মহাশয়ের মত। তারা শুধু জানতে চায়, আর্ল ব্রাউডার কি চিজ! উত্তরে আর্ল ব্রাউডার এই বইটি লিখেছেন। বলা বাহুল্য, বইটি এডগার ওয়ালেসের উপন্যাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না বলে উক্ত প্রকাশক এটা প্রকাশ করেননি। প্রকাশ করেছেন, International Publishers।

তবু জানতে চায় আমেরিকার লোক যুদ্ধোত্তর জগৎ সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির মতামত কি। Spectre of Communism যাদেরকে বিনিদ্র রজনী যাপন করায় তাদেরকেও আজ সাহসের ও সততার সহিত কমিউনিজম্ নামক জুজুটির সম্মুখীন হতে হবে। জাতীয় বিপদের দিনে, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যাঁরা আজো ভূতাবিষ্ট অবস্থায় রয়েছেন, হিটলার ও টোজোর পঞ্চম বাহিনীর কাজ তাঁরাই সুসম্পন্ন করছেন। কমিউনিজম্ নামক একটা জুজু খাড়া করাই হিটলারের সেই বহুবিশ্রুত গোপন অস্ত্র। কাজেই এই জুজুর ভয় যতদিন না কাটবে, সোভিয়েট ইউনিয়ন, কমিউনিজম্, কমিউনিষ্ট পার্টি, এদের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার যতদিন না আমরা করতে পারবো, ততদিন হিটলারের গোপন অস্ত্রের প্রহার আমরা ঠেকাতে পারবো না, যুদ্ধজয়ের ও জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনাও হবে সুদূর পরাহত।

আমেরিকার সর্বসাধারণের মন থেকে এই জুজুর ভয় দূর করার জন্যই আর্ল ব্রাউডার এই বইটি লিখেছেন। জগতের সবাইকে আজ বেছে নিতে হবে, কোন্ পথে চলবো? একটা হচ্ছে People's way of life যেটা নিয়ে যাবে সভ্যতার, গণতন্ত্রের, জাতীয় মুক্তির ও বিশ্বমৈত্রীর দিকে। আর একটা হ'চ্ছে Fascist way of life যেটা মধ্যযুগের তমসায় সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করতে চায়, সমগ্র জগতকে একটা বিশেষ জাতির দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধতে চায়, অসত্য, অপ্রেম ও অসুন্দরের যূপকাষ্ঠে অজ্ঞাত মানব শিশুকে বলি দিতে চায়। এই দুই পথের মাঝামাঝি কোনো পথ নেই, কোনো আপোষ চলতে পারে না। এব্রাহাম লিনকনের কথাকে একটু বদ্‌লে বলা যেতে পারে, "the world cannot live half-slave, half-free"।

আপোষ চলতে পারে না ফ্যাসিজমের সঙ্গে। হিটলারি ফ্যাসিজম্ চায় দুনিয়ার অসপত্ন সাম্রাজ্য। অন্যান্য দেশের তাঁবেদার ভাড়াটে ফ্যাসিস্তরা তাই দেশকে হিটলারের কাছে বিক্রয় না ক'রে অন্য কোনো উপায়েই ফ্যাশিষ্ট "বিবেক"কে তুষ্ট করতে পারে না। একথা শুধু আমেরিকা, ফ্রান্স বা ইংলণ্ড নয়, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও সমানই প্রযোজ্য। হিটলারই এই যুদ্ধটাকে ideological war বলে চালাবার চেষ্টা ক'রে এসেছে, এখনও করছে। বলছে, আমি সভ্যতাকে অর্থাৎ ধনতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য বর্ব্বর কমিউনিষ্টদের সঙ্গে লড়ছি; অতএব হে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তোমরা আমাকে ভজনা কর। কিন্তু নিজেদের জাতীয় সত্তার ও স্বাধীনতার বিলোপ না ক'রে হিটলারকে ভজনা করতে পারলেন কি অন্যান্য দেশের ধনতান্ত্রিক দল? হিটলারের আক্রমণে তাই জাতীয় মুক্তির সমস্যাই আজ বড় হয়ে উঠেছে।

উঠেছে বলেই যাঁরাই দেশভক্ত ও স্বাধীনতাকামী তাঁরাই দল নির্বিশেষে হিটলারের বিরুদ্ধে এক হতে পেরেছেন। দেখা গেল, বহুনিন্দিত শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী কমিউনিষ্টরাই আজ জাতীয় ঐক্যের প্রধান উদ্যোক্তা, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক। দেখা গেল, আরো ভয়াবহ সত্য, যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে প্রচার করা হয়েছিল সব দেশের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা তার দ্বারা বিপন্ন হয়েছে, সেই সোভিয়েট রাশিয়াই হিটলারের আক্রমণ প্রতিহত ক'রে বিশ্বসভ্যতাকে ও পৃথিবীর সমস্ত জাতির

স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে। মিত্রশক্তির সাম্রাজ্যবাদীরা চোখ রগড়ে ঘোষণা করলেন, সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে আমরা ভুল করেছিলাম। ভুলটা কি? ভেবেছিলাম, সোভিয়েট রাশিয়া কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র কিন্তু এখন দেখছি সোভিয়েট রাশিয়া দিব্য ধনতন্ত্রের দিকে এগিয়ে এসেছে। হিটলারের ideological war এর উত্তর তাঁরা এই আত্মপ্রতারণার দ্বারা দিতে চান।

এই আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা ঐক্য আসবে না, হিটলারের পরাজয় হবে না, যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ে উঠবে না। সোশালিজ্‌মকে যাঁরা utopianism বা anarchism বলে মনে করতেন তাঁরা Mr. Davies-এর মতো রাশিয়ায় গিয়ে সোশালিজ্‌মের গঠনমূলক চেহারা দেখে যদি আশ্বস্ত হয়ে থাকেন সেটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় হয়তো। তবু সোভিয়েট রাশিয়া সোশালিষ্ট দেশ-ই। এটা মেনে নিয়েই ধনতান্ত্রিক বৃটেনের ও আমেরিকার সহিত তার যুদ্ধোত্তর সহযোগিতা সম্ভব হবে, এই কথা ব্রাউডার খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন।

People's way of life অবলম্বন করেছে বলেই সোভিয়েট রাশিয়া ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধে এমন দুর্জয় প্রতিরোধ দিতে পেরেছে। এই People's way আমেরিকায়, বৃটেনে, চীনে, ভারতবর্ষে কি কি কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিচ্ছে এটা বলার অধিকার কমিউনিষ্টদেরই সব চেয়ে বেশী আছে। তাই তাঁদের কথা আজ শোনা আবশ্যক হয়েছে যুদ্ধটা জেতার জন্যে। এই যুদ্ধটা যে মোটের উপর People's War for National Liberation এ বিষয়ে আর্ল ব্রাউডার কয়েকটি চমৎকার যুক্তি দিয়েছেন। "Since the only way to victory is to rouse, organise and arm each and every nation in the world willing to resist Nazi conquest, the undemocratic and imperialistic tendencies and forces within the United Nations are being modified and broken down, while at the same the enslavement tendency of the axis becomes absolute. In its drive for world conquest, the axis is forced by the logic of the struggle to more extreme enslavement of nations and peoples; on the contrary,

the United Nations is by the same logic driven on to the path of Universal national liberation."

আর এক জায়গায় বলেছেন, "The character of the war is not determined by the proclamations of statesmen. It arises out of the character of the forces in combat, the policies which they are following, the results which each is struggling to achieve through the war and the logic of the struggle inevitably arising from this relation of forces...

"This war on the axis side is the continuation of the Hitler policy of universal enslavement. On the side of the United Nations it is a People's War of National Liberation. We do not say that it is purely of this character; like all modern wars it sprang from the widest mixture of causes, motives, policies. It has this character predominantly, decisively, because victory for the United Nations saves the preconditions for human progress while victory for the axis destroys those preconditions."

অবশ্য অনেক কিছু গলদ, অনেক কিছু সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও লক্ষ্য সম্মিলিত শক্তির শিবিরে রয়েছে। কিন্তু এইগুলির প্রতিকারের পথ জয়ের ভিতর দিয়ে না পরাজয়ের ভিতর দিয়ে এইটেই বিচার্য। এটা যদি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হতো তাহলে পরাজয়ের ভিতর দিয়ে মুক্তি আসতো এবং উভয় পক্ষের পরাজয়ই জনগণের কাম্য হতো। আমাদের দেশে যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের থিসিস্ দেন তাঁরা স্পষ্টতই ঘোষণা করেন, axis-এর জয়ই তাঁদের কাম অথচ তাঁরাই আবার কেউ কেউ নিজেদেরকে Marxist, Leninist, ও Stalinist বলে সদম্ভে জাহির করেন। বেচারী লেনিন যথাসময়ে করেছেন এটাই তাঁর সৌভাগ্য বলতে হবে।

স্পষ্টতই যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে
জয়ের জন্য যে দেশ যতই সংঘবদ্ধ হচ্ছে, জাতীয় ঐক
সেখানে গণশক্তি উপরে আসছে, উপফাশিস্তরা

তাঁবুতে যাঁরা নাম লিখিয়েছেন অথবা গণশক্তিতে যাঁদের বিশ্বাস নেই তাঁরাই এই সত্যটাকে কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। জয়ের জন্য গণশক্তিকে জাগ্রত ও সংঘবদ্ধ করলে logic of Peoples War যে পৃথিবীর সব জাতিকে স্বাধীন করবে এই ভিত্তির উপরই বর্তমান রাজনৈতিক কার্যক্রম গঠিত হতে পারে। Defeatistদের defeat করা চাই সব দেশে। Pressure of the people অবশ্যই চাই কিন্তু for victory and not against victory। এই কাজ আমেরিকার কমিউনিষ্টগণ কি ভাবে করছেন তার ব্যাপক বিশ্লেষণ, theoritical ও practical উভয়ই, এই বইটিতে আছে।

দেশরক্ষার যুদ্ধে দল বাছাবাছি নেই কিন্তু লোক বাছাবাছি আছে। আমেরিকার Republicans ও Democrats উভয় দলেই প্রগতিশীল লোক আছে আবার defeatistও আছে। ব্রাউডার তাই সকলকে বলেছেন bipartisan দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে। Republican Partyর Hoover-Landon নেতৃত্বের পিছনে আছে আমেরিকার চরম প্রতিক্রিয়াশীল monopoly capital; এই নেতৃত্ব ফ্রান্সের দুইশত পরিবারের অনুগ্রহ-পুষ্ট Petain-Lavalএর নেতৃত্বের সামিল। এঁদের বুলি হচ্ছে business as usual, politics as usual। হিটলারের অনুচর Martin Dias ও Hamilton Fishএর রাজনীতির সহিত, Luce-Jordan আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সহিত এঁদের রাজনীতির বেশ একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। Republican Partyর হিটলার তোষক, কমঠবৃত্তিমূলক, আমেরিকান শতাব্দীর উপাসক নেতাদের কর্মসচিবতায় আমেরিকান জনগণের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। জয়ের জন্য অন্য নেতৃত্ব আবশ্যক, যে নেতৃত্ব Republican Partyর politicsকে ভুলে গিয়ে জয় ও জাতীয় ঐক্যকেই বড় ক'রে দেখবে। Wilkie এই ধরণের নেতৃত্ব Republican Partyকে দিয়েছিলেন। Republican Partyর সাধারণ সভ্যদের মধ্যে pro-Wilkie ও pro-Roosevelt trend যথেষ্ট আছে। তাই Repulican Partyর বিরুদ্ধে প্রচার চালানো চলবে না কেন না সেটা হবে Hoover যা চান তাই অর্থাৎ politics as usual। People's way in politics হচ্ছে দলের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে, দলীয় শাসন, দলীয় ভক্তি, দলীয় ভ্রান্তির অপনোদন ক'রে জনগণের ঐক্য

সাধন, যুদ্ধ জয়ের realistic ভিত্তিতে। কমিউনিষ্টদের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী জনগণকে একটা নূতন আলোকের সন্ধান দিচ্ছে যার ফলে পঞ্চম বাহিনীর sabotaging the mind অভিযান ব্যর্থ হবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রাউডার বলেছেন, ভারতের জনগণ ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী। তারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে চায় সুতরাং জয়ের জন্য, যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দেওয়া চাই। আমেরিকার উচিত বৃটেনের উপর চাপ দেওয়া ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। সম্মিলিত শক্তির ঐক্যের অর্থ এমন নয়, বৃটিশ বা পোলিশ বা অন্য কোনো গবর্ণমেন্ট Facist way অনুসরণক'রে পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করলেও অন্য কোনো শক্তি কোনো কথা বলতে পারবেন না। "In the interest of victory for the United Nations, India, now formally a member and recognised as a nation, must be given at once that measure of practical manhood which will enable her to fight and defeat the common enemy at her borders. As to all else, that may be left to the future and to the people, when victory is won. That is a sound position for the United Nations to take, a position dictated by military necessity of a desperate war…"। কথাটা utopian শোনাচ্ছে কি? পণ্ডিত নেহ্‌রুও Cripps Mission আসার সময়ে এই কথাই বলেছিলেন; সব দেশের ফাশিস্ত বিরোধী দেশপ্রেমিকই এই কথা বলছেন। People's way to independence যুদ্ধের এই necessityকেই বড় করে দেখবে, কড়া microspe দিয়ে সদিচ্ছা, সদভিপ্রায়ের বিশুদ্ধতা নিয়ে গবেষণা করবে না।

সম্মিলিত শক্তির যুদ্ধকালীন ঐক্যকে যুদ্ধোত্তর যুগেও বলবৎ রাখার চেষ্টা করতে হবে। People's way হচ্ছে শান্তির পথ, যুদ্ধের পথ নয়। তার জন্যে চাই সব দেশের মুক্তি ও সাম্য। শান্তির বিধান সইতে পারবে কি শাসন ও শোষণের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি? জাতীয় মুক্তির, জাতীয় সমানাধিকারের, শান্তির অভিযান, Marx যাকে বলেছেন class-struggle তারই একটা রূপান্তর। ব্রাউডার শেষের দিকে বলেছেন Marxist theory একটা dogma নয় সেটা একটা guide to action। Utopian তারাই যারা

necessityকে মানে না, বাস্তবের struggle ছেড়ে অবাস্তব নিয়ে মেতে থাকে। Capitalist ও Communist রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা একটা instrument ot action যা এসে পড়েছে বিশ্বের জনগণের হাতে। এটাকে ব্যবহার করতে হবে বিশ্বমৈত্রীর জন্য, জাতিসাম্যের জন্য। টিকতে পারে না Capitalism শান্তির আবহাওয়ায়, জাতিসাম্যের শাসনে। নইলে শান্তির জন্য লড়াই করার কোনো মানে হয় না।

খুঁটিয়ে বইটার পরিচয় দিতে পারলাম না। আমাদের দেশের পেট্রিয়টদের বইটি পড়তে অনুরোধ করি। ভারতীয় কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে অনেক কিছু ভ্রান্ত ধারণা তাতে দূর হ'তে পারে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

পাঠক-গোষ্ঠী

(প্রাচীন গাথার রূপ ও রস)

'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

'পরিচয়ে'র গত মাঘ সংখ্যায় 'প্রাচীন গাথার রূপ ও রস' নামে শ্রীমৈনাক যে-প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন, সে বিষয়ে আমার দু'একটা বক্তব্য আছে।

বাঙালী ঐতিহ্য-বিস্মৃত জাতি, এই অভিযোগ আমরা বাল্যকাল থেকে প্রাচীনদের মুখে এতোই শুনে এসেছি যে ঐতিহ্য অজ্ঞতার বিষয়ে আমাদের রীতিমত একটা inferiority complex গ'ড়ে উঠেছে। শ্রীমৈনাক সেই complex-এর ওপর খড়গাঘাত করেছেন। কারণ যে সমস্ত লোকের সদাই মন খারাপ হ'য়ে থাকে যে দেশের অতীত বিষয়ে তাঁরা ভালো ক'রে কিছু জানতে পারলেন না, এবার থেকে তাঁদের মন প্রফুল্ল হবে। অতীতকে আয়ত্ত করবার ব্যাপারে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থটা মোটামুটি একবার প'ড়ে ফেলে দিলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের authority ব'লে পরিচয় দিতে পারেন। দরকার হ'লে লাইনকে লাইন টুকেও নিতে পারেন ঐ গ্রন্থ থেকে, কারণ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র লেখক কোনো ব্যক্তি বিশেষ হ'লেও বিষয় মাহাত্ম্যে ওটা এখন সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিগণিত হ'য়েছে। তাছাড়া নকল বা বিকৃতির প্রতিবাদের জন্যে লেখকও আর বেঁচে নেই।

আমি মৈনাক-মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে এবং দীনেশচন্দ্রের ঐ বই থেকে কয়েকটি অংশ * পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি। তাতে পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন মৈনাক মহাশয় কী অসীম ক্লেশ ও গবেষণার সাহায্যে "প্রাচীন্ গাথার" "রূপে"র পাহাড় এবং "রসে"র সমুদ্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি আক্ষেপ করেছেন, 'এই কথাগুলির সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি এখনও ভালরূপে আকৃষ্ট হয় নাই বলিলেই হয়।' মৈনাক মহাশয় যে ভাবে আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করেছেন, আরও একটু extensively এবং intensively সে রকম করলে আমাদের আশঙ্কা হয়, স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের পুস্তক প্রকাশক বা উত্তরাধিকারীগণ মামলা মোকর্দ্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত হ'য়ে পড়বেন। অন্তত এ কথা বিবেচনা ক'রেও মৈনাক মহাশয়ের

* পত্রলেখক অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। স্থানাভাবে আমরা মাত্র দু'টি উদ্ধৃত করলাম। পঃ সঃ

কিঞ্চিৎ দয়াপরবশ হওয়া উচিত ছিল,—বাংলাদেশের বেচারা 'সাধারণ' লোকের 'দৃষ্টি'কে নাকাল করবার অধিকারকে না হয় মেনেই নিলাম।

মৈনাক

১। যে প্রাচীন যুগে 'থুয়া' 'ভাদালি' 'ধাতাকান্তা' প্রভৃতি অনার্য্য দেবতাগণ এ দেশের মহিলাগণের পূজা ও ভোগ পাইত—স্বামী ও পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠাইয়া দিয়া মেয়েরা তাহাদের নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য বলি মানসিক করিত সেই যুগেও গ্রাম্য কথা বা গাথা রচিত হইত ইহা নিঃসন্দেহ।

২। যদিও 'ময়নামতীর গান' এবং 'গোরক্ষবিজয়ে'র ন্যায় রূপকথা ও ব্রতকথার ভাষার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে তবুও প্রাচীনত্বের নিদর্শন এখনও 'থুয়া' ও 'ভাদালি' ব্রতকথায় পাওয়া যায়, যেমন—'ঢেকি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত 'থুয়া' ও ভাদালি ব্রতকথায় পাওয়া যায়। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীয়মান হয় যে ব্রতকথার ভাষা অতি প্রাচীন।

দীনেশচন্দ্র

১। যে যুগে ইন্দ্র-চন্দ্র বরুণের পরিবর্ত্তে থুয়া, ভাদালি, ধাতাকান্তা প্রভৃতি গ্রাম্য অনার্য্য দেবতা এদেশের মহিলাগণের নিকট ভোগ ও পূজা পাইতেন, যে যুগে বাঙালী মেয়েরা স্বামী পুত্রকে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রে পাঠাইয়া অবিরত গ্রাম্য দেবতাগণের নিকট তাহাদের নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য প্রার্থনা করিত এবং বলি 'মানসিক' করিত……সেই যুগে এই সমস্ত গ্রাম্য কথা রচিত হইয়াছিল।

২। ময়নামতীর গান এবং গোরক্ষবিজয়ের ন্যায় তাহাদের ভাষাও রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও তন্মধ্যে অতি প্রাচীন ভাষার নিদর্শন আছে। ……ভাষা রূপান্তরিত হইলেও মাঝে মাঝে প্রাচীন যুগের নিদর্শন এখনও রহিয়া গিয়াছে, যথা প্রাচীন 'থুয়া' এবং 'ভাদালি' ব্রতকথায়……'ঢেকি পড়ন্ত। গাই বিয়ন্ত।……এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রতকথার ভাষা বিশেষ প্রাচীন,……

মণীন্দ্র রায়

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

১৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৫১

পরিচয়

সাহিত্যাদর্শ

মধ্যযুগে অখণ্ড এবং পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য-নিষ্ঠা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রজীবনের উন্মেষ এবং অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কথাটা রাষ্ট্রনীতির, কিন্তু সমস্যাটা সাহিত্যেরও। ব্যক্তি-জীবনে অতি বড় আদর্শ-নিষ্ঠার পরিণতি যেমনি ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তি, সাহিত্যক্ষেত্রে শিল্পীর ঐকান্তিক আদর্শ-প্রীতি তেমনি সৃষ্টির পরিপন্থী। আদর্শের সুকঠিন যূপকাষ্ঠে শিল্পী মনের অভিনবত্ব এবং ব্যক্তিত্ব যখন বিসর্জিত, শিল্পী কিংবা স্রষ্টা তখন গৌণ; আদর্শ-সংস্থাপনায় ব্যক্তিত্বহীন মহাভারতীয় গাণ্ডিবী।

অথচ আদর্শ যাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না, জীবনকে যে কোন বিশেষ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে শেখেনি, এক কথায় ব্যক্তি যখন জীবন-দর্শনহীন, তখন তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কখনও কখনও প্রশংসনীয় হলেও সচেতন মানবতার পরিচায়ক নয় নিশ্চয়ই। অথবা, ভবিষ্যৎ যখন শুধুই বদ্ধ অন্ধকার, সম্মুখে যখন শুধুই হতাশার ব্যঞ্জনা, চোখে নেই আদর্শের আশা-অঞ্জন, জীবন তখন শুধুই যে বিদ্রূপের বুদ্বুদ। তাই, শতাব্দীর সভ্যতা যখন ভেঙ্গে পড়ে, অতি সচেতন, অতি তীক্ষ্ণ যাঁরা সে অ্যাভালাঁশের সম্মুখে অগ্রণী প্রোমিথিউস, জীবন তাঁদের দুর্বিসহ; তাঁদের ললাটিকা শতাব্দীর অভিশাপ। আদর্শহীন হয়ে তাঁরা তাই সিনিক্। পথভ্রষ্ট নাবিক কিংবা সাহারা-পথে পথিক—তাঁদের শুধু পথের ক্লেশই নয়, লক্ষ্যহীনতারও। আদর্শহীন এরা তাই শিল্পীর সৃজনী দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

তাই আদর্শকে চাই এবং চাই না—আদর্শের প্রয়োজন এবং নিষ্প্রয়োজন—এতদুভয়ের সংঘট্টের পরিণতি কোথায়?

সাহিত্য যখন হৃদয়াবেগের সুষমা-অভিষিক্ত জীবনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির ত্রিভুজাকৃতিতে বিচিত্র বিকাশ, এবং সে জীবন যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তখন পারিপার্শ্বিক সামাজিক জীবনাবেষ্টনীর নিজস্ব অনুভূতি সম্ভূত আদর্শ সাহিত্য-সৃষ্টির পরিপন্থী নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু আদর্শ যেখানে বাস্তব-জীবন-বিচ্যুত superimposition, সেখানে সৃজনী-প্রতিভার অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ, আদর্শ-রচনায় যখন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন থেকে উৎসারিত স্বকীয় সৃজনাত্মক অবদানের অভাব, অথচ আদর্শ-রক্ষণ যখন শিল্পীর প্রধানতম কর্ত্তব্য, তখন আদর্শের স্বেচ্ছাচারী পীড়নের পরিণতি অতি বড় ট্রাজেডি।

জীবনে থিওরী কিংবা দর্শনের মূল্য নগণ্য নয়। দার্শনিক তাঁর সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা আগে ভাগে ব্যবহারিক জীবনের গতি এবং চলতার অখণ্ড এবং সামগ্রিক পরিকল্পনা করে থাকেন। তাঁর দৃষ্টি সামগ্রিক, অতএব বৈজ্ঞানিক; তাঁর মননশীলতা ব্যবহারিক, অতএব realistic। তাঁর চোখে তাই বাস্তবতা এবং জ্ঞানের পেলব অঞ্জন।...জীবন এবং দর্শন, থিওরী এবং প্রাক্‌টিস্ এরা তাই পরস্পর পরিপূরক। তাই, থিওরী কিংবা দর্শন, জীবন কিংবা প্রাক্‌টিসের আবেষ্টনী-বহির্ভূত যখন শুধুমাত্র নিঃসঙ্গ দার্শনিকের মনানুশীলন, তখন সে স্বকীয় উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট, তাই decadent; শুধুই বুদ্ধিজীবীর বিলাস। শিল্পরচনায় সে জীবনাদর্শ কিংবা জীবনদর্শনের প্রতি নিষ্ঠাধিক্য শুধুই জীবনকে অস্বীকারের নামান্তর। আজকে বহুতর নব নব সমস্যা এবং বিভ্রান্তিতে ব্যবহারিক জীবন এবং প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা যখন নিপীড়িত, তখন অতিক্রান্ত অক্ষম হেগেলীয় কিংবা বেদান্ত দর্শনের প্রতি নিষ্ঠা কখনও জীবনকে অস্বীকৃতির স্বাক্ষর, কখনও বা দুঃখবাদীর পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। জীবনবাদীর চোখে এ-হেন তথাকথিত দর্শন তাই বিদ্রূপের বাঁকা হাসিতে পুরস্কৃত, এবং অধুনা প্রচলিত কলেজীয় দর্শনের ন্যায় জীবন্ত দর্শনের উপযুক্ত সংজ্ঞা থেকে বহিষ্কৃত।

শিল্পীর আদর্শহীনতা এবং বাস্তববিচ্যুত আদর্শ-নিষ্ঠার অস্বাস্থ্যকর সকরুণ স্বাক্ষর মেলে সমসাময়িক বাঙ্গালা-সাহিত্যে। সেখানে একদল সাহিত্যিক আদর্শ কিংবা অনাদর্শ নিয়ে কিছুমাত্র ব্যতিব্যস্ত নন্।...অলডাস হাক্সলীয়

বুদ্ধি-চমক, এজরা পাউণ্ড কিংবা এলিয়টীয় বাঁকা-চোরা ভঙ্গীর ভেতরেই তাঁরা তাঁদের সাহিত্যজীবনের, তাঁদের ব্যক্তিত্বের সব কিছু সার্থকতা খুঁজে পান। এঁরা নিজেদের ব্যক্তিমনের বিসর্জন কিংবা অবলুপ্তিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত নন্।...সাম্প্রতিক সাহিত্যে যাঁরা সিনিক্, তাঁদের আদর্শহীনতা কিন্তু জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য-জাত নয়।...জীবনের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ, তীব্র এবং তীক্ষ্ণ চেতনা এবং সেই সুবাদে জীবনের সমগ্র সম্ভাবনার ধ্বংসোন্মুখিনতায় হতাশার ধূম্রজালে যে কোন বিশেষ বস্তু কিংবা ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠার অভাব, তাঁদের সিনিসিজমের জন্মদাতা। জীবনের প্রতি এঁদের বিদ্রূপাত্মক কশাঘাত সর্ব্বদা বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্ভূত না হলেও বাস্তবানুগ, অতএব উপভোগ্য। কিন্তু এঁদের মুস্কিল এই, কী দৈনন্দিন জীবনে, কী শিল্প জীবনে সৃষ্টির সামগ্রিকতা এঁদের স্ব-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। জীবনে এঁদের ভেতরে যাঁরা দুর্বলতর, তাঁরা কিন্তু নৈরাশ্য, এবং হতাশার পীড়নে পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় দেন আদর্শহীনেরই ন্যায় পরস্ব অতি-বুদ্ধির চমক কিংবা দুর্বোধ্যতার আড়ালে।

অন্যদল ভারতীয় জীবনদর্শনাদর্শের প্রতি অহেতুক নিষ্ঠাধিক্যে এবং ভারতীয় সভ্যতা প্রচারের গুরুদায়িত্ব বোধের পীড়নে নিতান্তই বিপর্যস্ত। তাঁদের জীবনাদর্শ সমসাময়িক জীবন থেকে সম্ভূত জীবন্ত আদর্শ নয়, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাও তাই তাঁদের কিছুমাত্র সুস্থ-স্বাভাবিক নয়: আদর্শ-নিষ্ঠার অস্বাভাবিক উগ্রতা তাঁদের শিল্পী মনের ব্যক্তিত্বকে নিষ্পেষিত করে শিল্পীকে বিদূষক চরিত্রে করেছে রূপান্তরিত। কারণে অকারণে দুর্বল হস্তে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের শব্দভেদী শর নিক্ষেপণ শুধুই যেন deusex machina। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের সর্ব্বাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে হাক্সলীয় অভিযোগ অপেক্ষাও এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাই গুরুতর।

এরই সমান্তরালে প্রগতি সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী তরুণ লেখকগোষ্ঠী। তাঁদের আদর্শ-নিষ্ঠা প্রশংসনীয়, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং শক্তি যথেষ্ট। কিন্তু এঁদের আদর্শও অনাগত এবং বিদেশাগত জীবনাদর্শ। বৈশিষ্ট্যবাদীর দৃষ্টি অবিরাম পশ্চাতে নিবদ্ধ; এঁদের দৃষ্টি অনাগত সুদূর ভবিষ্যাভিমুখে। ফলে, এঁদের সৃষ্টিতেও সমসাময়িক সমাজজীবনাবেষ্টনী প্রতিফলিত হচ্ছে না।

অজাত এবং মৃত—কোন জীবনাদর্শই চলার পথে বাস্তবজীবনসম্ভূত স্বাভাবিক অভিজ্ঞতালব্ধ আদর্শ নয়। এঁদের সৃষ্টিতেও তাই আদর্শের মৃদু আলোকের স্বেচ্ছানুলেপনের অভাব। আদর্শের প্রতি কৃত্রিম কৌশলে বুদ্ধিলব্ধ নিষ্ঠাতিরেকের তীব্রালোক এঁদের ব্যক্তিত্বকেও আচ্ছন্ন করে' চোখকে ধাঁধিয়ে শিল্পী মনকে করে' তুলেছে অন্ধ। অবশ্য একগুঁয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ (কিংবা অশরীরী আত্মার !) বিগত জীবন কিংবা যৌবনের আত্মম্ভরিতাপূর্ণ অক্ষম এবং স্বার্থপর অহমিকা এবং তরুণের অনাগত জীবনের রঙীন স্বপ্নে ব্যবধান বড় কম নয়। প্রথমকে সবাই পরিহার করে, অন্যকে স্নেহানুশাসন। কিন্তু দুয়ের কোনটাই যে স্বাভাবিক নয় !

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যের ক্রমাভিব্যক্তির পথে একটি ধারা বিশেষ লক্ষণীয়। ধারাটি বাঙ্গালার নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের কেউ কেউ যে শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। এঁদের ভেতরে অনেকে প্রগতি সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসীও আছেন। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্তজীবনের সাথে নিবিড় সংযোগ, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও আদর্শের অনুলেপনের অপূর্ব সংমিশ্রণে যে নিজস্ব সংবেদনশীল অপূর্ব শিল্পিমনের উৎপত্তি, তা যেমনি অমোঘ, তেমনি অব্যর্থ। আদর্শ এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষ বৈজ্ঞানিকরূপে রূপায়িত করেছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে নিষ্পেষিত ও তার ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ ক'রে সৃষ্টিকে করে' তোলেনি পাণ্ডুর।

তা' ছাড়া, বাঙ্গালার অর্দ্ধ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যে বিশীর্ণ সঙ্কীর্ণ ধারা অধুনা নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনাভিমুখী, সে আবহাওয়ায় এঁদের অনেকেরই জন্মলাভ, এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টির পথে এর অবদান বড় কম নয়।

প্রগতি সাহিত্যাদর্শের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল নয়। এ আদর্শ বিশেষ দেশের জীবন্ত অভিজ্ঞতালব্ধ। তা' শুধু নয় ; এ আদর্শ যে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বারংবার বিজ্ঞান সাহায্যে সমাজের মানস-জীবন এবং বাস্তব জীবনের সম্পর্কটিকে উদ্ঘাটিত করেছে। সমাজের মানসজীবন বাস্তবজীবনানুগ, এবং এরা পরস্পর পরিপূরক। সমাজের বিশেষ বাস্তবজীবনের সাথে নিবিড় সংযোগের ফলে বাস্তব চাহিদার এ অপূর্ব উদ্ভাবনী। এরা জীবন পথে চলেছে,

এবং তারই সমান্তরালে মানসজীবনে রূপায়িত হয়েছে এদের পরবর্তী লক্ষ্য।...তাই আদর্শের খৃষ্টিতে কিংবা অনুসরণে মানস ও বাস্তব জীবন কখনও সঙ্গতি-সূত্র হারায় নি।...

এ-দেশে এ-আদর্শকে জীবন্ত করার পথে চাই নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্য। সুদূর আভিজাত্যকে পরিহার করে' পারিপার্শ্বিক বাস্তব জীবনের সাথে নিবিড় সংযোগ এ-পথে প্রথম প্রয়োজন। এ দেশের সমসাময়িক বাস্তবজীবন সমস্যা এ আদর্শকে নিজস্ব করার পথে সম্পূর্ণ অনুকূল নয়।...বাঙ্গালার প্রচলিত সমাজব্যবস্থা বহু বিভিন্ন বাস্তব উপাদানে গঠিত, অতএব বহুধা বিভক্ত। অতএব, সমাজের যে বিশেষ সামগ্রিক বাস্তব রূপের বৈপরিত্য-সঙ্ঘর্ষের ফলে এ আদর্শের স্বাভাবিক বিন্যাস সম্ভব, এ দেশে তার সম্পূর্ণ উপস্থিতির অভাব। অর্দ্ধ সামন্ততান্ত্রিক, বণিকতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক এমন কি, পুরোহিত তান্ত্রিকতার বিচিত্র উপাদান এবং সর্বোপরি ইংরেজ আগমনে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে মানস ও বাস্তব জীবনের অসামঞ্জস্যের জরদ্গব অবস্থার এ দেশীয় সমাজের সামগ্রিকতা। তাই, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় জীবন-দর্শন এ দেশে যেমনি অংশতঃ এখনও জীবন্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী য়ুরোপীয় রবীন্দ্রনাথও ঠিক ততটাই, অথবা খানিকটা বেশী, সত্য (রবীন্দ্রনাথে জীবন-দেবতা তাই অমূলক হলেও অহেতুক নয় নিশ্চয়ই)। এতদুভয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ এবং সর্বোপরি বুদ্ধির অপূর্ব কারুকার্য—এতদতিরিক্ত রবীন্দ্রনাথের কোন সত্তাই নেই।...

কিন্তু সমাজের বাস্তবজীবনে সামন্ততান্ত্রিক পুরোহিত তান্ত্রিক এবং বিগত শতাব্দীর ইতিহাসের অন্যান্য উপকরণ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়ও যেমনি ক্রমাগতই অপসৃয়মাণ, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ আগমনে অন্ততঃ শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে রূপ রস বুদ্ধি চমকের যে অবকাশ দিয়েছিল, অপরিহার্য কারণে আজকে তা' বাষ্পায়িত। তাই রবীন্দ্রনাথের পুন প্রতিষ্ঠা শুধুই অসহ্য নয়, অসম্ভবও।

সমাজের বাস্তব উপকরণ তাই ক্রমাগতই বৈপরিত্য সংঘর্ষ কিংবা dialectical antethesis দ্বারা প্রগতি সাহিত্যাদর্শকে জীবন্ত রূপদানে অনুকূল রূপ নিচ্ছে। প্রগতি সাহিত্যাদর্শের ভবিষ্যৎ তাই অনুকূল নয়। সমাজজীবনে

এই বাস্তব অন্তরায় যে দিন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, প্রগতি সাহিত্যাদর্শ সে দিন জীবন্ত সাহিত্যাদর্শ।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রনীতিতে য়ুরোপীয় অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ নিন্দিত এই জন্যই যে, সে আদর্শ fact থেকে সম্ভূত কিংবা fact-এ রূপায়িত না হয়ে শুধুই faith-এ গিয়ে দাড়িয়েছিল। রাষ্ট্রনীতির তৎকালীন বাস্তব চাহিদা—রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত স্বার্থের সংগঠন এবং পরবর্ত্তী কালে বণিকতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক স্বার্থের বিকাশ প্রচেষ্টা—পথ খুঁজে পেয়েছিল রেণেসাঁ যুগের আদর্শ এবং রুশোর জীবনদর্শনে রাষ্ট্রনীতির তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে এরা তাই জীবন্ত আদর্শ। ঠিক তেমনি অদূর ভবিষ্যতে (ক্ষণস্থায়ী ফ্যাসিজমের কথা ধরে দিলেও) প্রগতি সাহিত্যাদর্শেই আমাদের বাস্তব চাহিদা তার মানসিক বিকাশের পথ খুঁজে পাবে।

জীবনে সে দিনও প্রগতি সাহিত্যাদর্শ "Illusion"-এর রঙীন ঢেউ তুলবে, কিন্তু সে তো শুধু অনাগত "Reality"র রঙীন ছদ্মবেশ। প্রতি পদক্ষেপে যে ছদ্মবেশের উন্মোচনে তার মুক্তিস্নান, ভ্রণমুক্তিতে জীবনবিকাশ; প্রতিক্ষণে নবতর "Illusion"-এর রূপায়নে স্রষ্টার, শিল্পীর অনন্ত প্রসব বেদনা: এগিয়ে চলার রহস্যময় হাতছানি।

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

* বরিশাল সুধীর-স্মৃতি পাঠচক্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

লক্ষ্মীছাড়ী

১৬

ছোটগিন্নি এবাড়ি থেকে চলে যেতেই চায়। তারিণী উপলক্ষ্য মাত্র। একথা চন্দর জলের মতন বুঝেচে। বাড়িতে অশান্তির অভাব নেই। নিত্যি নতুন তো লেগেই আছে। বৌ তো ওর বাপকে দিনকতক দেখে আসবার ওজুহাত করে সরে পড়তে চাইছিল। ওর নিজের কিন্তু ব্যবহারটা, বিশেষ করে চাঁপার সামনে, ভাল হয়নি। চন্দর আর পারে না। কত ভাববে একটা মানুষে! ওর জায়গা-জমি, তেজারতি, মামলা, ব্যবসা আছে। তার ওপর উপরি ঘর-সংসারের দায়। তাও যে ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠতে লাগল। চাঁপা চলে গেচে যাক্, কিন্তু, একি! চন্দরের কি রকম করে ছোটগিন্নির ওপর একটা বিশ্বাস জন্মে গেচে যে সে কখনও অশোভন কাজ করে না। তবে আজ তার এত নিন্দে গ্রাম ছাপিয়ে ওর কাণে পৌঁছোচ্চে কেন? কি করেচে চাঁপা? আর তারিণীই বা কি এমন পুরুষ! সেই নন্দমুদীর আড়তে দেখেচে। বয়েসটা বেড়েচে, কিন্তু বুদ্ধিতে সে তো দশ বছরের ছেলে। চন্দর গুজবের সব কথা বিশ্বাস করে না। কারণ চাঁপা যখন শশীকে নিয়ে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েচে তার মধ্যে দোষ কোথায় ছিল? কিন্তু গ্রামের লোকে কিই না বলেচে। অবশ্য সে সব টিকলো না। কারণ এটা চন্দরের গ্রাম যেখানে তার রীতিমত আধিপত্য আছে। অল্প দু'কথায় ও অনেককেই চুপ করাতে পারে। কিন্তু ভিন্ গাঁয়ে ওর কোন জোরটা খাটবে। সেখানকার আদ্দেক লোকেই ওকে চেনে না। এর ওপর কেউ কেউ এসে বলে গেল, ওহে বাবাজি তুমি তো বুদ্ধিমান, মনে রেখো মুকুজ্জে গিন্নির সোমত্ত বয়েস। আর তারিণীটা তো লক্ষ্মীছাড়া। ওর আপন খুড়োই দূর করে দিয়েচে। দেরি কর না, তোমার নতুন মাকে ফিরিয়ে আন। জান না, স্ত্রীজাতি·····ইত্যাদি। চন্দরের বুদ্ধি একেবারে ঘুলিয়ে উঠল এইসব শুনে। ও অনেক ভেবে চিন্তে এই বুঝলে যে দুর্গার মতন দু-হাজার মেয়েকে ও শাসনে রাখতে পারে কিন্তু

চাঁপার মতন একটাকেও নয়। কেন যে পারে না, সে ভাবনায় মন লাগাবার মতন ক্ষমতা ওর আর নেই।

দুর্গার ওপর ও যেন খড়্গহস্ত। বলে, বৌ, তুই সর্ব্বনাশী। সংসারে আগুন জ্বালালি তো! ছোটগিন্নি এইটুকুন কচি মেয়ে। জীবনে তার কি সুখ আছে তা ভাবলি না। সে তো আর তোর গিন্নিপণা কাড়তে আসেনি, ভাঁড়ারের চাবিও চায়নি, সংসার খরচের টাকাও হাতে নেয়নি। তবে কেন তার ওপর তোর এত শত্রুতা? তার খাওয়া পরার খরচ কি ভেবেচিস্ তোর বাপের বাড়ি থেকে আসে? তবে তোর এত রোখ কিসের? ওইটুকুন মেয়ে, তার জীবনে সুখ নেই, আমোদ আহ্লাদ নেই, কি নিয়ে থাকবে? ছেলেপিলে-গুলোকে নিয়ে যাহোক করে দিন কাটাচ্ছিল, রাক্কুসীর তা সইল না। হারামজাদী, দেখিচিস্, শশীটার মুখখানা? ঐ একফোঁটা ছেলে কিরকম করে যেন গুম খেয়ে গেছে। একালসেঁড়ের ধাড়ি, আর কারুক্ষে সহ্য হয় না, নয়? কেন, ছেলে কি তোর একলার? সব ছেলে আমার। দূর করে দেব তোকে। এমন সংসার। কালি ঢেলে দিলে একেবারে। তোর ছেলেদের কি ধরে ধরে খাচ্ছিল? মলো যা অনামুখী। আমার কাঁচকলা। দেখে নিস্, কি করি আমি। জমি-জিরেৎ, টাকাকড়ি সব তোর বুকে চাপিয়ে দিয়ে চলে যাব যেদিকে দুচোখ চায়। সুখে থাকিস তখন।

এমনি করে দুবেলা চন্দর বৌকে খিঁচোবে। দুর্গা কি করবে। কথা বলবার মুখ আর ওর নেই। কিন্তু নারায়ণ সাক্ষি, ওর বুকটা জ্বলে পুড়ে খাক হতে চললো। চাঁপাকে কি ওই কম ভালবাসে। চাঁপার ওপর ওর হিংসে থাকবে কেন? বরং নিজের ছোট বোনের মতই তো তাকে ভালবাসে। পোড়া কপাল! তা নৈলে, হিতে বিপরীত হয় কখনো। কি করতে গিয়েছিল ও, আর কিসে দাঁড়াল। নারায়ণ তো জানেন ওর মনে পাপ আছে কিনা। তবে বয়েসে বড় হয়ে কি করে পায়ে ধরে ছোটগিন্নির কাছে মাপ চায়। তাও তো রাজি আছে। এমন সংসারে, চাঁপার মতন মেয়েকে নিয়ে ও মানাতে পারলে না কেন? গ্লানিতে নিজের গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করচে। কিন্তু শুধু কাঁদলে কি হবে! মুখখানা যদি ওর মা-মরা মেয়ের মতন হয় তাতেই বা কার কি যায় আসে, সংসারের কি হিত হবে? ওর জন্যই না ছোটগিন্নি

চলে গেল, স্বামীও যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে চাইছে, ছেলেগুলো মন-মরা হয়ে গেছে। এমন জীবন রাখা কেন ও ভেবে পেলে না। মনে করতে লাগল, গ্রামের যে সব বৌঝিরা গলায় দড়ি দিয়েচে, জলে ডুবেচে, তাদের কথা। হায় ভগবান, এই জন্যই কি মেয়েরা মরতে চায়!

এরকম দুঃখে শুধু অনুশোচনায় মন শান্ত হয় না। সমাধানের জন্যে মন ক্রমেই একান্ত হয়ে উঠতে থাকে। বেদনার ভেতরেই মন গোপনে গোপনে উপায় খুঁজতে থাকে। দুর্গা আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষে শশীকে আঁকড়ে ধরলে। কিন্তু বিপদ, শশী গোঁয়ার। তার ওপর মনে দাগা পেয়েচে। কিছুতেই ওকে রাজী করান গেল না। শুধু বললে, বাবাকে ভয় করে না বুঝি? দুর্গা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। ও নিজেই চন্দরকে বলতে পারত চাঁপাকে ফিরিয়ে আনবার কথা। কিন্তু শশীর মুখ দিয়ে কথাটা পাড়লে যে চন্দরের মন মুচড়ে উঠবে, এই দুর্গা ভেবেছিল। চন্দর যতক্ষণ বাইরে থাকে দুর্গা একেবারে নির্বিষ সাপের মতন গর্জ্জাতে লাগল। অলপ্পেয়ে, লক্ষ্মিছাড়া ছেলে, কেবল গেলবার কুটুম। দাঁড়াও জব্দ করচি তোমায়। ফ্যানে-ভাতে খাওয়াবো, ছেঁড়া টেনি পরিয়ে রাখব, রাত্তিরে ঘরে শুতে দেব না, দূর করে দেব, উঠোনে কুকুরের মতন শুয়ে থাকবি। হাড়হাবাতেগুলোর জ্বালায় হাড়মাস ভাজা ভাজা করে তুললে। মরণও হয় না আমার। হে মধুসূদন! এদের হাত থেকে নিস্তার পাই। বলতে বলতে দুর্গার চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগল।

আহা, বেচারি শশী! ওইটুকুন ছেলে, ও কি করে বুঝবে, গোলমাল কোনখানে। তবে অপরিষ্কার, ঘোলা মতন খানিকটা অনুভব-বৃত্তি আছে। তাই দিয়ে ও বুঝলে, মার শাসানিতে সত্যি নেই। তাহলে কখনো চোখ দিয়ে জল পড়ে? কিন্তু মনটা ওর যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। শশী তাহলে ঘা খেতে শিখচে, পৃথিবীর সঙ্গে মিশচে। শশী ওর বাপকে যমের মতন ভয় করে। তবে কি করে বলবে? আর তাছাড়া ওর কথা শুনে বাবা যাবে দিদিকে আনতে! তবেই হয়েচে! সেই কবে একদিন বলেছিল বাবার সঙ্গে যাবে আড়ৎ দেখতে। তাই নিয়ে গেল না, আবার হুঁ। কাজেই কথাটা ও বাবাকে বলতেই পারবে না। গোঁয়ার শশী এই ভেবে রাখলে।

কি মুস্কিল। তিনটে প্রাণীকে মুখে কাপড় গুঁজে, হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েচে। নিরুপায় হয়ে শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই আছে প্রতিদিনের অজানার দিকে। কোন বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই, ভাবনারও শেষ নেই। হঠাৎ একটা ঘটনায় কিন্তু এই ভাবের অবসান ঘটল। অনেক রাত্তিরে একদিন শশী 'দিদি দিদি' বলে কেঁদে উঠল। চন্দরের ঘুম ভাঙবার কথা নয়। কারণ সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি প্রায় আধমরা করে আনে। কিন্তু আচম্‌কা ঘুমটা ওরই ভাঙল। উঠে শশীর পিঠে আস্তে আস্তে থাবড়ে ঘুম পাড়ালে। শশী বারকয়েক ফুঁপিয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। কে জানে, চন্দর কি ভাবলে। বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে পিদ্দিমটা জ্বাললে। ওর পাশেই শোয় শশী। আলোর শিখাটা কাছে এনে ওর মুখ দেখতে লাগল। চন্দর আজ ভাল করে দেখলে, শশী যেন বদলে গেচে আগেকার চেয়ে। মনে হল, কতকাল বোধ হয় শশীর দিকে ভাল করেই চায়নি। মাথায় ওর খোঁচা খোঁচা কদমফুলের মতন চুল, বড় বড় ভাবালু চোখ, মাটির মতন কালো রং, নিরেট গড়ন—কি মিষ্টি শশীটা। সেই মিষ্টি শশী আজ কেমনতর বদলে গেচে। শশীর পাশে রাখালী, তারপরে পুঁটু। চন্দর আলোটা এদেরও মুখের কাছে এনে দেখলে। কিন্তু চন্দরের নজর তাড়াতাড়ি গেল দুর্গার দিকে। এলোমেলো হোয়ে ঘুমিয়ে রয়েচে বৌটা। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। সংসার চালাতে পরিশ্রম করতে হয়। তাই বোধ হয় স্বাস্থ্য অটুট হয়ে জমে উঠেচে। চন্দর একেবারে অবাক হয়েচে। সৌন্দর্য্য বোধ হয় হাত দিয়ে ছোঁওয়ার চাইতে চোখ দিয়ে দেখায় বেশী আনন্দ, বেশী তৃপ্তি। রংয়ের তফাৎ, শরীরের উঁচু নীচুতে চন্দরের মন আটকে গেচে। দুর্গার পেটের কাছ পর্য্যন্ত কাপড় নেই। সুগভীর নাভিদেশ, তার চারিদিক দিয়ে শরীরের ঢাল নেবে গেচে। চন্দর চেয়ে রৈল কতক্ষণ। হঠাৎ ওর খেয়াল হল। দেওয়ালের দিকে ফেরান মুখখানা দেখতে ও পিদ্দিম নিয়ে এগিয়ে এল। দুর্গার মুখের দিকে চেয়ে চন্দর চমকে উঠল। ঘুমন্ত মুখখানা যেন কষ্টে দুঃখে এখনও কিরকম ম্লান হয়ে রয়েচে। আস্তে আস্তে দুর্গার গায়ের ওপর কাপড় টেনে দিয়ে চন্দর পিদ্দিমটা নিভিয়ে দিলে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, মানুষের অন্তরাত্মা, নিগূঢ় আত্মার কথা। গভীর মনের যে দুঃখ, মানুষ ঘুমোলে কি

আত্মা জেগে তা প্রকাশ করে? তা নৈলে, শশী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অমন করে কেঁদে উঠল কেন? দুর্গার মুখখানা অত কষ্টের কেন? চন্দরের নিজের ওপর রাগ হয়ে গেল। দুর্গা তাহলে মুখ বুজে কত না সয়েচে। আর ও। মরার ওপর কিনা খাঁড়ার ঘা দিয়েই এসেচে। প্রতিদিন কত গালাগালি করেচে।

(১৭)

তখন ভরসন্ধ্যে। চাঁপা তুলসীতলায় পিদ্দিম রেখে প্রণাম করচে সবে। সদর দরজার কাছে গরুর গাড়ী এসে থামলো। তাই বলে চন্দর এসে উপস্থিত হবে, একথা চাঁপা কল্পনাও করেনি। একেবারে অবাক হয়ে বললে, ওমা, তুমি!

চন্দর হেঁট হয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করে বললে, হ্যাঁ তোমায় দেখতে এলুম। কতদিন হল, একলা রয়েচ। ভাল আছ তো?

চাঁপা একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, বৌ ভাল আছে? তা তুমি এলে যদি, শশীকে সঙ্গে করে আনলে না কেন? আমি বাড়িতে একলা থাকি জান তো? চন্দর অবাক। বললে, বল কি ছোটগিন্নি, আমি যে তোমার ছেলে!

কথা কেড়ে নিয়ে চাঁপা বললে, তুমি যে আমার ছেলে নও একথা পৃথিবী-শুদ্ধ লোক সবাই জানে। শশীকে আনলেই ভাল করতে। দু-বেলা দুমুঠো খেতে আসে তারিণী দাদা, তাই নিয়ে এত। সেও তো আমার ভাই। কিন্তু গাঁয়ের লোকে বলবে, তারিণী যেমন দাদা, তুমিও তেমনি আমার ছেলে। ইচ্ছে করে এইসব লোকদের কেটে ফেলি।

লজ্জায় চন্দরের কান পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চন্দর বললে, আমি যে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলুম। এখুনি তো তুমি যেতে পারবে না। বল তাহলে, গাড়িটা এখনো বেশী দূরে যায়নি। তাকে ফিরোই।

তাচ্ছিল্য করে চাঁপা বললে, তবেই হয়েচে। এই রাত্তিরে তোমার সঙ্গে আমি যাই, আর গ্রামে রব উঠুক, তোমার সঙ্গে রাতের আঁধারে পালিয়েচি। ভারি মজাই হবে, নয়?

কি বলতে হবে চন্দর ভেবে পেলে না। বললে, তাহলে আজ রাত্তিরটা আমাকে থাকতেই হয়।

চাঁপার গলার স্বর কঠিন শোনাল। বললে, থাক। খেয়ে দেয়ে তারিণী দাদার সঙ্গে গিয়ে ওর দোকানে শোওগে।

বাড়িতে পা দিয়ে অবধি একি! সেই কোন ভোরে উঠে চন্দর আড়তে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করেচে। তারপর হন্তদন্ত হয়ে ফিরে ছুটিখানি নাকেমুখে গুঁজে সারাদিনটা গোরুর গাড়িতে ঢিকোতে ঢিকোতে এল। কোথায় চাঁপা আহ্লাদ করবে। তা নয়, এ যেন মারমুখী মেয়ে। ওর মেজাজ গরম হয়ে উঠল। বললে, রাত্তিরটা বাড়িতে থাকতে দিতে তোমার অত ভয় কিসের ছোটগিন্নি?

ব্যস আগুনে ঘি পড়ল। চাঁপার কুঁদুলে নাড়ি জেগে উঠল। বললে, ভয় আমার, না তোমার? কাল যদি গ্রামের লোকে আমাকে নিয়ে তোমার সম্বন্ধে কিছু রটায়, তাতে আমার কাঁচকলা। কিন্তু তুমি গিয়ে বোয়ের কাছে দাঁড়াবে কি করে? তোমার গ্রামের সমাজে চলাফেরা করবে কেমন করে! ভেবেচ সে কথা? তোমার না হয় জমিদারী আছে, অনেক টাকা আছে, লেঠেল আছে। তাই দিয়ে না হয় গ্রামের লোকের মুখবন্ধ রাখলে। কিন্তু বৌকে কি বোঝাবে বল তো?

চন্দর চটে উঠল। বললে, ছোটগিন্নি, ওসব বাজে কথা রাখ। কোথায় কি তার ঠিক নেই, তার জন্যে মিথ্যে আকাশপাতাল ভাববার কোন দরকার দেখি না। বাজে কথা বলে আর আমার মাথা ঘুলিয়ে দিও না। এখন যা বলচি শোন। কথাটা ধীরে সুস্থে বলব ভেবেছিলুম কিন্তু তোমার ঝাঁঝ ভাল লাগচে না। অনর্থক মাথা গরম হয়ে উঠচে।—কাল খাওয়াদাওয়ার পর তুমি এখান থেকে রওনা হবে।

চাঁপা একেবারে শান্ত মেয়ের মতন বললে, কি হবে তাতে?

চন্দর বললে লাভ লোকসান অত খতিয়ে বোঝাতে পারব না। তবে তুমি ফিরে গেলে, আমরাও বাঁচি, তুমিও বাঁচ।

চাঁপা কিছু বললে না। চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রৈল। তারপর এক ঘটি জল আর গামছা এনে বললে, মুখ হাত পা ধোও।

চন্দর কাঁধের চাদর দাবায় রেখে মুখ হাত ধুতে বসলো। চাঁপা একখানা সানকীতে তেল নুন মেখে মুড়ি নিয়ে এল। থালার কোণে খানকতক বাতাসা।

চাঁপা বললে, তুমি ততক্ষণ খাও, আমি নারিকেল কুরে আনি।

চন্দর দাবায় বসে একা একা মুড়ি খেতে লাগল। চাঁপা একা গেচে তারিণীর দোকানে ঘি ময়দা আনতে। চন্দরকে যত্ন করে খাওয়াতে হবে। সারাদিন এই ভাদ্দুরে রোদে গাড়ির ঝাঁকানি খেতে খেতে চন্দরের সারা গতর একেবারে চূর্ণ হয়ে গেচে। কোথায় ভাবতে ভাবতে আসচে যে পৌঁছে, হাত পা ছড়িয়ে একটু শুয়ে বাঁচবে। চুলোয় গেল শোয়া। এখন চাঁপাকে কি করে বাগে আনবে সেই ভাবনাতেই ওর মন উতলা হয়ে উঠল। এক ঘটি জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে চন্দর চাদরখানা বিছিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে গেল যে ছোটগিন্নি এই দুটো মাসে কি আশ্চর্য্য বদলেচে। যেন আর চেনা যায় না। একেবারে নতুন লোক। কথা বলবার ওর সাহস ছিল। কিন্তু এ সব কথা এমন করে কোন মেয়ে বলতে পারে, এ চন্দরের ধারণারও অতীত। আসল কথা ভাবা হচ্ছে না দেখে বিরক্ত হয়ে চন্দর উঠে পড়ল। ট্যাঁক থেকে কৌটা বার করে একটা বিড়ি ধরালে। ভাবতে লাগল, মানুষের ভাবনাগুলো শুপুরি নারকেল গাছের মতন সোজা সোজা হয় না কেন? ফেঁকড়ি বেরিয়ে এ যেন ভাবনার বটপাকুড! একেবারে দশ বিঘে জায়গা ছেয়ে আছে! তাও তার যদি অমন সুন্দর ছায়া থাকত, না হয় পড়ে পড়ে ঘুম লাগান যেত।

গ্রাম্য ভদ্রলোক চন্দর। জানে না ভাবনার সুন্দর স্নিগ্ধ ছায়াও আছে। যেখানে পড়ে পড়ে জেগে স্বপ্ন দেখা চলে। হুহু করে দিন কেটে যায়। হাত পা অবশ হয়ে থাকে। জীবনের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে এ আবেশের মিল থাকে না। তখন কাজের লোকও অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমে পড়বার সুযোগ চন্দর কবে আর পেলে, যে জানবে এমনতর কথা। নাই বা জানলো। কিন্তু যা চন্দর জানে না, বোঝে না, তাই নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করা কেন। কথাটা লুকিয়ে লাভ নেই, চাঁপা প্রেমে পড়েচে। হয়তো, সেইজন্যেই এর ভেতোরে চন্দরকে একটা উৎপাত মনে হচ্চে। কি বিভ্রাট!

বিধবা মেয়ে চাঁপা। তার প্রেমে পড়া কেন! সহরে বিধবা-বিয়ে যে দু একটা না হচ্চে তা নয়। কিন্তু তাই বলে চাঁপার সঙ্গে তারিণীর সত্যিই তো বিয়ে হতে পারে না। ছিছি,--সমাজ তাহলে—! চন্দর মুখ দেখায় কেমন করে! চন্দর আর ভাবতে পারে না। এই সর্ব্বনেশে ভাবনা ওর মাথায় ঢুকলো কেন? কাণ মাথা একেবারে আগুন হয়ে উঠল যে! ঘটিটা খুঁজে, ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে মাথায় ঢালতে লাগল।

চাঁপা দু'হাতে জিনিষপত্তর নিয়ে দোকান থেকে ফিরে এসেচে। চন্দরের কাণ্ড দেখে নিঃশব্দে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ চাঁপাকে দেখে চন্দর থতিয়ে গেল। একটু কিন্তু ভাবে বললে, এই ভাদ্দুরে রদ্দুরে এতটা পথ আসা। মাথাটা একেবারে ছিঁড়ে পড়চে।

পরের দিন সকাল বেলা চাঁপা ওর বিষয় আশয় সম্বন্ধে চন্দরকে বুঝাতে লাগল। বললে, বাগানপুকুর পাঁচভূতে খাচ্চে আবার চোখ রাঙাতে ছাড়ে না। এ সব চলবে না। তুমি তারিণীদাদাকে সঙ্গে করে যাও মুকুজ্জে জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে, এখানকার সব তারিণীদাদার জিম্মা করে দাও। ও দেখাশোনা না করলে, কি উপায় হবে? চন্দর বুঝলে, চাঁপা উচিত কথা বলেচে। চন্দর তো আর সেখান থেকে এখানকার জমিজমার খোঁজখবর করতে পারবে না, তার চেয়ে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল। তা হলে বোধ হয় চাঁপার ফিরে যাবার মন হয়েচে। সেই ভাল। এত সহজে যে কাজ উদ্ধার হবে, চন্দর তা ভাবেনি। প্রসন্ন মনে ও তারিণীকে সঙ্গে করে বেরল। গেল মুকুজ্জের বাড়ি। সেখানে সবে তামাকের আড্ডা বসেচে। চন্দরকে পৌঁছে দিয়েই তারিণী দোকান খুলতে এল। নিজের পরিচয় দিতে চন্দর রীতিমত খাতির পেলে, সাজা হুঁকো ওর দিকেই প্রথমে এল। কুশল প্রশ্নের পর একে একে নানারকমের এলোমেলো কথা উঠলো। শেষে তারিণীর কথায় এসে আলাপটার স্থিতি হল। তারিণীর জন্ম বৃত্তান্ত থেকে সুরু করে গতকাল দিনটী পর্য্যন্ত নানামুখে একেবারে চিত্রবিচিত্রিত হয়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যে চাঁপার কথা কোথাও ছিল না, শেষে তাও এলো। অর্থাৎ চাঁপার মতন লক্ষ্মী, দেবী মেয়েকে কি শেষে তারিণীর মতন শয়তান একটা বিপদে ফেলবে! চন্দর মুকুজ্জের যথাবিহিত

করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েচে। তারিণীকে ওরা কবে গাঁ-ছাড়া করতে পারত, কিন্তু শুধু চাঁপার খাতিরে তা করেনি। কারণ ওরা জানে, চাঁপা সতী লক্ষ্মী। তা নৈলে, হতভাগাটা চাঁপাকে নিয়ে কি-ই না করবার চেষ্টা করেচে, পাড়ায় সবাই তো তার সাক্ষী। চন্দরকে অনেক অশ্লীল গল্প আকার ইঙ্গিতে শুনতে হল। চন্দরের বরাবরই কেমন একটা স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব আছে। ও সেই চালে সবাইকার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে বললে, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি মা-ঠাকরুণকে নিয়ে যেতেই এসেছি। আর জায়গা-জমি সম্বন্ধে দেখাশোনার ভার তারিণীর ওপর দিয়ে যাচ্চি, সেই কথা জানাতে এসেছিলুম।

জমাট আসর যেন চিড় খেয়ে ফেটে গেল। কারণ তারিণী যে তাহলে চাঁপাকে কলা দেখিয়ে সর্ব্বস্বাৎ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বরঞ্চ কোন প্রবীণ লোকের হাতে ভার থাকলে, মাছটা ফল-পাকড়টা যথাসময়ে পৌঁছতো, ঘর-দোর ঠিক থাকত। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে দমবার পাত্র চন্দর নয়। কাজেই রায় তার বহাল রৈল! তাতে গ্রামের মন্ত্রী মণ্ডলের টনক নড়ল। চন্দর জানে, গ্রামের লোকের খোরাক কি? সব বিশ্বাস না করলেও, ওর বিশ্বাস, যা রটে তার কিছু বটেই। মোট কথা, রাগে ওর মাথাটা দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। মনে হল, এক চড়ে তারিণীর গাল ফাটিয়ে চৌচির করে দেয়। কিন্তু রাগ হজম করে ও বাড়ি ফিরে এল। চাঁপা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। চন্দর বললে, তারিণী সব দেখাশুনা করবে, এই বন্দোবস্ত করে এলুম।

একটু ইতস্তত করে চাঁপা জিজ্ঞেস করলে, আর আমার নামে কিছু শুনলে না?

চন্দর বললে, ওসব কথা আর তুলো না। মাথা বিগড়ে যাবে। মোট কথা, তোমার এখানে আর দু-দণ্ড-ও থাকা চলবে না। খাওয়া-দাওয়া চটপট সেরে নাও, বেলা থাকতে বেরিয়ে পড়ি। গাড়ি বায়না করে এসেচি।

চাঁপা জিজ্ঞেস করলে, তার মানে?

চন্দর তিরিক্ষি মেজাজে বললে, মানে আবার কি, তোমাকে যেতে হবে।

ধীরে ধীরে চাঁপা বললে, জোর নাকি!

চন্দর একেবারে ক্ষেপে উঠেচে। বললে, দরকার হয়, জোর করেই নিয়ে যাবো।

ঠোঁট উল্টে, চোখ বেঁকিয়ে চাঁপা বললে, তুমি মস্ত মন্দ, তা জানি। জোর ফলাওগে যাও তোমার গ্রামে। আমার ওপোর কোন জোর খাটবে না, একথা জেনে রেখ। আমি তোমার কেনা বাঁদি, একথা ভেব না। তোমার বাপ, ঘাটের মড়া, আমাকে বিয়ে করেছিল, সেই সূত্রে না তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক। তা সেও মরেচে, সম্পর্কও চুকেচে। তোমার অন্নও খাচ্চি না, বস্তোর-ও পরচি না যে তোমার চোখ-রাঙানিতে ভয় পাব। এ আমার বাপের ভিটে, একথা মনে থাকে যেন! দেখি, কে আমাকে এখান থেকে নড়ায়!

চন্দরের কোন কথা জোগাল না। চুপ করে রৈল। চাঁপার জীবনের এই অবস্থার জন্যে ও দায়ি নয়! বাপের সঙ্গে ও ঝগড়া করচে, পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে চলে যাবে বলে শাসিয়েচে, কিন্তু ফল হয়নি। বুড়ো বাপ ওর হাত ধরে মিনতি করেচে, বুঝিয়েচে, বেশী দিন বাঁচবে না, আরো কত কি। তবে, চাঁপার এ অবস্থার জন্যে চন্দরের কি? তবুও নিজকে ওর ভারি অপরাধী বলে মনে হল। ভাবের এই রূপান্তরে, চন্দরের মন থেকে রাগ ধুয়ে মুছে গেল। নতুন মনভাবের মানষিকতায় ওর রূপ ভিন্ন দেখাল। রীতিমত নরম হয়ে বললে, তুমি চলে আসা থেকে আমাদের সংসার উৎসন্নে যেতে বসেচে। তুমি জান না ছোট গিন্নি, শশীটা তোমার জন্যে মনকষ্টে একেবারে আধখানা হয়ে গেছে। রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমাকে ডাকে।

একবারে হু-হু করে চাঁপা কেঁদে উঠল। বললে, ওসব কথা আমাকে শোনাবার দরকার কি? তোমাদের ছেলে কাঁদে, কি রোগা হয়, সে তোমরা বুঝবে। ভেব না, এই দিয়ে ভুলিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে।

খাওয়াদাওয়া চুকলে চাঁপা বাসনকোসন মাজলো, ঘরদোর নিকোলে, আরো কত খুঁটিনাটি কাজ সারলে। তারপর সারাদিন কোথায় গিয়ে রৈলো, কে জানে। চন্দর কতক্ষণ অপেক্ষা করে করে, বেলা একেবারে গড়িয়ে যেতে, তারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

(১৮)

রাত্তিরে তারিণী খেতে বসে বললে, চাঁপা তুই গেলেই ভাল হত। চন্দরবাবু নিজে যখন এলেন, তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়াটা কিরকম হল?

চাঁপা একেবারে নিরুত্তর।

তারিণীর মনে ভয় লেগেছে। সকালের বৈঠকি খবরের কিছু কিছু ওর কানে এসেচে। তাছাড়া, এই তো সেদিন, শ্রাবণ মাসের ঘটনা। কি বর্ষাটাই নাবলো ক-দিন! মুষলধারে বিষ্টি, একদণ্ডের জন্যে ধরণ নেই। বাড়িতে চাঁপা একলা শুতো। একদিন বললে, তারিণী দাদা, এই বর্ষা, আমার ভারি ভয় করে। কেউ যদি এসে গলা টিপে ধরে, কোনো উপায় নেই। কাকেই বা ডাকবো। আর এই বিষ্টি আর বাজের শব্দ ছাপিয়ে কার কানেই বা আমার গলা পৌঁছবে। তার চেয়ে তুমি দুদিন বাড়িতে শোও। আমি ভাঁড়ার ঘরেই শোব। অনেক ইতস্তত করে তারিণী শেষে রাজি হয়েছিল। কদিন কাটল। কিন্তু সেই একটা রাত্তির, উঃ দুর্যোগ বটে। আকাশ একেবারে ভেঙে এল। যেমনি ঝড় তেমনি বিষ্টি। গাছের ডাল মড়্‌মড়্‌ করে ভাঙল। কত গাছ উপড়লো সেদিন। নিশ্চিন্ত হয়েই তারিণী ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে ওর ঘুম ভাঙল। তারপরেই উঠনেতে ভারি জিনিষ পড়ার শব্দ পেলে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে, দাবার খুঁটি ধরে অন্ধকার উঠনের দিকে চেয়ে দাঁড়াল। বুকের ভেতর তখন ওর ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে শব্দ হচ্চে। শাঁ শাঁ করে ঝড় নারকেল সুপারি গাছের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্চে। তালের পাতাগুলো যেন মড়মড় করে গুঁড়োচ্চে। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে দেখলে, উঠনে শাদা মতন একটা কি পড়ে রয়েচে। তাড়াতাড়ি নেবে গেল। পা ঠেকতে শিউরে উঠ্‌ল। দ্বিতীয়বার বিদ্যুতের আলোতে দেখলে, চাঁপা। তারপর আর কি। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ভিজল। কারণ, কি করতে হবে, হঠাৎ মাথায় এল না। যখন শীতের চোটে কাঁপুনি ধরল, তারিণী দু-একবার অস্পষ্টভাবে চাঁপাকে ডাকলে। এ ডাক, এই দুর্যোগের রাতে, মনে-মনে-বলা কথার মত অশ্রুতই রইল। তারপর পাঁজাকোলা করে চাঁপাকে তারিণী দাবায় এনে রাখলে। দেখলে, চাঁপা-টা ভীষণ ভারি। আর ও-বেচারি

ম্যালেরিয়ায় ভুগে হাড়-জিরজিরে। দাবায় শুইয়ে, ওর মনে এতক্ষণে ভয় জাগল, চাঁপা মরে গেছে কিনা! তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে আলো জ্বাললে। তারপর চাঁপাকে আবার বয়ে নিয়ে এল ঘরে। পিদ্দিমের অল্প আলোতে দেখলে, চাঁপার মুখখানা অদ্ভুত শাদা মতন। আল্‌গা চুলগুলো লতিয়ে এসে মুখের ওপর নেপটে রয়েচে। ভিজে একেবারে ঢোল। কতক্ষণ চাঁপা উঠোনে পড়ে থেকেচে, কে জানে। কাপড়ময় কাদা লেগেচে। শেষে তারিণী চাঁপার নাকের কাছে হাত রাখলে। দেখলে ওর ঠাণ্ডা ভিজে হাতে গরম নিশ্বাস ধীরে ধীরে এসে লাগচে। ধড়ে প্রাণ এল। চাঁপা তাহলে মরেনি। এ অবস্থায় কি করতে হবে তারিণীর ঘটে এল না। ভিজে চাঁপা অচৈতন্য হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে রৈল। আর ভিজে তারিণী চুপ করে চাঁপার দিকে চেয়ে চৌকাঠের ওপর বসে রৈল। চাঁপা মরেনি, এই আশ্বাসে তারিণী প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েচে। বোকা তারিণীর এই বিপদের কথাটা ভুলতে বেশী সময় লাগে না। চাঁপার সৌষ্ঠব দেখে সে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেচে। কিন্তু শীতে বেচারির পাঁজরায় পাঁজরায় ঠক্‌ঠকানি লেগেচে। উঠে গামছাখানা খুঁজে, দাবায় দাঁড়িয়ে গা হাত-পা পুঁছতে লাগল। হঠাৎ ঘরে ফোঁস্ করে একটা শব্দ হল। তারিণী ভাবলে, সাপ। ঘরে ঢুকে দেখে, একখানা হাত কপালের ওপর তুলে চাঁপা শুয়ে আছে। চাঁপাকে ডেকে তারিণী অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলে। সঙ্কোচে চাঁপা কিন্তু হয়ে উঠল। ভিজে কাপড় বদলাতে বলে তারিণী বেরিয়ে দাবায় এসে দাঁড়াল আর অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। তারপর চাঁপা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলেচে, কে যেন তার ভাঁড়ার ঘরের কানাচ থেকে জানলা দিয়ে ডাকল। তারপর ঝোপঝাড় ঠেলে ভারি পায়ে চলে গেল। চাঁপা তারিণীকে ডাক্‌তে ডাকতে ঘরের বাইরে এসেচে। তারপর আর ওর তো জানা নেই। তারিণী বিছানার কোণে বসে শুনতে শুনতে ঢুলেচে। চাঁপা ক্লান্তিতে ঘুমিয়েচে। তারিণীও কখন সেইখানে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েচে। সলতে পুড়ে পুড়ে পিদ্দিমের বুক পর্য্যন্ত জ্বলে আপনিই নিভে গেছে কখন। রাত কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেচে কেউ জানে না। ভোরে ওদের ঘুম ভেঙেচে পাড়ার লোকের গোলমালে। জানালাটার কাছে ভিড়ে একেবার

ভিড়। কি নিন্দেই রটল তারপরে! ছি ছি! কিন্তু আশ্চর্য্য, এই আধমরা তারিণীর কি তেজ। চাঁপা কিন্তু ওকে একেবারে নিভিয়ে দিলে। অতএব দুর্নামের ঘূর্ণি ঘুরতে ঘুরতে দূরে চলে গেল এবং ধূলা বালি উড়িয়ে ওদের মুখ কালি করে দিয়ে গেল।—এই পুরণো দিনের ভয় আছে তারিণীর মনে। ভাবত-স্বরে বললে, জানিস চাঁপা, ওরা বলচে, আমার দোকানে আগুন লাগিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারবে।

চাঁপা তো হেসেই আকুল। বললে, তারিণী দাদা তার জন্যে তোমার ভাবনা নেই গ্রামের লোকে অত বোকা নয়। তোমার দোকানে আগুন দিলে, ওর লাগয়া বিশখানা বাড়িঘর কি অমনি থাকবে ভেবেচ? অমন কাজ ওরা করবে না, ভয় নেই। এইসব মিথ্যে নিন্দের ভয় যদি তোমার অতই, তাহলে এক কাজ কর। তোমার আর এখানে খেতে এসে কাজ নেই। ও ব্যবস্থা দোকানে তুমি যেমন করতে, তাই করগে। তুমি আর এমুখ হয়ো না। এ আমার বাস্তু-ভিটে। এখান থেকে আমি যাই, না-যাই, তাতে কার কি?

তারিণী আর কি বলবে! খেয়ে দেয়ে, আলো জ্বেলে ও দোকানে শুতে চলে গেল।

পরের দিন সকালে, চাঁপা তখন সবে নেয়ে এসেচে। রান্নার আয়োজন করচে। এমন সময়ে চন্দরের আড়তের বক্সী এসে হাজির। প্রণাম করে, চাঁপার হাতে একখানা চিঠি দিলে। চাঁপা চিঠিখানা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললে, কি ব্যাপার, তুমি বল না, আমি কি পড়তে জানি?

বক্সী বললে, তোমাকে মা-ঠাক্‌রুণ এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।

চাঁপা রুখে উঠল। বল্‌লে, কেন, তোমার মণিবের হুকুম নাকি?

বক্সী ব্যবসাদার লোক, কালক্ষেপ না করে চিঠিখানা পড়ে শোনালে। চাঁপা অবাক। কেন এমন হল! চন্দরের ভেদবমি কেন হঠাৎ? চাঁপা কি কিছু খাবার খাইয়েচে? তবে! রান্না হল না আর।

চাঁপা বাড়ি গিয়ে পৌঁছাল যখন ভরদুপুর। বাড়িতে পা দিয়ে দেখলে, চন্দর দাবায় বসে তেল মাখচে।

চাঁপা ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলে, এটা তাহলে ফিকির।

চন্দর একগাল হেসে বল্‌লে, তা ছোট্‌গিন্নি, এতে দোষ কি ? সবদিক তো বাঁচিয়ে চলতে হবে। তোমার কি বল। কোন দায় দায়িত্বের ধার ধারতে হয় না তো। আমি ফন্দি ফিকির দিয়ে আদ্দেক কাজ উদ্ধার করি।

চাঁপা বললে, আমাকে তাহলে এখানে থাকতেই হবে। বেশ, তাহলে খানিকটা দড়ির বন্দোবস্ত করা, আমাকে না বাঁধলে, এমনি তো রাখতে পারবে না।

চন্দর মিষ্টি করে বল্‌লে, ছোটগিন্নি, এ ঘর সংসার সবই তো তোমার। আমরা তো তোমার আশ্রিত। তুমি এখানে যেমন করে ইচ্ছে থাক, যা ইচ্ছে কর। আমার কাছে থাকলে, ভাবনা থাকে না। দূরে থাকলে কি করে দেখাশুনা করব বলত ? একটা মানুষ তো আমি, আর কতই বা ভাববো।

চাঁপা কঠিনভাবে বল্‌লে, আমাকে তোমার দেখাশোনা করবার দরকার নেই, আমার ভাবনাও তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার যা খুসী আমি তাই করব, তাতে তোমার কি ? পার তো কাল সকালে একখানা গাড়ি ডেকে দিও। আর না-পার তো, আমি হেঁটেই ফিরে যেতে পারব। আমি তোমার এসব ফিকির আর ফন্দিবাজির ভেতর নেই।

চন্দর একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে চুপ করে রৈল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

চিন্তাধারায় দ্বন্দ্ববাদ

চিন্তা করি আমরা সকলেই এবং সকলেই ভাবি যে আমি যা ভাবছি তাতে ভুল নেই। সেইখানেই কিন্তু আমরা ভুল ভাবি। যারা নিজেদের চিন্তাশক্তির নির্ভুলতা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ রাখে তারাই কিন্তু ভুল করে কম। কি ভাবে চিন্তাধারাকে পরিচালিত করলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম সেটাই এখানে আলোচনা করব।

যখন আমরা কোন একটি বিষয়ে চিন্তা করি, প্রথমে আমাদের মনে আসে একটি প্রশ্ন, ও তারপর আসে আংশিক উত্তর। এই আংশিক উত্তরটি হচ্ছে পরবর্ত্তী প্রশ্নের মূল ; উত্তরটির সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় চিন্তাধারার দ্বিতীয় ধাপ। এই ভাবে ধাপের পর ধাপ বেয়ে এগিয়ে চলে চিন্তাধারা মীমাংসার দিকে। চিন্তাধারার এই গতিধর্ম্ম বা ক্রমোন্নতিই হচ্ছে রহস্য সমাধানের মূলসূত্র।

এখন দেখা যাক, প্রথম প্রশ্নটি করতে হবে কি ভাবে এবং কি করেই বা তার উত্তর পাওয়া যাবে। আমাদের এই প্রশ্নটির দ্বারাই চিন্তাসমস্যার সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রশ্ন তুলছি। যখনই প্রশ্ন তুলছি তখনই শেষ লক্ষ্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রশ্নটিও উত্তর দেবার মত হওয়া চাই। 'অনাবিষ্কৃত গ্রহে প্রাণী আছে কিনা' এই ধরণের প্রশ্ন হলে চলবে না। কোন প্রশ্ন এমন হবে না যা অপ্রমাণিতের অস্তিত্বকে মেনে নেবে।

প্রশ্ন ও উত্তরকে আলাদা করে দেখলেও চলবে না। প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে, কিন্তু যে উত্তর দিতে জানে সেই একমাত্র জানে যে ঠিক উত্তর পেতে হলে কি ভাবে প্রশ্ন করতে হয়। কিন্তু তাই বলে কি উত্তর না জানা থাকলে প্রশ্ন করা চলবে না ? তা নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস হচ্ছে, প্রথম ধাপে কতকগুলো বোকাধরণের প্রশ্ন এবং তার উত্তরে কতকগুলো আধবোকা ধরণের উত্তর, দ্বিতীয় ধাপে প্রশ্নগুলো আবার সংস্কার করা এবং তার অপেক্ষাকৃত অর্থপূর্ণ উত্তর পাওয়া। এইভাবে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে শেষে খোঁজ পাওয়া যায় যে গোড়ায় কি ভাবে প্রশ্নটি করলে তার উত্তর পাওয়া যেত। এই ভাবে ভুল সংশোধন করে করে শেষ লক্ষ্যের দিকে যাওয়াটাই

প্রশস্ত। একে বলা হয় 'পরীক্ষা ও ভুল' প্রণালী (Trial and error)। একটী উদাহরণ নেওয়া যাক।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যুদ্ধের বিষয়ে আমার কৌতূহল হয় কেন ?" এখানে একটু ভাবলে দেখা যাবে যে 'যুদ্ধটা' আমার প্রশ্ন নয়; প্রশ্নটা হচ্ছে, কৌতূহল। 'যুদ্ধের মধ্যে কি আছে যা আমার কৌতূহল জাগায় ?" কিন্তু তা বলে যুদ্ধ কথাটা কি এ ক্ষেত্রে একেবারে বাদ দেওয়া চলবে ? তা চলবে না। যুদ্ধের আকর্ষণ বা বিকর্ষণের প্রশ্ন নয় এখানে। প্রশ্ন হচ্ছে যে যুদ্ধ নিয়ে কেন আমি মাথা ঘামাচ্ছি। মাথা ঘামায় লোকে কোন একটা সমস্যায় পড়লে সেটা সমাধানের জন্য। তা হলে প্রশ্ন এলো দু'টি বিষয় নিয়ে সমস্যা ও সমাধান। ভাবছি এখন যে কি করে দু'য়ের সামঞ্জস্য করা যায়। এখন দেখতে হবে সমস্যা কি, এবং সমাধানই বা কি ? দুটি বিরুদ্ধধর্ম্মী ব্যাপার। এদের প্রকৃতিকে বুঝতে হবে আগে। বোঝার প্রশ্ন এলো এখন। একটি বড় পটভূমির অংশ হিসাবে দু'টিকে বুঝাতে হবে। দু'টি বিরুদ্ধতার ফলাফল থেকেই সত্যকে বোঝা যায়। দেখা যাক এবার কোথায় আমার সমস্যা। হয়তো সমস্যা হচ্ছে যে আধুনিক যুগের যুদ্ধে এমন কি আছে যার দ্বারা যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে ? এখন আমি আজকের সঙ্গে কালকের তুলনায় এসে পড়লাম। আগে পৃথিবীর কোন একটি বিশিষ্ট অংশে যুদ্ধ হোত, আজ যুদ্ধের ছায়া পড়ে সারা জগতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই পরিবর্ত্তন হোল ? সেকালের ও একালের যুদ্ধের দু'টি বিরুদ্ধ রূপ এখন পাশাপাশি রাখা হল। এই ভাবে বিরুদ্ধ রূপগুলোকে আলাদা করে সাজালে লক্ষ্যস্থানে খুব শীঘ্র পৌঁছানো যায়। এখন যদি কেউ বলেন যে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আগেকার দিনে লোকের মাথায় আসেনি, তাই হোত না, প্রশ্ন করা যায় যে কেন মাথায় আসেনি ? তার উত্তরে অনেক কথা বলা যায় যেমন, যুদ্ধোপকরণের অভাব, অত লোকের খাদ্যের অভাব, যানবাহনের অভাব, যুদ্ধবিদ্যার অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি···। এইভাবে বহু প্রতিতর্কের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে উত্তর সব সময় মোটেই সবল নয়। তা হলে এখন এক কথায় বলা যায় যে নানা পরিবর্ত্তনের জন্য যুদ্ধের পরিধিবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে ও অপরিহার্য্য হয়েছে—স্থূল ভাবে পরিবর্ত্তন হিসাবে বলা যায়, নানা যুদ্ধোপকরণের

আবিষ্কার। আচ্ছা তাহলে অতীতের উপকরণের সঙ্গে আজকের উপকরণের তুলনায় এসে পড়া গেল। তুলনা করলে দেখা যাবে :—

প্রাচীন	আধুনিক
১ (ক) গাদাবন্দুক—নিশানার দূরত্ব অল্প	১ (ক) রাইফেল—দূর নিশানা, মেসিন গান
(খ) কামানের গোলা (অবিস্ফোরক ও অল্প নিশানা)	(খ) কামানের গোলা—বিস্ফোরক ও দূর নিশানা।
(২) তরবারি ও বর্শা	(২) বিষাক্ত গ্যাস, বোমা ইত্যাদি।
(৩) পদাতিক ও অশ্বারোহী	(৩) পদাতিক ও ট্যাঙ্ক
(৪) স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনী	(৪) স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, ডুবো-জাহাজ, বিমানবাহিনী।
(৫) দূত।	(৫) টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ও বেতার।
(৬) সৈন্যের দ্বারা অবরোধ।	(৬) অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক অবরোধ।
(৭) পশুচালিত যানবাহন।	(৭) যন্ত্রচালিত যানবাহন।

ওপরের তুলনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে যুদ্ধের বিস্তৃতির মূলে রয়েছে, শিল্পোন্নতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যুদ্ধের যান্ত্রিক পরিণতি।

এতক্ষণ আমরা কি ভাবে বিশ্লেষণ করলাম সেটা নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যেতে পারে :—

১। একটি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগলো।
২। সমস্যাটি হচ্ছে দুই বা ততোধিক বিষয়ের বিরুদ্ধবাদ।
৩। সমস্যাটিকে প্রশ্ন হিসাবে সাজানো হোল।
৪। প্রশ্নটি অর্থপূর্ণ হোল কিনা অর্থাৎ উত্তর দেওয়া যাবে কিনা।
৫। প্রতি-প্রশ্ন করা হল।
৬। উত্তর পাওয়া গেল।
৭। দেখা গেল উত্তরে ত্রুটি হয়েছে।
৮। প্রশ্নটিকে সংস্কার করা হল।

৯। নতুন ভাবে উত্তর পাওয়া গেল।

এই ভাবে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের উদাহরণ নিয়ে আর বেশী এগিয়ে লাভ নেই। তিনটি স্তর মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে, প্রস্তাব বা প্রশ্ন, প্রস্তাব বা প্রশ্নের অর্থ, প্রস্তাব বা প্রশ্নের পরিণতি (প্রাপ্ত তথ্য) :—

প্রস্তাব	প্রস্তাব বা	প্রস্তাব বা
(১) বা	(২) প্রশ্নের	(৩) প্রশ্নের
প্রশ্ন	অর্থ	পরিণতি

বৈজ্ঞানিকরাও এই ভাবে প্রশ্নের মীমাংসা করে থাকেন। যেমন—

বৈজ্ঞানিক	বৈজ্ঞানিক প্রণালীর (Process)	পরীক্ষালব্ধ
(১) সূত্র	(২) নীতি	(৩) তথ্য

বৈজ্ঞানিক প্রথমে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করেন; তারপর তা থেকে তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত কতকগুলি বেছে নিয়ে সূত্র তৈরী করেন; তারপর চলে সেই সূত্রের সত্যতার পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা সূত্রটির আবার সংস্কার করেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক প্রণালী, এবং বৈজ্ঞানিক সূত্র, এই তিনটি হচ্ছে একটি বৃহত্তরের অংশ। চিন্তাধারা ও বিজ্ঞান, দুইই গড়ে মানুষের ইতিহাস। সূত্র, নীতি ও তথ্য (Law, Theory, Data) এই তিনটি দিয়েই তৈরী হয় ইতিহাস এবং একেই বলা হয় জ্ঞান ও কার্য্যের সমন্বয়।

বস্তুর রাসায়নিক যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে অণু-নীতি (Atomic theory)। এই নীতির সাহায্যে এক রুশ বৈজ্ঞানিক তাঁর Periodic law তৈরী করেন। এই সূত্রে তিনি দেখান মূল উপাদানগুলিকে (Elements) অণু ওজনের গুরুত্ব হিসাবে সাতটি সারিতে সাজানো যায়। কিন্তু তাঁর পরের বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন সাতটি সারিতে সাজালে মাঝে কয়েকটি শূন্য স্থান থেকে যাচ্ছে। এইখানে এলো প্রশ্নের দ্বিতীয় স্তর। এই শূন্য স্থানের উপাদানগুলোকে কি আবিষ্কার করা যায়? সত্যই কি সেখানে অজ্ঞাত উপাদান আছে? যদি থাকে তা হলে তাদের ওজন তো উপাদানের নামতা থেকেই কষে নেওয়া যায়। সেগুলো কি মিশ্রিত উপাদান না মূল উপাদান? এই সব প্রশ্ন জাগে এবং তার উত্তরও আগের স্তর থেকে পাওয়া যায়। তার

পর রেডিয়াম্, ইউরেনিয়াম্, পলোনিয়াম্ ইত্যাদি রেডিও এক্টিভ্ উপাদান আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান উঠলো আর এক স্তর ওপরে। সেই স্তরে আবিষ্কৃত হোল রঞ্জন রশ্মি, ইলেকট্রন্, প্রোটন্, ফোটন্ ও নিউট্রন্। স্থাপিত হল কোয়াণ্টাম্ নীতি; বিষয় বিশেষের নাম হোল সাব-ফিজিক্স। এই নীতির মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে ফিজিক্স ও সাব ফিজিক্সের দ্বন্দ্ব। যার থেকে জন্ম হবে পরবর্ত্তী স্তরের।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি ভাবে আমরা উচ্চতর স্তরে যাই। সূত্র, নীতি ও তথ্যের কথায় যদি আমরা ফিরে যাই আমরা দেখতে পাব যে যতক্ষণ পরীক্ষা-প্রমাণিত তথ্যের চাপে পুরানো নীতিকে ত্যাগ করতে বাধ্য না হই, ততক্ষণ আমরা ত্যাগ করি না। আমাদের ঠেলা দেয় নতুন আবিষ্কৃত তথ্যগুলো, তখন দ্বন্দ্ব সুরু হয় পুরাতন ও নতুনের মধ্যে। শেষে মন এই দ্বন্দ্বের অত্যধিক চাপে পুরাতনকে বর্জ্জন ক'রে নতুনকে স্থান দিতে বাধ্য হয়: সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক স্তর এগিয়ে যাই। এই হচ্ছে চিন্তাধারার রহস্য। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে; নির্ভুল কাজ যে সব সময় নির্ভুল চিন্তাধারার দ্বারা পরিচালিত হয় এমন কথা বলা চলে না। ভাবপ্রবণতার দ্বারা চালিত হয়েও লোকে অনেক সময় ঠিক কাজটি করে ফেলে, আবার অনেক চিন্তা করেও, কাজ অনেক সময় ভুল হয়ে যায়।

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

এক রাত্রির প্রেম

নৈশ ভোজনের পর আলোকোজ্জ্বল ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ডেকে তখন যাত্রীর ভিড় নেই। ওরা এসে দাঁড়াল রেলিঙের পাশে। চোখ বুজে পিঠটা গালের উপর রেখে মেয়েটি সশব্দে হেসে উঠল—অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ হাসিতে ঝরে পড়ে যেন। অদ্ভুত এই মেয়েটি—ওর সব কিছুই যেন অপরূপ মাধুর্য্যে ভরা।

"মন আমার মাতাল হয়ে উঠেছে, না হয় আমি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছি," আবেগ বিহ্বলকণ্ঠে মেয়েটি বলে—"তুমি যেন হঠাৎ শূন্য থেকে নেমে এসেছ। মাত্র তিন ঘণ্টা আগেও তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমার অথচ এরই মধ্যে আমার মনটা তুমি জয় করে ফেলেছ। কোন্ জায়গা থেকে তুমি যে জাহাজে উঠলে তাও লক্ষ্য করিনি আমি। সামারা থেকে বুঝি? যেখান থেকেই ওঠো না কেন, তা নিয়ে ভাববার কিছু নেই—তোমার সঙ্গে হঠাৎ যে এই পরিচয় হয়েছে এইটাই আমার পরম লাভ। সত্যি বলছি, আমার মাথাটা ঘুরছে, না হয় ষ্টীমারটাই পাক খাচ্ছে তীরে ভিড়বার জন্যে।"

সামনে দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার—দূরে অন্ধকারের মাঝে একটা চঞ্চল আলো দেখা যায়। অন্ধকারের ভিতর থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে লাগে মুখে, আলোটা এগিয়ে আসে ক্রমশঃ, একটা ছোট ষ্টীমার ক্ষিপ্রগতিতে চলে যায় তাদের পাশ কাটিয়ে। ভল্‌গার তরঙ্গচঞ্চল বুক আলোড়িত করে ওদের ষ্টীমারখানা সামনের বন্দরটার দিকে এগুতে থাকে তির্য্যক গতিতে।

মেয়েটির হাতখানা নিয়ে লেফটেনাণ্ট নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল। ছোট্ট বলিষ্ঠ হাত—সূর্য্যের তাপে রঙটা একটু তামাটে। গভীর তৃপ্তির মধ্যেও লেফটেনাণ্টের মনে কেমন যেন বেদনার সঞ্চার হয়। মনে হয় ওর ঐ হাল্‌কা সূতি পোষাকের নীচে সমস্ত দেহটাই হয়তো প্রখর সূর্য্যতাপে এমনি কঠিন ও তামাটে হয়ে গেছে—পূরা একটা মাস ও অতিবাহিত করেছে দক্ষিণের বালুময় সমুদ্রতটে, আনাপু-র নির্ম্মম সূর্য্য হরণ করেছে ওর ঐ নীলায়িত দেহের সুকোমল লালিত্য। মেয়েটি যেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শে লেফটেনাণ্টের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

"এসো, আমরা নেমে যাই এখানে," অস্ফুটস্বরে লেফটেনাণ্ট বলে।

"কোথায়?" বিস্মিত দৃষ্টিতে মেয়েটি লেফটেনাণ্টের মুখের পানে তাকায়।

"এখানে···এই বন্দরের ঘাটে।"

"কেন?"

লেফটেনাণ্ট চুপ করে থাকে। আবার মেয়েটি গালের উপর হাতের পিঠটা রেখে তেমনি হেসে ওঠে।

"তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি?"

"এসো, আমরা নেমে পড়ি।" লেফটেনাণ্টের কণ্ঠস্বর কেমন যেন বিকৃত, দৃষ্টিটাও অস্বাভাবিক।

"আমি তোমায় অনুরোধ করছি, এসো···"

"বেশ, যা ভাল লাগে করো···আমি বাধা দেব না।" মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

স্বল্পালোকিত ঘাটে যাত্রীর ভিড় নেই। চলন্ত ষ্টীমারখানা ঘাটে এসে ধাক্কা দিতেই ওরা দুজন পরস্পরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে মোটা একটা দড়ি ছুঁড়ে দিলে খালাসীরা, ষ্টীমারটা পিছিয়ে গেল একটু, জলটা আন্দোলিত হয়ে উঠল ভীষণ শব্দে, তারপর সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হল যাত্রীদের জন্য। ···লেফটেনাণ্ট ব্যস্তভাবে ছুটল মালপত্র আনতে।

ঘাটের ছোট্ট নির্জ্জন 'শেড' অতিক্রম করে ওরা এসে বাইরে দাঁড়াল। সামনেই কতকগুলো ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করছে যাত্রীদের জন্য। ওরা নীরবে একখানা গাড়ীতে উঠে ধূলাভরা গদীর ওপর বসে পড়ল। পথটা খাড়া, ধূলা ও বালিতে আচ্ছন্ন, দূরে দূরে ল্যাম্প পোষ্ট, অস্পষ্ট আলোয় একটা স্বপ্নময় আবেশ। ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে গাড়ী, মনে হয় পথ বুঝি অফুরন্ত। অবশেষে খাড়া পথ ছাড়িয়ে ওরা এসে পড়ে সমতল পাকা রাস্তায়। গাড়ীর বেগ এবার যেন একটু বাড়ে—ঘোড়াটা স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটতে থাকে। বড় একটা পার্ক পড়ে সামনে···চতুর্দ্দিকে তার বড় বড় অট্টালিকা, আপিস-বাড়ী বলে মনে হয়; একপাশে একটা গীর্জ্জা, চূড়াটা তার আশপাশের বাড়ীকে ছাড়িয়ে উঠেছে। বাতাসে একটা উষ্ণতার আমেজ' দিনের উত্তাপ তখনও কাটেনি যেন। গাড়ীটা একটা আলোকিত অট্টালিকার

সামনে এসে থামল—খোলা দরজা দিয়ে কাঠের সিঁড়িটা দেখা যায়। হোটেলের একজন চাকর এগিয়ে এল অভ্যাসমত—লাল কোট পরা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মালগুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে ক্লান্ত অবসন্নপদে সে হোটেলের ভিতর ঢুকল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ওরা একখানা বড় ঘরে এসে ঢুকল। ঘরটা বেজায় গরম, রৌদ্রে পুড়েছে সারাদিন, তখনও উত্তাপ কাটেনি। জানলায় শাদা পর্দা টাঙানো, ম্যান্টেলপিসের উপর বড় একখানা আয়না ঝোলানো, দু'পাশে দুটো অব্যবহৃত মোমবাতি। মালপত্র রেখে চাকর প্রস্থান করতেই লেফটেনান্ট নিজেকে আর সামলাতে পারলে না—দুর্দ্দমনীয় আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর; দুজনেই ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হল এক গভীর চুম্বনাবেগে—অপরিমিত আনন্দের বেদনাময় তীব্রতা, কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না যেন—মেয়েটির উষ্ণ বিহ্বল দেহ উত্তেজনায় ঈষৎ কাঁপছে। এ অনুভূতি তাদের দুজনের কাছেই একেবারে নতুন—নিবিড় আশ্লেষে পরস্পরকে ওরা জড়িয়ে ধরে।

পরের দিন সকাল দশটা। সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক, ঘণ্টা বাজছে গীর্জ্জায়, হোটেলের সামনের বাজারে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে, বাতাসে শুকনো ঘাস আলকাতরা ও আরও নানান্ রকমের গন্ধ যা এ অঞ্চলের শহরগুলির বৈশিষ্ট্য।

মেয়েটি বিদায় নিতে এল লেফটেনান্টের কাছে। অদ্ভুত মেয়ে—আত্ম-পরিচয় সে দেয়নি, এমন কি নামটাও বলেনি লেফটেনান্টকে, নিজেকে সন্তর্পণে ঢেকে রেখেছে এক দুর্ভেদ্য রহস্যের মায়াজালে। রাত্রে ওরা ঘুমোয়নি বেশীক্ষণ, কিন্তু মেয়েটি যখন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মুখ হাত ধুয়ে সাজগোজ ক'রে পর্দ্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল তখন ওকে দেখে মনে হল যেন ও উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী—ষোড়শী তন্বীর স্বচ্ছ কোমল লাবণ্য ওর মুখে। রাত্রির ঘটনার জন্য ওকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত মনে হল না। পূর্ব্বের মতই ও সরল স্বচ্ছন্দ ও নির্ব্বিকার।

লেফটেনান্ট প্রস্তাব করে ওরা দুজন একসঙ্গেই রওনা হবে আবার। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলে, "না না, তা হয় না প্রিয়তম। আমি একাই যাব—

পরের ষ্টীমার না আসা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো তুমি। সত্যি বলতে কি, একসঙ্গে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না—ওতে সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে। বিশ্বাস করো প্রিয়তম, আমায় দেখে তোমার যা ধারণা হয়েছে সে ধরণের মেয়ে আমি নই। এখানে যা কিছু ঘটেছে তা আমার জীবনে আর কোনদিন ঘটেনি আর ঘটবেও না ভবিষ্যতে। এ আমার জীবনের একটা আকস্মিক বিপর্য্যয়—মনের একটা সাময়িক উন্মাদনা মাত্র। হঠাৎ একটা দুরন্ত আবেগ এসে আমাকে—আমাকে বলা সঙ্গত হবে না, আমাদের দুজনকেই করেছিল অভিভূত, কিন্তু সে আবেগ স্থায়ী হয়নি বেশীক্ষণ, যেমন এসেছিল হঠাৎ, তেমনি আবার চলে গিয়েছে—রোদে ঘোরাঘুরি করলে হঠাৎ যেমন সর্দ্দিগর্ম্মি হয়, এও কতকটা তাই…"

লেফটেনান্ট ঈষৎ হেসে সায় দিলে তার কথায়। উৎফুল্ল মনেই সে গাড়ীতে এসে উঠল মেয়েটির সঙ্গে—ষ্টীমার ঘাটে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্য। গোলাপী রঙের একখানা ষ্টীমার ঘাটে অপেক্ষা করছে। ষ্টীমার ছাড়তে আর দেরি নেই—ব্যস্তভাবে খালাসীরা ডেকের উপর ছুটাছুটি করছে। ওরা এসে পৌঁছুল ষ্টীমার ঘাটে। লঘু পদক্ষেপে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ডেকের উপর অন্যান্য যাত্রীদের সামনেই লেফটেনান্ট ওকে চুম্বন করলে, ষ্টীমার ছাড়ার সঙ্কেত ধ্বনি হল, লেফটেনান্ট নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে—সিঁড়িটা তখন ঘাটের আশ্রয় ছেড়ে খানিকটা সরে এসেছে।

বেশ স্বচ্ছন্দমনেই সে ফিরে এল হোটেলে। কিন্তু হোটেলে ফিরেই মনে হল যেন কী একটা পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। মেয়েটির সুস্নিগ্ধ স্পর্শ তখনও চারিধারে বিরাজ করছে অথচ ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। চোখের দৃষ্টিটা ব্যাকুল প্রত্যাশায় চতুর্দ্দিকে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।…তখনও বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে মেয়েটির অডিকলোনের সুমিষ্ট গন্ধ, ট্রের উপর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অর্দ্ধেক-খাওয়া তার চায়ের পেয়ালাটা, কিন্তু তার সেই যৌবনদীপ্ত দেহ বল্লরী ঘরের কোথাও নেই—সে বিদায় নিয়েছে চির-দিনের মত! …বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন মোচড় দিয়ে ওঠে, একটা ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস কণ্ঠরোধ করে, লেফটেনান্ট নিজেকে সংযত করবার জন্যে তাড়াতাড়ি

পাইপটা ধরিয়ে নেয়, তারপর ছড়ির মাথাটা সজোরে বুটের উপর ঠুকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

"অদ্ভুত ব্যাপার!" হাসতে হাসতে আপন মনে সে বলে, যদিও বুঝতে পারে চোখের কোণে জল জমে উঠেছে—"বিশ্বাস করো প্রিয়তম, আমায় দেখে তোমার যা ধারণা হয়েছে সেধরণের মেয়ে আমি নই।...অদ্ভুত মেয়ে!"

মশারীর পর্দ্দা একপাশে সরানো, গত রাত্রির শয্যা তেমনিই পড়ে রয়েছে। লেফটেনান্টের মনে হল যে ঐ শয্যার দিকে তাকাবার সাহস নেই তার। মশারীটা শয্যার চারিপাশে ভাল ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে সে জানলা বন্ধ করে দিলে—বাজারের কলরব ও গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ একান্ত দুঃসহ। বাতাসে জানলার শাদা পর্দ্দাগুলো উপর দিকে উঠে গিয়েছে; সে টেনে যথাস্থানে নামিয়ে দিলে। তারপর সোফায় এসে বসল পরম নিশ্চিন্ত হয়ে।...এক রাত্রির রোমান্স—পথের মাঝে হঠাৎ হল মিলন আবার পথের মাঝেই বিদায়! দূরে, বহুদূরে চলে গেছে সে—যেখানে তার প্রেমের গুঞ্জন, অন্তরের আকুল আহ্বান পৌঁছুতে পারবে না। কাচঢাকা শাদা রঙের কেবিনের মধ্যে বসে, নয়তো ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সে হয়তো এখন উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সুদূর প্রসারী রৌদ্রোজ্জ্বল নদীবক্ষের দিকে—পালতোলা নৌকোগুলো সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে তর্ তর্ ক'রে, দূরে সূর্য্যকিরণে চিক্ চিক্ করে হরিদ্রাভ বালুচর!...বিদায়—চিরদিনের জন্য, অনন্তকালের জন্য বিদায়! মিলনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই—পথের পরিচয় পথের ধূলার মাঝেই লীন হয়ে গেছে!...মনে মনে সে বলে, "যেখানে ও স্নেহশীল স্বামী আর তিন বছরের মেয়েটিকে নিয়ে সযত্নে নীড় রচনা করেছে, যেখানে ওর প্রাত্যহিক জীবনের দিনগুলি কাটে পরম নিশ্চিন্তে, সেখানে আমার প্রবেশাধিকার নেই—সেই শহরে যাওয়া কোনদিনই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।" যতই সে এ বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ততই তার মনে হয় যেন ঐ শহরটা একটা ভয়াবহ স্থান যার চতুঃসীমার মধ্যে পদার্পণ তার পক্ষে নিষিদ্ধ!...সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও মনে জাগে, হয়তো ও তাকে ভুলতে পারবে না, ওর নিঃসঙ্গ জীবনের মাঝে তাকে ওর মনে পড়বে প্রায়ই, মনে পড়বে এই ক্ষণিক মিলনের কথা, ব্যথায় বেদনায়

দুলে উঠবে ওর বুক অথচ সে ওকে শোনাতে পারবে না একটিও সান্ত্বনার বাণী। বেদনায় বুকটা ভারী হয়ে ওঠে, অপরিসীম নৈরাশ্যে মনটা ভেঙে পড়ে যেন। পরক্ষণে আবার সে সজাগ হয়ে ওঠে—মনকে শাসন করে, "না না, এ হতে পারে না। এ একান্ত অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য।" কিন্তু মনকে কিছুতেই শক্ত করতে পারে না, নিদারুণ অবসাদে মনটা নিস্তেজ হয়ে আসে, কেবলই মনে হয় যেন বেঁচে থাকার আর কোন অর্থই হয় না, জীবনের যা কিছু আনন্দ ও উৎসাহ সবই বিদায় নিয়েছে চিরদিনের মত।

"কী সব আজগুবি চিন্তা পেয়ে বসেছে আমায়!" বিরক্তভাবে সোফা থেকে উঠে পড়ে আবার সে পায়চারি করতে থাকে। খুব সতর্কভাবে পায়চারি করে সে, চোখটা কিছুতেই যেন শয্যার দিকে না পড়ে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মেয়েটির কথা মন থেকে তাড়ানো যায় না—তার উচ্ছল হাসি, তার সকৌতুক দৃষ্টি বার বার ভেসে ওঠে চোখের সামনে।..."এ আমার হল কী? বার বার ওর কথা মনে হয় কেন? কী এমন অসাধারণত্ব আছে ওর মধ্যে আর ব্যাপারটাই বা কী এমন ঘোরালো? বাস্তবিক ও যা বলেছে তা ঠিকই—আমাদের ঐ উন্মাদনা সন্দিগর্ম্মিরই মত—হঠাৎ একটা উগ্র আবেগে আমাদের মনে সাময়িক বিপর্য্যয় ঘটেছিল মাত্র—ওটাকে প্রেমের অভিব্যক্তি মনে করা ভুল।....কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে, সারাটা দিন এই নির্ব্বান্ধব শহরে একা একা কাটাবো কি করে?"

মেয়েটিকে কিছুতেই ভোলা যায় না যেন, ওর সব কিছু বৈশিষ্ট্য অপরূপ মাধুর্য্যে চোখের সামনে ফুটে ওঠে, ওর গায়ের তামাটে রঙ, সূক্ষ্ম সুতির পোষাক, সুপুষ্ট সবল দেহ, ওর সজীব আনন্দোচ্ছল কণ্ঠস্বর। ওর সুকুমার দেহের তপ্ত মদির স্পর্শ তখনও তার রক্তে নেশার আমেজ জাগিয়ে রেখেছে, এক অপূর্ব্ব শিহরণে সারা দেহ বারবার কণ্টকিত হয়ে ওঠে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে একটা দুর্ব্বোধ্য রহস্যময় বেদনার অনুভূতি তার চেতনার মাঝে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে সে বলে, "এ ব্যাপারটা যে কারও কাছে প্রকাশ করা যাবে না এইটাই হচ্ছে সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক কষ্ট। এ বেদনা আমায় লুকিয়ে রাখতে হবে সন্তর্পণে—যাতে কেউ টের না পায় কোনদিন। কিন্তু এখানে

এই বৈচিত্র্যহীন ক্ষুদ্র শহরে স্মৃতির এই দুঃসহ পীড়ন সহ্য করে এই দীর্ঘ দিনটা কাটাই কি করে ?"

লেফটেনান্ট অস্থিরভাবে পদচারণা করে। এ যাতনা আর সহ্য হয় না যেন···মুক্তির একটা কিছু উপায় উদ্ভাবন করতে হবে···কাজ, একটা কিছু কাজ তার দরকার···কাজে ডুবিয়ে রাখতে হবে মনকে...এখানে চুপচাপ বসে আর সে স্মৃতির রোমন্থন করবে না···যেখানে হোক, সে বেরিয়ে পড়বে এখনই। টুপিটা মাথায় দিয়ে, লেফটেনান্ট পরম উৎসাহে ফাঁকা বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে চলল ফটকের দিকে। হঠাৎ কি ভেবে গতিটা শ্লথ হয়ে এল তার। কোথায় চলেছে সে—গন্তব্য তার কোথায় ? দ্বিধাগ্রস্ত-চিত্তে এদিক ওদিক সে তাকায়। ফটকের সামনেই একটা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে—চটকদার কোট-গায়ে গাড়োয়ান ছোট একটা সিগার টানছে নিশ্চিন্ত মনে, দেখে মনে হয় যেন অপেক্ষা করছে কা'রো জন্যে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে লেফটেনান্ট তাকায় তার দিকে। কোচবাক্সের উপর স্থিরভাবে বসে মানুষ যে অমন নিশ্চিন্ত ভাবে সিগার টানতে পারে এ যেন তার ধারণার বাইরে। "সমস্ত সহরের মধ্যে আমিই কেবল অসুখী—আর সবাই পরম নিশ্চিন্তে দিন যাপন করছে", একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভেতর থেকে, তারপর সে চলতে সুরু করে বাজারের দিকে।

বেচাকেনা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ব্যাপারীরা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত। দু পাশে মাল-বোঝাই গাড়ী, অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে এক সময় সে পা দিয়ে ফেললে খানিকটা তাজা গোবরের উপর। একদিকে জন কয়েক স্ত্রীলোক বসে আছে রকমারি তৈজসপত্র নিয়ে, লেফটেনান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তারা নিজের নিজের পাত্র হাতে করে তুলে ধরে চেঁচামেচি সুরু করলে আবার চাষীরাও তাকে শাঁসালো খরিদ্দার মনে করে চীৎকার করতে লাগল, "এদিকে একবার আসুন, হুজুর—চমৎকার শসা, খেলে আর ভুলতে পারবেন না।" সকলের সমবেত কোলাহলে অস্থির হয়ে সে ছুটে পালাল সেখান থেকে—এ সমস্ত তার কাছে নিতান্ত অর্থহীন ও বিরক্তি-কর। বাজার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তায় অগণ্য লোকের ভীড়—যে যার কাজে চলেছে। খানিকটা চলার পর সামনেই পড়ে গীর্জ্জা,

কি ভেবে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। অর্গ্যানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গায়করা গাইছে উদাত্তকণ্ঠে, গানের সুরে ঝরে পড়ে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ, শ্রোতারা শোনে মন্ত্রমুগ্ধের মত। সবারই জীবনে আছে একটা লক্ষ্য, আছে গতি, নেই শুধু তার। গীর্জ্জা থেকে বেরিয়ে আবার সে চলতে সুরু করে। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর তাপে পথ ঝল্‌সে যাচ্ছে, দূরের গাছপালা ধুঁকছে অবসন্নের মত। সেই রৌদ্রের মাঝেই সে চলেছে লক্ষ্যহীনভাবে। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা বাগান। যত্নের অভাবে বাগানটা হতশ্রী, আগাছায় ভরে গেছে চারিধার। শ্রান্তভাবে সে তারই মধ্যে ঢুকল। বাগান থেকে ভল্‌গার প্রশস্ত বুক দেখা যায়। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসে। মনে পড়ে, ঐ নদীর বুকে তরঙ্গ তুলে সেই গোলাপী রঙের ষ্টীমারখানা একটু আগেই চলে গিয়েছে তার প্রিয়তমাকে নিয়ে। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভিতর থেকে। মধ্যাহ্নে খর রৌদ্রে তার শাদা সামরিক পোষাকের বোতাম আর কাঁধের ষ্ট্র্যাপ এমনি তেতে উঠেছে যে স্পর্শ করা যায় না। টুপির ভিতরকার ব্যাণ্ডটা ঘামে ভিজে গেছে, উত্তাপে মুখ চোখ রক্তবর্ণ।

হোটেলে ফিরে সুবৃহৎ নির্জ্জন ডাইনিং রুমের আশ্রয়ে সে বেশ আরাম বোধ করলে। টুপিটা খুলে সে একটা খোলা জানলার সামনে ছোট একটা টেবিলের ধারে এসে বসল। জানলা দিয়ে তপ্ত বাতাসের হল্‌কা এসে লাগে—বাতাসে শীতলতা নেই বটে, তবু তার স্পর্শে দেহের ক্লান্তি একটু যেন কমে। হোটেলের চাকরকে ডেকে সে হুকুম করলে এক পাত্র শাকসব্জীর স্যুপ দিয়ে যেতে—বরফে ঠাণ্ডা করা স্যুপ—ক্লান্তির উপশম হবে।···সব কিছুর মধ্যেই একটা আনন্দ ও উৎসাহের আভাস, একটা অপরিমেয় আনন্দ, এমন কি এই দুঃসহ উত্তাপ ও বাজারের বিচিত্র গন্ধের মধ্যেও আনন্দের একটা অপূর্ব্ব রেশ যেন প্রচ্ছন্ন, সহরের সর্ব্বত্র—এই বৈচিত্র্যহীন পুরানো হোটেলেও প্রসন্নতার একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি বর্ত্তমান···আর চারিপাশে এই আনন্দ ও সজীবতার মধ্যে শুধু তারই হৃদয় দুঃসহ বেদনায় মুহ্যমান। কয়েক গ্লাস ভড্‌কা সে পান করলে—মনটা কিছুতেই শান্ত হতে চায় না, একটা সুতীব্র বেদনা মনটাকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে। মনে মনে সে ভাবে, দৈবাৎ যদি সে আবার ঐ

অপরিচিতা তরুণীকে ফিরে পায় আর শুধু আজকের দিনটি কাটাতে পারে তার সঙ্গে, তবে কালই সে স্বচ্ছন্দে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত—শুধু এই কথাটা সে ওকে বলবে, নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দেবে যে, সে ওকে ভালবাসে তার সমগ্র অন্তর দিয়ে, ওর অভাবে সংসারের সব কিছু সুখ ও আনন্দ তার কাছে নিরর্থক। কিন্তু কেন—কেন ওকথাটা ওর কাছে প্রমাণ করবার জন্য তার এ ব্যগ্রতা? কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ওতে? এ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পায় না, অথচ এটাও তার মনে হয়, ওকথা ওকে জানানো একান্ত প্রয়োজন—জীবনের সকল প্রয়োজনই ওর কাছে একান্ত তুচ্ছ।

"না, এ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—মনটাকে সংযত করতে হবে।" আরেক গ্লাস ভড্‌কা ঢেলে নিয়ে সে চুমুক দিতে সুরু করলে।

ছোট ডিক্যাণ্টারটা নিঃশেষ করে ফেললে সে, ভাবলে নেশার ঘোরে সে ভুলে যাবে সব কিছু, তার ব্যর্থ প্রেমের এই বেদনাময় অনুভূতি তাকে আর অস্থির করে তুলবে না। কিন্তু কৈ, বেদনার উপশম তো হয় না, ক্রমশই যেন তার তীব্রতা বেড়ে চলেছে—একটা নিদারুণ অসহায়তায় মনটা তার বিকল হয়ে আসে।

সুপের পাত্রটা একপাশে ঠেলে রেখে সে হুকুম করলে এক কাপ কফি এনে দেবার জন্য। কফি হাজির হল টেবিলে। একটা সিগার ধরিয়ে নিয়ে লেফটেনাণ্ট ভাবতে লাগল কি করে সে এই দুর্নিবার প্রণয়ের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবে—এ যেন তার সমস্ত অন্তরকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলছে।

ভেবে কোন উপায় স্থির করা যায় না—বরং যতই ভাবা যায় ততই ব্যাকুলতা বাড়ে। সে বেশ বুঝতে পারে মুক্তি তার অসম্ভব। হঠাৎ টুপি ও ছড়িটা তুলে নিয়ে ব্যস্তভাবে সে উঠে দাঁড়াল, চাকরকে ডেকে জেনে নিলে পোষ্ট অফিসের পথটা, তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে সেইদিকে চলতে সুরু করল। মনে মনে সে সঙ্কল্প করেছে মেয়েটিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে, টেলিগ্রামের ভাষাটা কি হবে তারও একটা মক্‌সো করেছে মনে মনে; "এ জীবন এখন সম্পূর্ণ তোমারই, তোমারই থাকবে আমরণ, যা তোমার অভিরুচি তাই তুমি করতে পারো এ জীবন নিয়ে।"...পোষ্ট অফিসে পৌঁছে সে থমকে

দাঁড়াল হঠাৎ—যে শহরে মেয়েটি থাকে তা সে জানে; ওর যে স্বামী ও তিন বছরের একটি মেয়ে আছে তাও সে জানে, কিন্তু ওর নাম বা পদবী কোনটাই জানে না! গত রাত্রিতে বার কয়েক সে ওকে নাম জিজ্ঞাসা করেছিল কথাবার্ত্তার ফাঁকে, কিন্তু প্রতিবারই ও সহাস্যে জবাব দিয়েছে, "আমার নাম জেনে কি হবে তোমার? আমার নাম মেরিয়া গ্রীন্, ফেয়ারিল্যাণ্ড কুইন্...ও নাম যদি পছন্দ না হয় তবে শুধু অপরিচিতা সুন্দরী বলে ডেকো আমায়... কেমন, তোমার তো আপত্তি নেই তাতে?"

পোষ্ট অফিসের নিকটেই রাস্তার এক কোণে একটা ফটোগ্রাফের দোকান। দোকানের সামনে একটা শো কেস্ টাঙানো। এক দৃষ্টে সে একখানা ফটো দেখতে থাকে—এক মিলিটারি অফিসারের ফটো—ঈষৎ উন্নত কপালের নীচে দুটো জ্বল্‌জ্বলে চোখ, সুপুষ্ট জম্‌কালো গোঁফ, প্রশস্ত বুক, সর্ব্বাঙ্গে রকমারি তক্‌মা।...মনে মনে হাসি পেল তার—কী দুর্ব্বল মানুষের মন! পরিচ্ছদের আড়ম্বরে দুনিয়াকে তুচ্ছ করে সে! কী আছে ও সবের মধ্যে যার জন্যে সে গর্ব্ব অনুভব করে? সমৃদ্ধি ও সম্মানের জন্য মানুষের এ ব্যাকুলতা কেন? অন্তরের সুখশান্তির সঙ্গে ওর সম্পর্ক কতটুকু?...নব বিবাহিত এক দম্পতীর ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করে সে—লম্বা ফ্রক কোট ও শাদা নেকটাই পরা এক যুবক, চুল ছোট করে ছাঁটা, পাশে ওড়নাবৃতা এক তরুণী...কিন্তু সেদিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারে না সে, চট করে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নেয় অন্য একটা ছবির দিকে—এ ছবিটি উৎসাহ দীপ্তা এক সুদর্শনা কিশোরীর, মাথায় টুপি, ছাত্রী বলেই মনে হয়, এক পাশে কাৎ হয়ে বসে মধুর হাস্যে দর্শককে অভিবাদন করছে যেন।... তারপর হঠাৎ সে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় পথের দিকে—শো কেসের দিকে আর চাইতে পারে না—ঐ সব অপরিচিত সুখী নরনারীর প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জাগে মনে। বেশ আছে ওরা—আবর্ত্তহীন স্বচ্ছন্দ জীবন—দুঃখের ধার ধারে না একেবারে!

"কোথায় যাই? কি করি?" বার বার এ প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগে, কিন্তু সমাধানের পথ সে খুঁজে পায় না।

পথ জনশূন্য। দু'পাশের বাড়ীগুলি একই ছাঁদে গড়া, শাদা রং, দোতলা, বিশেষ কোন পারিপাট্য নেই, সামনে খানিকটা বাগান, চারিদিক এমন নিস্তব্ধ

যে কোথাও মানুষ আছে বলে মনে হয় না। ফুটপাথের উপর ধূলা আর বালির পুরু আস্তরণ, মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে চিক্ চিক্ করছে—সব কিছুই উজ্জ্বল প্রাণময় সূর্য্যালোকে স্নাত, সর্ব্বত্রই আনন্দের দীপ্তি। দূরে পথের ধূসর রেখা দেখা যায়, নির্ম্মেঘ নীল আকাশের গায়ে পথের রেখাটি স্পষ্ট। দক্ষিণের শহরে যেমনটা দেখা যায় এও কতকটা তাই—মনে পড়ে যায় সেবাস্তোপোল, কার্চ···আনাপু-র কথা। শেষোক্ত শহরটির নাম মনে পড়তেই সে কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। মাথা নীচু করে টলতে টলতে সে ফিরে চলে হোটেলের দিকে।

শ্রান্তদেহে সে ফিরে এল হোটেলে—দেহ এমনি ক্লান্ত ও অবসন্ন যে মনে হয় যেন সে এইমাত্র তুর্কীস্থান বা সাহারা থেকে ঘুরে আসছে। শেষে শক্তিটুকু সংগ্রহ করে সে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরের মধ্যে। নির্জ্জন ঘর খাঁ খাঁ করছে। ঘরটা ইতিমধ্যে পরিষ্কার করা হয়েছে, মেয়েটির সমস্ত চিহ্ন অপসারিত—শুধু মাথার একটা পিন রয়েছে বিছানার পাশে ছোট একটা টেবিলের উপর—যা সে যাবার সময় ভুলে ফেলে গেছে। কোটটা খুলে রেখে সে আয়নার দিকে তাকায়। মুখের চেহারায় কেমন একটা বীভৎসতা, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। ধূলাভরা বুটশুদ্ধ পা দুটো পাদানির উপর রেখে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। খোলা জানলা দিয়ে গরম হাওয়া বইছে আর ঐ হাওয়ায় ভেসে আসছে রৌদ্রদগ্ধ পথের রকমারি গন্ধ। হাত দুটো মাথার নীচে রেখে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শূন্যপানে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুদূর দক্ষিণের এক স্বপ্নময় ছবি—স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে ছোট্ট শহরটি, সমুদ্র তরঙ্গের অবিরাম দাপাদাপি, দূরে দিগন্তলীন বনানীর ধূসর ছায়া। মেয়েটি এতক্ষণে আনাপুতে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই, এতক্ষণে সে হয়তো নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে তার চিরপরিচিত আবেষ্টনীর মাঝে, ভুলে গেছে তার ক্ষণিক উন্মাদনার কথা। ভাবতে ভাবতে সে তন্ময় হয়ে যায়—মনে হয় ঐ ক্ষুদ্র শহরটি এজগতের সীমানার বাইরে—ও যেন কল্পলোকের মায়াপুরী—ওর প্রবেশ পথ পৃথিবীর মানুষের কাছে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ। আত্মহত্যার কল্পনা মনের মধ্যে উঁকি মারে—আত্মহত্যা ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ সে খুঁজে পায় না। চোখ বুজে নির্জ্জীবের মত শুয়ে থাকে সে—কয়েক ফোঁটা

তপ্ত অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে—তারপর একসময় চোখে তন্দ্রা আসে নেমে, সে ঘুমিয়ে পড়ে।···ঘুম ভেঙে যখন সে চোখ মেলে তাকাল তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে—সূর্য্য নেমে গেছে পশ্চিম দিগন্তে।··· বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, ঘরের ভেতর বিশ্রী একটা গুমোট। জানালার দিকে চেয়ে লেফটেনান্ট চুপ করে শুয়ে থাকে—মনে পড়ে গতরাত্রির কথা, সেদিনের প্রভাতের কথা—কিন্তু উত্তেজনা যেন স্তিমিত হয়ে গেছে, দারুণ একটা অবসাদ মনে—মনে হয় যেন ঐ ব্যাপার সাম্প্রতিক নয়, ঘটে গেছে বহুকাল আগে। আস্তে আস্তে সে উঠে বসলো, তারপর শয্যা থেকে নেমে মুখ হাত ধুয়ে নিলে। গরমটা অসহ্য মনে হয়—জানালার পর্দ্দাটা এক-পাশে সরিয়ে দিলে। মিনিট কয়েক চুপচাপ বসে থেকে সে ঘণ্টার আওয়াজ করলে, সঙ্গে-সঙ্গে চাকর এসে হাজির হল। হুকুম করলে চা আনতে আর সেই সঙ্গে হোটেলের বিল। লেবুর রস মিশানো চা একটু একটু করে সে পান করলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হুকুম করলে গাড়ী আনবার জন্য। গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়াতেই চাকর মালপত্র উঠিয়ে দিলে গাড়ীতে। রঙচটা লাল্‌চে গদীর উপর বসে সে পাঁচ রুবল্‌এর একখানা নোট গুঁজে দিলে চাকরের হাতে। স্মিতমুখে অভিবাদন করে বিদায় নিল চাকর।

"কাল রাত্রে আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে গেছি এখানে—হুজুর হয়তো চিনতে পারছেন আমাকে,"—গাড়োয়ান বললে একমুখ হেসে।

ঘাটে যখন উপস্থিত হল তারা, তখন সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে আসছে ভল্‌গার বুকে—নদীর জলে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লাল আলো ফিকে হয়ে আসছে। ষ্টীমার এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে—চলন্ত ষ্টীমারের মাস্তুলে গোধূলির রক্তরেখা।

"ঠিক সময়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়েছি, হুজুর," গাড়োয়ান লেফটেনান্টের অনুগ্রহ আকর্ষণের চেষ্টা করে। লেফটেনান্ট তাকেও পাঁচ রুবল্ বখশিস্ করলে, তারপর টিকিট হাতে করে এগিয়ে চলে জেটির দিকে। গতরাত্রির মত তরঙ্গের ছল্ ছল্ শব্দ কানে আসে, তরঙ্গের আঘাতে পায়ের তলাকার লৌহ পাটাতনটা ঈষৎ দুলে ওঠে, পরক্ষণেই শূন্যে নিক্ষিপ্ত মোটা দড়ির একটা প্রান্ত ছিটকে আসে ঘাটে, জেটির গায়ে ধাক্কা দিয়ে ষ্টীমারটা যায় পিছিয়ে, তার ঘূর্ণ্যমান চাকার নীচে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে প্রচণ্ড গর্জ্জনে।... বৈদ্যুতিক আলোয় শোভিত যাত্রীপূর্ণ ষ্টীমারটা অপেক্ষা করে ঘাটে, সদ্যপ্রস্তুত নানাবিধ সুখাদ্যের লোভনীয় গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ষ্টীমারের রন্ধনশালা থেকে—মনে হয় যেন সে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে অপেক্ষমান জনমণ্ডলীকে।

এক মিনিট পরেই ষ্টীমার আবার চলতে সুরু করল। সেইদিকেই সে চলেছে যেদিকে সে রেখে এসেছে সেই রহস্যময়ী সুন্দরীকে—সেদিন প্রভাতে।

সম্মুখে সূর্য্যাস্তের সম্মোহন দীপ্তি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, নদীর বুকে ঘনায়মান অন্ধকারের ছায়া।

ডেকে চেয়ারের উপর বসে লেফটেনান্ট সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে—পাণ্ডুর মুখ, ক্লান্ত নিষ্প্রভ দৃষ্টি, বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে যেন। *

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

* বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক ইভান বুনিন হইতে।

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইতিপূর্ব্বে ইহাই অনুমিত হইয়াছে যে সমাজ যত সামন্ততান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহণ করিতে লাগিল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও শ্রমজনক কাজ বা হীন পেষার কর্ম্ম তত ঘৃণ্য হইতে লাগিল এবং সেই পেষাগত লোকসমূহ ততই সামাজিক স্তরে অবনমিত হইতে লাগিল। উচ্চকর্ম্মের Mana উচ্চ, তাহার Taboo (আচার) উচ্চ, নীচ লোকের সংস্পর্শ তাহার পক্ষে আপত্তিকর, তাহার উচ্চ 'মানা' দ্বারা নীচ লোক উপকৃত ও পবিত্র হইবে (১); কিন্তু তদ্বিপরীতটি উচ্চমানার লোকের পক্ষে ক্ষতিজনক। এইজন্য পলিনেসীয় অভিজাতদের ন্যায় দ্বিজের স্পর্শ শূদ্রের পক্ষে পবিত্রকর, কিন্তু বিপরীত হইলে পূর্ব্বোক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আবার দ্বিজদিগের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে উচ্চবর্ণের লোকের মানা উচ্চ তজ্জন্য সে নিম্নবর্ণের লোক অপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র। এই বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়া স্মৃতিসমূহে আইনের ব্যবস্থা হইয়াছে, প্রাচীন বৈর-দেয় হইতে শেষের যুগ পর্য্যন্ত হিন্দুর আইন এই ভিত্তিতেই সংস্থাপিত।

জাতিগত এইসব বিধি-নিষেধ ও অনুশাসন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে একটা জাতির (caste) সামাজিক মর্য্যাদা তাহার জাতিগত পেষার

১। এই বিশ্বাস ইউরোপে সেদিন পর্য্যন্তও ছিল। ইংলণ্ডের রাজার স্পর্শে লোকের Scrofula ব্যারাম ভাল হইত বলিয়া বিশ্বাস ছিল : Boswell's Life of Johnson—Vol. I.

উপর নির্ভর করিত। পেষা যদি উচ্চ, অর্থাৎ তথাকথিত ভদ্রজনোচিত হয় তাহা হইলে সেই পেষার লোকের 'মানা' ও তজ্জন্য তাহার তাবু সমূহও উচ্চ। ইহার অর্থ, তাহার সহিত সংস্পর্শে উচ্চ মানা-বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের ক্ষতি হয় না। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রাম এই শ্রেণীর উচ্চতা (শ্রেষ্ঠত্ব) ও নীচত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে। শ্রেণী-সংঘর্ষের দ্বারা নিজের পদ উন্নত করিয়া তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত উচ্চ 'তাবু'র কথা সৃষ্ট হয়। ফলে দেখা যায়, শ্রেণীগত বনিয়াদী-স্বার্থ নিজের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উচ্চ মানা ও উচ্চ তাবু প্রভৃতির বিধি-নিষেধ দ্বারা নিজেকে ঘিরিয়া রাখে। এইগুলিকেই হিন্দু সনাতনী ব্যবস্থায় "আচার" বলা হয়। ইহা শ্রেণী-স্বার্থের প্রতীক। এইজন্য বর্ত্তমানের caste গুলির উৎপত্তির মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে কেবল অর্থনীতিক ভিত্তির আবিষ্কারই পর্য্যাপ্ত নহে, এতৎসঙ্গে শ্রেণী-সংঘর্ষ ও তৎসহ বিজড়িত 'মানা' ও 'তাবু' সমূহের প্রভাব আবিষ্কার করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রাচীন আর্য্যদের সমাজে যে বর্ণ-বিভাগ ছিল, সেইগুলি class-division ছিল। তখন সমাজ সমান্তরালভাবে (horizontal) বিভক্ত ছিল। তৎপর বিভিন্ন পেশা অবলম্বনপূর্ব্বক লোকে সংঘবদ্ধ হইয়া শ্রেণীসমূহ (guilds) স্থাপিত করে (সংস্কৃত সাহিত্য ও খোদিতলিপিতে 'গিল্ড'কেই 'শ্রেণী' বলা হইয়াছে)। বোধ হয়, প্রাচীন কৌমগত 'তাবু' (Taboo) সমূহের বিশ্বাস (যাহা লোক মধ্যে চিরকাল বিরাজ করিত) দ্বারা শ্রেণীগত লোকের পদ-মর্য্যাদা সমাজে নিরূপিত হইতে থাকে। পেষাগত লোকের 'মানা' ও তাবু যেমন উচ্চ, সেই শ্রেণীই সমাজে সেই প্রকারের মর্য্যাদা পাইতে থাকে। ইহার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক যুগের মনস্তত্ত্ব ও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্যই সামন্ততান্ত্রিক যুগের ইউরোপ ও ইরাণের ন্যায় কারিকরেরা ব্যবসায়ী অপেক্ষা নীচ, আবার ব্যবসায়ীরা ভূস্বামীদের অপেক্ষা নীচ; পুনঃ তাহারা ভগবানের প্রতিনিধি পুরোহিত অপেক্ষা নীচ পদ ও মর্য্যাদা সমাজে পাইতে থাকে। অন্যপক্ষে যে অতি নিম্ন-পেষা অবলম্বন করিল সে একেবারেই সর্ব্ব নিম্নে চলিয়া গেল—যথা, ডোম, পক্কস, চণ্ডাল, নিষাধ প্রভৃতি। এই উপায়েই ইতিহাসে একটি শ্রেণীর বিভিন্নযুগে বিভিন্ন সামাজিক মর্য্যাদার অর্থ বাহির করিতে পারা যায়। পেষাগত শ্রেণীর মর্য্যাদা স্থাপন শ্রেণী-সংঘর্ষেরই (class-conflict) ফলস্বরূপ, কারণ তাবুতে 'শ্রেণী-লক্ষণ' বিরাজ করে। শেষে এই শ্রেণী সমূহের পেষা বংশগত হয় এবং একই পেষা দ্বারা একটী গণ্ডীভূত সমাজ সংগঠিত হওয়ায়, আর এই গণ্ডী মধ্যেই আহার ও বিহারাদি (connubium ও commesality) নির্দ্ধারিত হওয়ায় তাহা একটা caste-এ পরিণত হয়।

এই সময় হইতে ইহার ফলে হিন্দুসমাজ পুনরায় লম্বভাবে বিভক্ত (vertical division) হয়। এতদ্বারা হিন্দুসমাজ শতধা-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। প্রত্যেক জাতিরই পৃথক সমাজ (society) হয় এবং প্রত্যেক সমাজেরই আচার ও ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য বা কথঞ্চিৎ পার্থক্য উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক জাতির সামাজিক মর্য্যাদানুযায়ী তাহার পুরোহিতেরও সামাজিক পদমর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে পুরোহিত অপেক্ষা যজমানের পদ উচ্চ। এই প্রকারে বোঝা যায়, ব্রাহ্মণ হইয়াও কেন অসৎ শূদ্র বা অন্ত্যজের পৌরহিত্য করিলে সেই ব্রাহ্মণ 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' রূপে উচ্চ জাতিদের কাছে বর্জ্জনীয় হয়। এই প্রকারে প্রত্যেক জাতিই একটা স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রে (commonwealth) পরিণত হয়। ফলস্বরূপ বিভিন্ন লোক সমাজের একটি সমষ্টি বা সমবায়রূপে (congeries of communities) পরিণত হয়।

কিন্তু এতদ্বারা সমান্তরাল্ বিভাগ বিনষ্ট হয় নাই। একটা জাতি (caste) যেমন অন্য জাতি হইতে vertical বিভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে horizontal বিভাগ তাহাকে বিত্তশালী ও বিত্তহীন বর্গ (class) দ্বারা বিভক্ত করে।

হিন্দুর জাতিভেদের (class-division) মোটামুটি এই তথ্যটি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া যায়। Race Theory অর্থাৎ মূলজাতির বিভিন্নতা ও তাহাদের সংমিশ্রণে "জাতিভেদ" সৃষ্ট অথবা Divine ordination, অর্থাৎ ভগবানের সৃষ্ট (পুরুষ সূক্তের কাহিনী) মত দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান হয় না। সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের চাবিকাটি দ্বারা এই তথ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে হইবে।

জার্ম্মানীর বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, পুঁজিবাদ (capitalism) জাতিগত তাবু (caste taboo) অসম্ভব করিয়া তোলে নাই অর্থাৎ পুঁজিবাদ দ্বারা এইগুলি ধ্বংস হয় নাই, জাতিভেদ ব্যবস্থার spirit কর্ম্মগত বৈশিষ্ট্যের (work specialisation) দিকে ক্রমাগত ঝুঁকিতে থাকে। জাতিভেদ ব্যবস্থা দ্বারা বিভিন্ন পেশাগত কর্ম্ম ধর্ম্মের রূপ ধারণ করে। এইজন্যই তিনি বলেন, ভারতের চোর জাতির বৃত্তিতেও একটা নির্দ্দিষ্ট দেবতা আছে (ইহা তিনি পুরাতন সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে পাইয়াছেন)। তিনি জাতিভেদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জন্ম বিশ্বাসের প্রভাব দেখিতে পান। তিনি বলেন, এতদ্বারা নিজের জাতিগত পেশার মধ্যে থাকা সম্ভবপর হয়; কারণ নিজের জাতি হইতে বাহির হইলে বা উচ্চজাতির মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে.....নীচ ও নিকৃষ্ট পরজন্ম প্রাপ্ত হয়। এইজন্য প্রত্যেক লোককে

পরজন্মে ভাল ও উত্তম ব্যবস্থা পাইবার জন্য স্বীয় জাতিগত কর্ম্মে দৃঢ় থাকিতে হয়। এইস্থলেও তাঁহার সংবাদ ঠিক নহে। তিনি আরও বলেন, অনুসন্ধানে দৃষ্ট হইয়াছে যে সর্ব্বনিম্ন জাতিগুলি উচ্চ ও ভাল পুনর্জন্ম-ব্যবস্থা পাইবার ইচ্ছা ও আশায় নিজেদের জাতিতে এবং কর্ম্মে দৃঢ় ও আস্থাবান থাকে। এই সমাজব্যবস্থা "সমাজ-বিপ্লব" বা সংস্কার দ্বারা পরিবর্ত্তন চায় না। মার্টিন লুথারের অনুজ্ঞাও—"তোমার পেশায় দৃঢ় থাক," এই কারণে ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কর্ত্তব্য মধ্যে পরিণত হয় (২)। তিনি আরও বলেন, জাতি (caste) সামাজিক পদ সমূহের (stands) বিভিন্নতা রক্ষার জন্য রীতিগত (conventional), আইনগত (legal) এবং ধর্ম্মের ক্রিয়াগত (ritual) গ্যারান্টি (guarantee) স্বরূপ কার্য্য করে। এইজন্যই নিম্নজাতির সহিত শারীরিক সংস্পর্শ হইলে উচ্চজাতির লোককে পবিত্র হইবার জন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইজন্যই বিভিন্ন জাতি কিয়দংশে নিজেদের পৃথক ধর্ম্ম ও দেবতা সমূহ সৃষ্টি করিয়াছে (৩)।

এইস্থলে ওয়েবারের মতটি উদ্ধৃত করা হইল। কারণ, যাঁহারা ধর্ম্ম দ্বারা ইতিহাসের ব্যাখ্যা (Religious interpretation of History) করেন, তিনি সেই দলেরই একজন অগ্রণী। তিনি জাতিভেদের উৎপত্তির কথা সাধারণভাবে আলোচনা করিতে গিয়া নিজের মতের পোষকতাকল্পে ভারতকে উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু উপরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি ভারত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভুল সংবাদ পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২। Max Weber—Gruendress der Sozialockonomik, III. Abteilung; ch. IV. Pp. 247 – 249.

৩। Ibid—Pp. 631—635.

পুস্তক-পরিচয়

মহামন্বন্তর—শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

ঘুঘু—শ্রীপরিমল গোস্বামী লিখিত। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

মন্বন্তর প্রায়শঃ সংঘটিত ঘটনা নয়, এবং ইহার ঘটনাকারণও বহুবিধ। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে, শস্যহানি ও ব্যাপক মহামারীর ফলে, দৈবপ্রতিকূলতায় যে মন্বন্তর ঘটে তা বহু সময় অপ্রত্যাশিত এবং অনতিক্রম্য; মানুষের এতে হাত নেই। কিন্তু এর মধ্যে ব্যাপকভাবে মানুষের চরম বিপর্য্যয়ের যে মর্ম্মান্তিক রূপ,—অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, বিশীর্ণ কঙ্কালসার আবালবৃদ্ধবনিতার মহাপ্রয়াণের যে নিদারুণ দৃশ্য পরিস্ফুট হয়, তা এতই গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়বিদারক যে তার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করিতেই হয়।

শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর' নামক এই গ্রন্থখানি সেদিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

দশজন লেখকের বারোটি গল্প এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। সরোজকুমার রায় চৌধুরীর দু'টি ও সম্পাদক মহাশয়ের দু'টি গল্প ব্যতীত,—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত ও নবেন্দু বসু নামক খ্যাতনামা আটজন লেখকের একটি ক'রে। সকল গল্পগুলির পটভূমিই মুখ্যত একই বিষয়ের উপর নির্ভর ক'রে গড়ে উঠলেও, বিষয় নির্ব্বাচনে কোন কোন লেখকের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বর্ত্তমান ও ভাবিকালের মানুষের জন্য একত্রে এতগুলি খ্যাতবান সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বর্ত্তমান মহা-মন্বন্তরের রূপ উপস্থিত করার পরিকল্পনা। সম্পাদকের দীর্ঘ নিবেদনটি সুচিন্তিত এবং গোপাল হালদারের ভূমিকাটি ক্ষুদ্র হলেও সুলিখিত।

নিদারুণ ট্রাজিডীর পর হালকা ব্যঙ্গ-কৌতুকে মন নেবে আসতে সময় লাগলেও মানুষের মন হালকা হওয়ারই পক্ষপাতি। মনে নিদারুণ ট্রাজিডী ঢেকে মুখে হাস্য-কৌতুক বিতরণ করেন এমন মানুষের দৃষ্টান্তও বিরল নয়, কিন্তু তাঁরা নিঃসন্দেহে কৌশলী শিল্পী। উপরে সমালোচিত পরিমলবাবুর 'মহা-মন্বন্তর' নামক সঙ্কলন গ্রন্থের গল্প 'শেষের হিসাব' ও 'ভাঙন' পড়বার পরই হাস্য কৌতুকোজ্জ্বল 'ঘুঘু' পড়ে তাঁর বিরুদ্ধ-মানসিকতাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-নৈপুণ্য বলতে ইচ্ছা হয়। 'ঘুঘু'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাটিকাগুলি সামাজিক

মানুষের বিকল্পের উপর নির্ভর ক'রে রসসৃষ্টি করেছে এবং সেগুলিতে কোথাও রসাভাস ঘটেনি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও প্রচ্ছন্ন হাস্যকর ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে প্রকাশ করার রচনাশৈলীতে তাঁর লেখা একমেবদ্বিতীয়ম্। ঘুঘু নামের সার্থকতাতেও তা ধরা পড়ে। গ্রন্থখানিতে কতকগুলি চিত্র সংযোজিত হওয়ায় নাটিকাগুলির বিশেষত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঙালী জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ দুঃখদুর্দ্দশা ও নিরসতার মধ্যে, ক্ষণিক হলেও, যিনি তাকে সরস করার চেষ্টা করেছেন, এবং তাতে সার্থক হয়েছেন, তাঁর পরিশ্রম নিঃসন্দেহে ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করি।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

সাফো—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। কমলা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য—দু' টাকা।

মৌলিক রচনার তুলনায় বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যের পরিমাণ এখনো নগণ্য। তবু যা'হোক সম্প্রতি এদিকে শক্তিমান কোনো কোনো লেখকের নজর পড়েছে, দেখা যাচ্ছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের অনুবাদ-দক্ষতা বাঙালি পাঠকমাত্রেরই সুপরিচিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের হাতে বিদেশী কবিতার অনুবাদও একাধিক ক্ষেত্রে চমৎকার উৎরেছে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন বাংলা ভাষায় সব কথাই সুচারুরূপে বলা যায়,—বিদেশী যে কোনো রচনাই রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সুষ্ঠুভাবে অনূদিত হ'তে পারতো। অবশ্য প্রতিভার কথাই স্বতন্ত্র। কিন্তু বাংলায় যে কতো কাজ করা যেতে পারে, এ থেকে তার একটা ধারণা হয়।

বিশু মুখোপাধ্যায়ের 'সাফো' এদিক থেকে একখানি সুখপাঠ্য বই। উনিশ শতকের ফরাসী ঔপন্যাসিক আলফঁস্ দোদের লেখা বইএর এই বংগানুবাদ প্রথম যখন 'পরিচয়'-এ ক্রমিক ভাবে ছাপা হচ্ছিলো, তখন থেকেই এই অনুবাদের প্রসাদগুণে অনেকে আকৃষ্ট হয়েছেন। বিশুবাবুর ঝরঝরে গদ্য, রসিকজনোচিত দৃষ্টি এবং সংযমশাসিত কবিকল্পনা মূলের সৌরভ সকল রকমে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। তিনি এর আগে আরও অনেক বই-এর অনুবাদ করেছেন। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশু মুখোপাধ্যায়ের "সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়" "ওল্ড কিউরিয়াসিটি শপ" দু'খানি অতি উপাদেয় বই। 'সাফো' তাঁর পূর্বকৃতিত্বের অনুপযুক্ত হয়নি তো বটেই, পরন্তু আলোচ্য বই-খানির শেষাংশের অনুবাদ বিশেষভাবেই প্রশংসনীয়। প্রকাশক এ বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ ও প্রশংসার দাবী করতে পারেন। অন্তরে-বাহিরে এমন মনোজ্ঞ বই বহুদিন চোখে পড়েনি।

হরপ্রসাদ মিত্র

নিবেদন

এই দ্বৈত সংখ্যার সঙ্গে পরিচয়ের ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হ'ল। এর ক্ষীণ আকারের জন্য দায়ী অবশ্য পত্রিকার পরিচালকেরা নন—কেননা সরকারী ইস্তাহারের ফলে কাগজের ব্যবহার যে-পরিমাণ সংকোচের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে এর চাইতে বড় আকারে পত্রিকা প্রকাশ করলে আইন লঙ্ঘনের অপরাধ হ'ত। এই কঠোর সরকারী নির্দেশের ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র পত্রিকা ও পুস্তকের জগতে দারুণ সংকটের সৃষ্টি করেছে। অতঃপর পরিচয়ের বহর এত ছোট করতে হবে যে এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ রক্ষা করা হবে দায়। অবশ্য, ইদানীন্তন নানা অনিবার্য কারণে এই বৈশিষ্ট্যের ও উৎকর্ষের যে হ্রাস ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন। আমাদের তাই বিশেষ আক্ষেপ এই যে আগামী শ্রাবণ সংখ্যা থেকে নববর্ষের পরিচয় যে নতুনভাবে প্রকাশের আয়োজন হয়েছে সরকারী কাগজের পরিমাণ হ্রাসের ফলে তা হয়তো সম্পূর্ণ সার্থক হবে না। কিন্তু এই পত্রিকার সার্থকতার মূলে ছিল যে 'পরিচয়-মণ্ডলী' তা আবার নতুন ক'রে গড়ে উঠেছে ও বাংলা দেশের বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক—বর্তমান বাংলা দেশের বিচিত্র সাহিত্য-প্রচেষ্টার যাঁরা যথার্থ প্রতিনিধি ও যাঁরা এতদিন ছিলেন পরিচয়-মণ্ডলীর বাইরে—তাঁরা অতঃপর এতে যোগ দেবেন এই আশ্বাস আমরা পেয়েছি। তদুপরি পরবর্তী শ্রাবণ সংখ্যা থেকে পরিচয় প্রকাশিত হবে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল ও গোপাল হালদারের সমবেত সম্পাদনায়। এঁদের সকলের সহযোগিতা পরিচয়ের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। অতএব পাঠক ও সমর্থকদের এই আশা আমরা নির্ভয়ে দিতে পারি যে এই পত্রিকার পরিসর ক্ষীণতর হলেও রচনার উৎকর্ষে ও বিষয়ের বৈশিষ্ট্যে হবে সমৃদ্ধতর। অবশ্য যথাসম্ভব ছোট টাইপ ব্যবহার করে আকার সংকোচের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা আমরা করব।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।